বিদ্যাসুন্দরের মালিনী

বিজন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

মূল্য : সাত টাকা

এ উপন্যাস ইতিহাস নয়, ইতিহাসের পথে কল্পনাশ্রীন হয়ে তীর্থ-পরিক্রমা। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার তমসাবৃত গগনে অকস্মাৎ দেখা দিয়েছিল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র। আমাদের দুর্ভাগ্য, কবি কিংবা শিল্পীদের ইতিহাস কেউ লেখেন না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যুগান্তকারী জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে ইতিহাস মর্মান্তিকভাবে নীরব। বাকী রইল পরবর্তী গবেষণা। কিন্তু রায়গুণাকরের ইতিহাস নিয়ে গবেষকদের মধ্যেও মতান্তরের অন্ত নেই।

এই সুযোগই নেওয়া হয়েছে বর্তমান উপন্যাসে। মতান্তরের শূন্যস্থানগুলোকে ভরাট করবার চেষ্টা করা হয়েছে কল্পনা দিয়ে; শ্রদ্ধানত চিত্তে।

এ কাজ করতে গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির পুণ্য-স্মৃতির প্রতি অজ্ঞাতসারেও যদি কিছুমাত্র ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তবে তা হ'ল লেখার অক্ষমতা, শ্রদ্ধার স্বল্পতা নয়। তাই পূর্বাহ্ণেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলাম।

বিজয় চক্রবর্তী

শ্রীতড়িৎকুমার বসু

সুহৃদ্বরেষু

প্রথম আষাঢ়ের সন্ধ্যা।

সারাদিন ধরে কেমন একটা বিশ্রী গুমোট ভাব চেপে বসেছিল পৃথিবীর ওপর। দম বন্ধ হয়ে আসা অনুভূতি। কিসের যেন গোপন প্রস্তুতি চলছিল নেপথ্যে। একটু পরেই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠবে। সেই অপেক্ষাতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ছিল সবাই।

যবনিকা সরে যায় এক সময়। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই বদলে যায় আকাশের রঙ। দিক্-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে মত্ত মাতঙ্গের মতো ধেয়ে আসে পুঞ্জীভূত নিকষ-কালো মেঘের দল। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের প্রদীপ্ত শিখায় চোখ ঝলসে যায়। এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি ধূসর আকাশের বুক চিরে প্রচণ্ড আক্রোশে গরজায়, দাপাদাপি করে। প্রলয় নৃত্যে মেতে ওঠে যেন।

কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের নহবৎখানা থেকে একই সঙ্গে ভেসে আসে শানাইয়ের ঐকতান। দূরে, রাধা-মাধবের মন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়ে গেছে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ এবং পূরবীর করুণ উদা[illegible] সুর ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। নগরীর [illegible]চৌধু[illegible]কাণে রাজউদ্যানেও দোলা লাগে সে তরঙ্গের।

[illegible]র নয়; মনে হয় হাহাকার। রিক্তা ধরিত্রীর অন্তরের উপা[illegible]না এখনো মিটল না। সৃষ্টির কোন আদিম লগ্নে অসীমের যোগ[illegible] মিলনের জন্যে আকুল তৃষ্ণা হৃদয়ে জেগেছিল। আজো তা চল্লিশ[illegible] রয়ে গেল। বেদনার সেই অশ্রুত দীর্ঘশ্বাসই যেন শোনা যায় [illegible] ভেতর দিয়ে। বোবা কান্নায় কাতর পৃথিবী প্রার্থনা জানাচ্ছে না[illegible]শের কাছে। যে মিলন কোনদিন হবার নয়; হবে না, তার প্রতীক্ষায় অসহ্য ব্যাকুলতা আর কোন বন্ধন মানতে রাজী মনে

মধ্যে[illegible] মত্ত প্রকৃতি এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল। চঞ্চল হয়ে ওঠে

এবার। দমকা, মাতাল বাতাস আছড়ে পড়ে। ঝড়ে আসে কুটজ কুসুমের মনোহারিণী সৌরভ। উদ্দাম আবেগে লুটোপুটি খেতে থাকে গাছগুলো।.

বিশ্ব-চরাচরে সাড়া পড়ে যায়। কেবল সাড়া জাগে না রাজউদ্যানের মাধবী-মালঞ্চের কুটিরে। বাইরে এতো ঝড়ের মাতামাতি, আকাশে বজ্রের রুদ্র তাণ্ডব। কিন্তু সে সমস্ত উপেক্ষা করে ছোট্ট কুটিরটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে গাছপালার আড়ালে। প্রদীপের শিখাটা অসহায়ভাবে কাঁপছে। এখনি বুঝি নিভে যাবে। সেদিকে অপলক নয়ন মেলে স্তব্ধ লেখনী-হাতে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন কৃষ্ণনগর রাজসভার সভাকবি ভারতচন্দ্র মুখয্যা।

রাজসভায় নিত্য-নতুন কবিতা রচনা করে পড়ে শোনাতে হয়। চিরাচরিত প্রথা হ'ল এই। প্রথা না বলে বরং বিলাস বললেই মানায় ভালো। রাজা-মহারাজা এবং নবাব-বাদশাহদের হাজারো বিলাসিতার মধ্যে একটা হ'ল রাজসভায় একজন করে কবি রাখা। যেমন থাকে বিদূষক। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য থেকে শুরু করে গৌড়ের হুসেন শাহ পর্যন্ত সবাই এই বিলাসিতাকে প্র[illegible] গেছেন। এতে রাজার গৌরব বাড়ে। নদীয়াধিপতি [illegible] পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন পূর্বসূরীদের।

বিলাসিতা হলেও উপকার হয় অনেকের। অনেকগুলো অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘোচে। তাঁরও ঘুচেছে। এ সত্য [illegible] করলে অন্যায় হবে।

তা ছাড়া, চাকরিটা যে এই জন্যেই সে ক[illegible] করেই জানেন ভারতচন্দ্র। আগেই ব্যাপারটা প[illegible] দিয়েছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। কিছুই লুকোননি। বরং উৎস[illegible]। শুনিয়েছিলেন। রাজা-রাজড়াদের এই খেয়ালের জন্যেই [illegible]

কালিদাস এবং বিদ্যাপতির সৃষ্টির মতো কালজয়ী কাব্য-সুধা।

অস্বীকার করেন না ভারতচন্দ্র। তবু আক্ষেপ হয়। একটা জিনিস কেউ বুঝতে পারে না। চেষ্টাও করে না বোঝবার। লেখার প্রেরণা হুকুম মেনে চলে না কারো। সে হুকুম যারই হোক। একমাত্র চলে অন্তরের তাগিদ মেনে। নিজের খেয়ালে।

অথচ সেই অন্তরই আজ মরে গেছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে, তিল তিল করে। যা পড়ে রয়েছে, তা হ'ল অনুভূতিহীন শুকনো একটা শরীর ; অন্তরের কাঠামো। এই কাঠামোর স্থূল, জৈবিক প্রয়োজনেই কোনরকমে বেঁচে থাকা। প্রাণটাকেই শুধু টিকিয়ে রাখা যায় এতে। হৃদয়কে নয়। কাঠামোটা হয়তো খাড়া থাকে ; কিন্তু ফুল ফোটে না।

ফরাসডাঙায় থাকতে অবশ্য এতো কথা মনে হয় নি। কাব্য-রচনার চিন্তাটাও মুখ্য ছিল না। মুখ্য ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো— আত্মসম্মান রক্ষার প্রশ্ন। দুঃখে, অপমানে জর্জরিত ভারতচন্দ্র আর কোন উপায় না দেখেই ছুটে গিয়েছিলেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। আশা ছিল, একটা না একটা সুরাহা করে দেবেন-ই।

দিয়েও ছিলেন সুবাহা করে। আশ্রয়ের ব্যবস্থাই শুধু নয়, উপার্জনেরও। প্রিয়বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বলে-কয়ে চাকরিও যোগাড় করে দিয়েছিলেন একটা। কৃষ্ণনগর রাজসভায় মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবির চাকরি।

নিত্য-নতুন কাব্য-রচনার জন্যে চেষ্টার কোন কসুর করেন না ভারতচন্দ্র। কিন্তু রাজসভার চাহিদা অনেক। আগ্রাসী তার ক্ষুধা। সে চাহিদা মেটানো সাধ্যে কুলোয় না। অসম্ভব মনে হয় রাক্ষসী ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করা। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই এখানকার হাল-চাল বেশ ভালো করে বুঝে নিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ দরবারের নিখুঁত, ছোটখাটো একটা সংস্করণ। সেই নীরস, মুখোস-পরা আদব-কায়দা এবং নির্লজ্জ চাটুকারীতা।

এ সবকিছুর মূলে রয়েছে একটা মাত্র উদ্দেশ্য। ভারতচন্দ্র যে বোঝেন না, তা নয়। মহারাজাকে যে ভাবেই হোক খুশী করে আপন-আপন কাজ গুছিয়ে নেবার ফিকির খুঁজছে সবাই। মন-প্রাণ নিবদ্ধ করে রেখেছে সেই দিকে। কাব্য-সৌন্দর্যের প্রতি নজর দেবার সময় কারো নেই। আর, সন্তুষ্ট করবার সবচেয়ে সোজা পথ হ'ল খোসামোদ। সেই সহজতম রাস্তাটাকেই বেছে নিয়েছে সকলে।

যুক্তির অবশ্য অভাব হয় না কোন। খোসামোদ হ'ল উঁচুদরের একটা কূটনীতি। পাষাণও নাকি গলে যায় এর যাদুমন্ত্রে। কার্যসিদ্ধির জন্যে দরকার মতো এ কৌশল অবলম্বন করতে দোষ নেই। চাণক্যের নীতিতেই রয়েছে।

তা ছাড়া, সব চেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে হাতের কাছেই। বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নবাব আলিবর্দী খাঁর মতো লোক। এমন একদিন ছিল, যখন দু'চোখে দেখতে পারতেন না কৃষ্ণচন্দ্রকে। নাম শুনলেই আগুন হয়ে উঠতেন। হাজতে পর্যন্ত আটক করেছিলেন একবার। এহেন নবাবও শেষ পর্যন্ত বশীভূত হলেন যাদুমন্ত্রের কাছে। খুশী হয়ে উপাধি দিলেন ধর্মচন্দ্র। পরে খেলাতের বহর যত বেড়েছে, উপাধিও একের পর এক জুড়েছে অনেকগুলো। অগ্নিহোত্রী, বাজপেয়ী, ধর্মচন্দ্র, শ্রীমন্মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়; বাংলার চতুর্সমাজের শিরোমণি। অনুগ্রহের শেষ এখানেই হয় নি। আলিবর্দী খাঁ নিজে যেচে দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহের কাছ থেকে আনিয়ে দিয়েছেন সাহেব-ই-নহবতের মতো দুর্লভ সম্মান। বাংলা দেশের আর কোন জমিদারের ভাগ্যে এ সম্মান জোটে নি। সেই থেকে দিল্লীর শাহী-প্রাসাদের অনুকরণে কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের নহবৎখানাতেও সকাল-সন্ধ্যায় নহবৎ বসে।

এত বড় প্রমাণকে উপেক্ষা করা যায় না। করেও না কেউ।

অন্ধভাবে সবাই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে। ভাঁড়ামি থেকে আরম্ভ করে বাদ যায় না কিছুই। যাই হোক না কেন ক্ষতি নেই। মালিক সন্তুষ্ট হলেই হ'ল।

সন্তুষ্ট সত্যিই হন মহারাজা। দরাজ-হাতে অনুগ্রহ বিতরণ করেন। এইটুকুই আসল প্রয়োজন সভাসদ্দের। কাব্য কিংবা সৌন্দর্যের ভরসায় থেকে লাভ নেই। প্রয়োজন যাতে না মেটে তেমন জিনিস নিয়ে বিলাসিতা করা ভিখিরীর পোষায় না।

এ আবহাওয়ার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না ভারতচন্দ্র। সহ্যও করতে পারেন না। কতদিন ভেবেছেন চোখ বুজে উপেক্ষা করে যাবেন। পড়ে থাকবেন নিজের মনে; দেবী সরস্বতীর চরণে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে না। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও গায়ে এসে আঁচ লাগে। সঙ্কল্প বিচলিত হয়।

চুপ করে থাকা যায় না। মুখ ফুটে বলেও ফেলেন। কিন্তু ফল হয় না কিছুই। উলটে অসন্তুষ্ট হন সভাসদেরা। ফিকির খুঁজতে থাকেন ভারতচন্দ্রকে অপদস্থ করবার।

আসলে, জীবন যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখনই মানুষের মনে জাগে এই সমস্ত হীন প্রবৃত্তি। সেগুলোকে চরিতার্থ করবার পথ খোঁজে কেবল। রাজসভার কাছে কাব্য হ'ল সেই পথগুলোর একটা। দেবী ভারতীকে উপলক্ষ্য করে অসুস্থ মনোবৃত্তি তৃপ্তির পথ খোঁজে। আরাধনার কোন স্থান এখানে নেই।

উদ্দাম বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেঁদে কেঁদে বেজে চলেছে শানাই। উদাস সুর মনটাকে আরো খারাপ করে দেয়। কি একটা চাপা বেদনা গুমরাতে থাকে বুকের মধ্যে। সারা পৃথিবীর ওপর পুঞ্জীভূত অভিমান যেন অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো ধূমায়িত হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়বে।

ফেটে হয়তো পড়তোও একদিন। প্রথম দিকে অসহ্য লাগতো এই ভাঁড়ামি এবং চাটুকারীতা। অশ্লীলতারও একটা সীমা

আছে। কিন্তু এখানে সে সীমার কোন বন্ধনী নেই। অনেকবার ভেবেছেন চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন অন্য কোথাও। না হয় আবার সন্ন্যাস জীবনকেই বরণ করে নেবেন। মানুষের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা দেখে যেমন একদিন সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পথকে সম্বল করে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে-ছিলেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। বন্ধনহীন, উদার, উন্মুক্ত জীবন। হীনতা ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না। সে পথে ভগবানকে পাওয়া যাক কিংবা না যাক, একটা জিনিসের হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া যায়। ঘৃণ্য জীবনের ভার। কলুষতার পাঁকে জীবন যখন হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন তাকে ভার ছাড়া আর কি বলা যায়?

কিন্তু পারেন নি। আত্মসম্মানের প্রশ্নই এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওটুকু বিসর্জন দিলেই সমস্ত দুর্দশা এড়ানো যেত। একবার শুধু মাথা নীচু করে যেয়ে দাঁড়াতে হ'ত রাজা নরেন্দ্র রায়ের সামনে। পিতা হয়ে পুত্রকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারতেন না নিশ্চয়ই। ভাইয়েরা হয়তো মুখ টিপে হাসতো। সেটুকু উপেক্ষা করলেই চুকে যেত সব হাঙ্গামা।

মাথা নোয়াতে হ'ত অবশ্য আর একজনের কাছেও। সে হ'ল রাধা। তার যে যুক্তি সেদিন মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেই যুক্তিকেই মেনে নিতে হ'ত। হৃদয়ের চেয়ে শরীরটা বড়। দেহের ক্ষুধার কাছে মনের ক্ষুধার দাম এতটুকুও নয়।

রাজা নরেন্দ্র রায়ের সামনে হয়তো মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু রাধার কাছে? না, সে সম্ভব ছিল না। অন্তর এসে রুখে দাঁড়িয়েছে। সত্য এবং সুন্দরের পূজারী তিনি। যে জিনিসকে ধ্রুব সত্য বলে জেনেছেন, সামান্য স্বার্থের জন্যে সে সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। হাত উঠবে না অসুন্দরের কাছে বলি দিতে সুন্দরকে।

তাই সে চেষ্টা আর করেন নি। অন্তর্দাহকে শতগুণে জ্বালাময়

করে তুলেছে অর্থাভাব। নিজের হাতে একবেলার রান্নায় দু'বেলা খেয়ে দিন কেটেছে। তাও শুধু বেগুনপোড়া আর ভাত। তবু ফিরে যান নি। বরং দুর্দশা যত বেড়েছে, ততই কঠিনতর হয়েছে প্রতিজ্ঞা! নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন, দেহটা বড় নয়; বড় হ'ল হৃদয়। শরীর হ'ল অন্তরের দেউলে পৌঁছবার সিঁড়ি মাত্র।

মর্মান্তিক অপমানের সে স্মৃতি রক্তের অক্ষরে মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে আজো। তার মূলেও ছিল অর্থ। উপার্জনের অক্ষমতার জন্যে তাঁকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করতে কারও এতটুকু বাধে নি। পিতার নয়, ভাইদেরও নয়। তাও হয়তো সহ্য হয়ে যেতো। কিন্তু রাধার মুখেও যেদিন সেই একই যুক্তির প্রতিধ্বনি শুনলেন, সেদিন আর সহ্য হয় নি। অপরিসীম বেদনায় মুখ বুজে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিলেন সব ছেড়ে। রাজা নরেন্দ্র রায়ের পুত্রের কাছে তাই সামান্য চল্লিশ টাকা মাস-মাইনের চাকরিই আজ অসামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকার এই মূল্য শিখতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে।

তবু এমন হীন চাটুকারীতা করতে মর্মে বেঁধে ভূরশুট রাজবংশের রক্তে। অন্তরের কবিসত্তাকে শেষ পর্যন্ত গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। কথাটা মনে হলেই চোখে জল এসে যায়। নকলনবীশ শঙ্কর তরঙ্গের পাশে কবি ভারতচন্দ্র রায়। ভাবতেও গা গুলিয়ে ওঠে। হয়তো শঙ্করের মতোই তাঁকেও একদিন উপাধি দেওয়া হবে দ্বিতীয় গোপাল ভাঁড়। মূর্খ শঙ্কর বোঝে না, এটা তার উপাধি নয়, বিদ্রূপ। অথবা বুঝেও হয়তো না বোঝার ভাণ করে স্বার্থের লোভে। অর্থই তার কাছে পরমার্থ।

কিন্তু তাঁর কাছে তো অর্থ পরমার্থ নয়। অর্থের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না। কোনদিন করেনও নি। তবু সে প্রয়োজনের কাছে মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিতে রাজি নন। রাজি থাকলে তো অনেক আগেই জীবনের মোড় ফিরিতে দিতে পারতেন। তাই অসহ্য মনে হতেই আবার একদিন ছুটে গিয়েছিলেন ফরাসডাঙায়।

সব শুনে মৃদু হেসেছিলেন দেওয়ান। পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ। পৃথিবীর অনেক কিছু ভালো-মন্দ দেখেছেন। জানেন এ ঠুনকো ভাবপ্রবণতার মূল্য বাস্তবক্ষেত্রে এক কাণাকড়িও নয়।

লোক-চরিত্র ভালো করে চেনেন ইন্দ্রনারায়ণ। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রকে। দীর্ঘদিন ধরে কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছেন। অনমনীয় পাথরের টুকরো বলে মনে হয়েছে। তাও যে সে পাথর নয়; চকমকি পাথর। ঠোকাঠুকি লাগলেই জ্বলে উঠবে। বাস্তব সত্যকে মুখের ওপর বললে উলটো ফল হতে পারে। তাই মনের ভাবটাকে সোজাসুজি প্রকাশ করেন নি। কৌশলে ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—পাঁকের ভেতরেই পঙ্কজের জন্ম ভারত। কাব্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তোমার মতো লোকের তা না জানবার কথা নয়। ওই কুরুচির স্রোতকে তোমার সৃষ্টি দিয়ে সুন্দরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না? তুমি কবি, সুন্দরের পূজারী। এ কথাটা ভুলে যাও কেন?

ফলাফলটুকু লক্ষ্য করে আবার বলেছিলেন—চাকরি অবশ্য চেষ্টা করলে ফরাসী সরকারেও একটা যোগাড় করে দিতে পারি। এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবে তা হবে নিছক গোলামী। কাব্য-সৃষ্টির কোন সুযোগই পাবে না সেখানে।

ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছিলেন দেওয়ান। সবকিছু সইতে পারেন ভারতচন্দ্র। পারেন না কেবল তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের ওপর কোনরকম কটাক্ষ। এই জন্যেই একদিন সব ত্যাগ করে এসেছিলেন।

ফরাসডাঙা থেকেও সেদিন ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে; নতুন আশায়, নতুন উদ্দীপনায়।

একটানা কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকায়। তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্যে সাদা হয়ে যায় গাঢ় অন্ধকার। বাজ পড়লো বোধ হয়

কোথাও। কান-ফাটানো আওয়াজে আকাশ-পাতাল কাঁপতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কেকারবে মুখরিত হয়ে ওঠে বনানী।

স্বপ্ন ভেঙে যায় ভারতচন্দ্রের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন। গভীর আঁধারে আবার সবকিছু ঢেকে গেছে। এলো-মেলো হাওয়ায় ভেসে আসছে বৃষ্টির শব্দ।

সজল বাতাস, মেঘ-মেদুর গগন এবং ময়ূরের কেকারবে মুখরিত আষাঢ়ের প্রথম দিন। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। উধাও হয়ে যেতে চায়। পৃথিবীর সমস্ত কলঙ্ক-কালিমাকে পিছনে ফেলে চলে যেতে চায় বহুদূরে; কোন এক কল্পলোকের স্বর্গে। সেখানকার আকাশেও হয়তো রয়েছে এমনি ঘনঘটার সমারোহ। কাজল-কালো মেঘের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে প্রোষিতভর্তৃকার প্রতীক্ষারত নয়নে:

নিজের অজ্ঞাতেই মন কখন চলে গিয়েছিল তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ সারদাগ্রামে। রাধার উদাস দু'চোখে নেমে এসেছে বর্ষার বারিধারা। প্রবাসী প্রিয়তমের বিরহে কাতর সে চোখের ভাষা যেন মুখর হয়ে ওঠে। এতক্ষণের অগ্নিগর্ভ ভাবনার উপর স্নিগ্ধ একটা বেদনার প্রলেপ পড়ে।

সারদাগ্রাম থেকে রামগিরি আশ্রম। ব্যথিত অন্তর বহু যুগের ব্যবধান এক লহমায় পার হয়ে যায়। মেঘদূতের কাছে হৃদয় লুটিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেছিল বিরহী যক্ষ। সে বেদনা এতদিন কেবলমাত্র কাব্য হয়েই ছিল। বাস্তবের রূপটা ধরা পড়ে নি। আজ সহসা ধরা পড়ল সে রূপ। আনমনে আবৃত্তি করেন:

কশ্চিৎ কান্তা-বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং-গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়া-তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

আবৃত্তি করতে করতে ডুবে গিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে কখন একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে কুটিরের

ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেন নি। হুঁস হয় আচমকা প্রশ্নটা কানে যেতে ;—নতুন কিছু লিখলে বুঝি ? দেখি। ছায়া-মূর্তি একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পিঠের ওপর।

আতকে উঠেছিলেন ভারতচন্দ্র। লেখনী খসে পড়ে হাত থেকে। সচকিতভাবে মুখ ফেরান—কে ?

ছায়ামূর্তি একটু সরে বসে—কই, কাগজ তো দেখছি একদম সাদা ; কিছুই লেখা নেই।

ভয়ের ভাবটা তখনো কাটে নি। নির্বোধ দৃষ্টিটা মুখের ওপর রেখে ভারতচন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন করেন—তুমি ?

—হ্যাঁ আমি। ভয় পেলে নাকি ?

—তা একটু পেয়েছি বৈ কি। তবে অবাক্ হয়েছি আরও বেশি।

—অবাক্ কেন ?

—অনেকদিন পর ; তাই বিশ্বাস হচ্ছে না। পথ ভুলে এলে নাকি ?

—বিশ্বাস না হয়, ছুঁয়ে দেখো। সত্যিই মানুষ, না ভূত ! রাজনর্তকী প্রিয়ম্বদা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

ভারতচন্দ্র থতমত খেয়ে যান। কথাবার্তার ধরনগুলো কেমন বাঁকা ঠেকে। বিব্রতভাবে বলেন—ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই বটে। কখন এলে বুঝতেই পারি নি।

—পারবে কি করে ? এ জগতে থাকলে তো।

—ছিলাম না সত্যি। কিন্তু তুমি হঠাৎ ?

—হঠাৎ আবার কি ? কখনো কি আসি না ?

সহসা কোন জবাব জোগায় না। সত্যিই আসে বাঈজী। প্রায় প্রতিদিন সকালেই। হয়তো বেড়াতে ; কিংবা ফুল তুলতে। জিজ্ঞাসা করেন নি কখনো। কিন্তু আসলেই দেখা করে তাঁর সঙ্গে। লেখার খবর নেয়। রাজসভার যে সামান্য দু'-একজন লোক তাঁর কবিতার সমাদর করে, নর্তকী প্রিয়ম্বদা তাদের একজন। বারবিলাসিনী হলেও, প্রকৃত সমঝদার বলেই মনে হয়। পছন্দও

করেন সেই কারণে। একটু হেসে বলেন—তা আসো। সে কথা বলি নি। ভাবছি, এই ভর-সন্ধ্যাবেলা মেঘ-বৃষ্টি মাথায় করে নেহাত দায়ে না ঠেকলে কেউ ঘরের বার হয় না। তোমার দরকারটা কি পড়লো?

—আমিও যে দায়ে ঠেকি নি, তাই বা তোমায় কে বললো শুনি? তির্যক কটাক্ষ করে বাঈজী। তারপর গেয়ে ওঠে:

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
বড় পতি আশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর॥

গান শেষ করে হাসে, বলে—দায়টা যে কি, তা বঝতে পারলে?

বঝতে ঠিকই পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু কথার খেইগুলো হারিয়ে যায়। প্রসঙ্গটাকে বদলাবার জন্যে অন্য কথা পাড়েন—হঠাৎ বড়ু চণ্ডীদাস গাইতে শুরু করলে?

—দায় জানতে চাইলে কিনা, তাই জানালাম। এসব কথা তো আর ভাষায় বলা যায় না; গান গেয়ে জানাতে হয়। এই-রকম মেঘ-বৃষ্টি মাথায় করেই রাধিকা বনের ভেতর গিয়েছিলেন। কারণটা কি জানো তো? কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন। অভিসারের কি আর সময়-অসময় রয়েছে। বরং যত অসময় হয়, তই সুবিধে।

একটু চুপ করে থেকে নীচু গলায় বলে—সব আসাতেই কি আর দরকার থাকে কবি? না, বিনা দরকারে কেউ আসে না?

কৌশলটুকু ব্যর্থ হ'ল। ভেবেছিলেন কাব্যের প্রসঙ্গে প্রিয়ম্বদা ভুলে যাবে অন্য কথা। অলোচনায় মেতে উঠবে। কিন্তু সে পথই মাড়ায় না।

অস্বস্তিতে ঘামতে থাকেন ভারতচন্দ্র। বর্ষণমুখরিত নির্জন রাতে ঘরে তাঁর কৃষ্ণনগর রাজসভার নর্তকী। সান্ধ্য-মজলিসে তার অপূর্ব নৃত্য বহুদিন দেখেছেন। শুনেছেন কোকিল-কণ্ঠের গান। চারু-

ভাষিণী নারীকে নিজের থেকেই নাম দিয়েছিলেন প্রিয়ম্বদা। সেই নামই চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু এ যেন সে নারী নয়। এ হ'ল এক প্রগল্‌ভা, অধীরা নায়িকা ; মদালসা বারবণিতা।

রাজসভার লোকদের মর্মে মর্মে চিনে নিয়েছেন রাজকবি। বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে না কেউ। প্রিয়ম্বদাকে তাদের ব্যতিক্রম বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ভুলও তো হতে পারে তাঁর। হাজার হোক, সেই রাজসভারই নর্তকী বাঈজী। হয়তো গোপন কোন মতলব নিয়েই এই অসময়ে হাজির হয়েছে। এদের অসাধ্য কিছু নেই।

কথাটা মনে হতেই কেমন খটকা লাগে। আজকের এই আসাকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারেন না। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই রয়েছে। বাঈজী গোপন করে যাচ্ছে সেটাকে। চণ্ডীদাসের পদের ভেতর দিয়ে যে ইঙ্গিত করলো, তাও যে কিছু মতলব নিয়েই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—আচ্ছা মানুষ তো। তোমার কাছে এলাম ; আদর-আপ্যায়ন তো দূরে রইলো, বসতে পর্যন্ত বললে না।

ভারতচন্দ্র বিব্রতভাবে চারিদিকে তাকান। ঘরের মধ্যে আসন রয়েছে মাত্র একটা। সেটা অধিকার করে আছেন নিজে। তাড়াতাড়ি উঠতে যান!

অমনি দু'হাত দিয়ে কাঁধ দুটো চেপে ধরে প্রিয়ম্বদা—থাক, আর ভদ্রতা করতে হবে না। মেঝেতেই বসছি।

পাশ ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা করে—কি পড়ছিলে তখন? কাগজে তো দেখছি একটা আচড়ও পড়ে নি। আজকাল কি বিনা কালিতে লেখা শুরু করেছো?

কাঁধের স্পর্শটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগায়। অবশ করে দিতে থাকে। উত্তর দিতে স্বর কেঁপে যায়—কখন?

—ঘরের ভেতর ঢুকতেই কানে গেল।

মনে পড়ে যায় ভারতচন্দ্রের। কাব্যের প্রসঙ্গে ক্ষণিকের বিহ্বলতাটুকু কেটে যায় চট করে ;—মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। আকাশে মেঘের মেলা দেখে মনে পড়ে গেল, আজ আষাঢ়ের প্রথম দিন।

—মেঘদূত? বিরহী যক্ষের বেদনার কাহিনী?

—হ্যাঁ, আশ্চর্য অনুভূতি ছিল কবির। মানুষের মনের কথাগুলোকেই যেন ভাষায় রূপ দিয়ে গেছেন।

প্রিয়ম্বদা সুন্দর করে হাসে—তোমার মনের কথাগুলোও কি তাই নাকি? থামলে কেন, আবৃত্তি করো। গোপন কথাগুলো না হয় শুনেই দেখি।

আবার সেই বাঁকা পথ। ঘুরেফিরে সেই একই প্রসঙ্গে ফিরে আসে বাঈজী। এ ছাড়া বুঝি আর কোন কথাই বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। পরিহাস, রসিকতা যে তাঁর সঙ্গে না করে তা নয়। কিন্তু তার একটা অলিখিত সীমা মেনে চলে। আজ সে সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়।

উত্তরের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নর্তকী। তারপর মধুর কণ্ঠে নিজেই আবৃত্তি করে :

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদ্-বলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়-ভ্রংশারক্ত প্রকোষ্ঠ.
আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

একটু থেমে গাঢ়স্বরে বলে—বাইরে প্রকৃতির মনে বিরহের অন্ধকার আর বুকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। ভেতরে তুমি আর আমি। দুজনেরই হৃদয় কাঁদছে। দুজনের হৃদয়ই বিরহী। এই তো মেঘদূত পড়বার সময়। তোমার রসবোধ আছে কবি।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েছিলেন ভারতচন্দ্র। বক্তব্যের অস্বস্তিকর অর্থটুকু ছাড়াও, আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ে। মোহময়ী বারবিলাসিনীর এক নতুন পরিচয় যেন আড়াল থেকে

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাব্যে তার অনুরাগ আছে, এটা জানতেন। কিন্তু নিজে সে যে একজন বিদগ্ধা নারী, এ তথ্যটা অজানা ছিল। মধুর কণ্ঠের বিশুদ্ধ আবৃত্তি এখনো কানের ভেতরে ঝংকার তুলছে।

তবু, শেষের কথাগুলো বড় বেশি নির্লজ্জ মনে হয়। নিঃসম্পর্কীয় একজন নারী যে এমন বেহায়ার মতো প্রণয় নিবেদন করতে পারে এটা জানা তো দূরের কথা, কল্পনাও করেন নি কখনো। সঙ্কোচ লাগে। উষ্ণ যৌবনের মদির গন্ধ নেশার মতো ছড়িয়ে পড়ছে সব কটা ইন্দ্রিয়ের ওপর। স্পর্শটুকু বাঁচিয়ে সরে বসেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন—সংস্কৃতও জানো নাকি?

মোহিনী হাসিটা আবার ছড়িয়ে দেয় বাঈজী—সামান্য জানি। সেইজন্যেই সন্দেহ জাগছে, তোমার মনেও বুঝি জ্বলছে বিরহের আগুন। কিন্তু এতো লজ্জা? পাছে ছোঁয়া লাগে বলে সরে বসলে?

কান দুটো গরম হয়ে ওঠে, নিরুত্তরে মুখ নামিয়ে নেন ভারতচন্দ্র। এমন বিশ্রী পরিস্থিতিতে জীবনে কখনো পড়েন নি। বিশ্রী, কিন্তু আকর্ষণও করে! মনের কোণটা হাতড়েই চমকে ওঠেন। গোপন অপরাধ-বোধের লজ্জা। নিজের ওপর একটা বিশ্বাস রয়েছে তাঁর। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি নেই; রয়েছে নিরাসক্ত প্রয়োজন। সে বিশ্বাসে যেন দাগ পড়ল।

কয়েকবার গভীর গর্জনের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। বিদ্যুতের চঞ্চল শিখাগুলো নেচে বেড়ায় আকাশ-প্রাঙ্গণে। অনেক দূর হতে যেন একটা ফিসফিস স্বর শোনা যায়—আমি বিরহিনী; তুমিও বিরহী। দুজনেই জ্বলছি বিরহের আগুনে। সে আগুন দেখা যায় না; কিন্তু দহনের জ্বালা যে শতগুণে বেশি।

একটু দম নেয় বাঈজী। তারপর বাইরের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে উদাস স্বরে বলে—"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ॥"

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে আবার। মাতাল বাতাস যেন মাথা কুটতে থাকে। চমকে একেবারে গা ঘেঁষে বসে রাজনর্তকী। অপ্রস্তুতভাবে হাসে—মেঘ দেখে তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল কালিদাস। কারণ তুমি হলে রাজসভার কবি। আমার কিন্তু মনে পড়ে চণ্ডীদাসকে। সব সময়। অন্তরের কথাটাকে এমন করে আর কেউ প্রকাশ করতে পেরেছে কি? পারে নি। কালিদাসও না। আসলে রাজকবি ছিলেন তো। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করবার সময়ই হয়তো ছিল না। যেমন তোমারও নেই।

কাব্যের প্রসঙ্গে আবহাওয়াটা আপনা থেকেই বদলে যায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন ভারতচন্দ্র। সন্তর্পণে একটু সরে বসে জিজ্ঞাসা করেন তোমার প্রিয় কবি বুঝি চণ্ডীদাস?

প্রিয়ম্বদা মুচকি হাসে—না।

—তবে কে?

—যদি বলি তুমি?

—তা হলে বলবো মিথ্যা কথা বলেছো।

—মিথ্যে কথা?

—নয় তো কি?

—কেন?

—এমন কিছুই এখনো রচনা করতে পারি নি যা দেখে লোকে আমায় বিচার করবে। প্রিয় কিংবা অপ্রিয় করা দূরে থাক।

—বিচার করার জন্যে যা লিখেছ তাই কি যথেষ্ট নয়?

ভারতচন্দ্র হাসেন—সামান্য কয়েকটা ঋতু বর্ণনা আর রাধা-কৃষ্ণের উক্তি নিয়ে লেখা টুকরো কবিতা দিয়ে যদি একজনের কাব্য-প্রতিভা বিচার করা যায় প্রিয়ম্বদা, তবে পৃথিবীতে সবাই উঁচুদরের কবি। কিন্তু সে কথা থাক। এই অসময়ে একলা কি মতলবে এসেছো, সত্যি করে বলতো।

—মতলব? একথা মনে হ'ল কেন?

—তোমার ব্যবহার আর কথাবার্তার ধরন দেখে।

—কি রকম ?

—তা জানি না। তবে স্বাভাবিক নয় সেটা বুঝেছি।

—সত্যি ? খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বাঈজী :—আশ্চর্য মানুষ তুমি। ভালো কথায় সন্দেহ জাগলো ? কত যত্ন করে মনের গোপন কথাটা জানালাম। এই ফল হ'ল তার ?

হাসি থামিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। আবার বলে—মতলব কিছুই নেই কবি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। বেঘোরে ভিজবো। মনে পড়ল, তুমি এখানে আছো। তাই আশ্রয়ের জন্যে ছুটে এলাম। কিন্তু এখন দেখছি অন্যায় করেছি।

শেষের দিকে গলাটা কেমন ধরে আসে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন ভারতচন্দ্র ;—আমার দোষ হয়েছে প্রিয়ম্বদা। রহস্য করেই বলেছিলাম কথাটা।

—রহস্য ? ভালোবাসাটা পুরুষের কাছে রহস্যই বটে।

ভালোবাসা। খট্ করে কানে লাগে কথাটা।

বাঈজী কিন্তু খেয়াল করে না। আপন মনেই জিজ্ঞাসা করে—গান শুনবে একটা ?

তারপর মতামতের জন্যে অপেক্ষা না করেই গুনগুন করে গাইতে আরম্ভ করে :

সখি হমরী দুখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥

বাইরে অঝোরধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেদিকে দৃষ্টি মেলে রাজনর্তকী বিভোর হয়ে গাইতে থাকে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মনের কথা যেন উজাড় করে দেয়।

সেই সঙ্গে আর্দ্র করে দেয় হৃদয়কেও। এ কণ্ঠের গান অনেকবার শুনেছেন রাজকবি। কিন্তু বিরহের হাহাকার যে এমন জীবন্ত হতে পারে, সে ধারণা ছিল না। সে অনুভূতি

পান নি কখনো। আসলে সে গান ছিল রাজসভার গান। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির অস্ফুট স্বর। আর, এ হ'ল অসীমের আনন্দে আত্মহারা মুক্ত বিহঙ্গের কাকলী।

এই সঙ্গীতটুকু অন্তত ছলনা নয়। সন্দিগ্ধ মন অজান্তেই কখন কোমল হয়ে পড়েছিল। একই হাহাকার যে তাঁর হৃদয়কেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ করে দিচ্ছে।

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে যায় প্রিয়ম্বদা—কবি।

—বল।

—তোমার সেদিনকার কবিতাটা এখনো কানে বাজছে আমার।

খুশীর একটা আমেজে মন ভরে যায় ভারতচন্দ্রের। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করেন—কোন্ কবিতা?

—সেই, বসন্ত। রাজসভায় যেটা পড়েছিলে: অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি। শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি। ভাবতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত॥

—সত্যিই ভালো লেগেছে তোমার?

—হ্যাঁ কবি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারি না। এতদিন হ'ল এখানে এসেছো। ঋতুরাজ বসন্ত চলে গেল: বিরহী বর্ষা এলো। অথচ তোমার প্রাণে কোন সাড়া জাগে না কেন? কেন এমন হয়ে থাকো? মনে কি তোমার বসন্ত আসে নি আজও? শুকনো গাছে কি ধরে নি মুকুল?

হৃদয়ের ক্ষতটা টনটন্ করে ওঠে। গভীরতম প্রদেশে ঘা দিয়েছে বাঈজী। না জেনেই।

ভারতচন্দ্র বলতে চান—না। কিন্তু আটকে যায়। অনাত্মীয়া রমণীর কাছে হৃদয়কে মেলে ধরতে বাধে। সে লজ্জার কথা কাউকে বলা যায় না। এমন কি নিজেকেও নয়।

—জবাব দিলে না যে?

—জবাব নেই প্রিয়ম্বদা।

—কেন ?

—সব প্রশ্নের কি উত্তর হয় ?

আরো চেপে বৃষ্টি নামে। একটানা রিমঝিম কান্নায় আকুল হয়ে ওঠে পৃথিবী। খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাট এসে ঘরের ভেতর বেশ খানিকটা জায়গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। কপাট-গুলো বন্ধ করা দরকার। কিন্তু উঠতে পারেন না ভারতচন্দ্র। ওঠবার শক্তি কিংবা উৎসাহ সব যেন উবে গেছে।

রাজনর্তকী আবার গা ঘেঁষে বসে। বিহ্বল কণ্ঠে বলে—চাইবার মতো করে চাইতে পারলেই উত্তর পাওয়া যায় কবি।

মনটা কোন্ দূর অতীতে পিছিয়ে গিয়েছিল। তাই অতো-শত লক্ষ্য করেন নি ভারতচন্দ্র। কথাগুলো যেন বাঈজীর নয়; রাধার। যাকে ভালোবেসে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। এতদিন পর ফিরে এসেছে সে। ঠিক আগের মতো সেই প্রেম-বিহ্বলা, লজ্জারুণা শ্রীরাধা। অস্ফুটস্বরে উত্তর দেন—আমি যে সেভাবে চাইতে পারি না।

অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি মৃণাল বাহু দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রিয়ম্বদা। কামনার্ত ঠোঁট দুটো এগিয়ে দিয়ে মদির কটাক্ষে এলিয়ে পড়ে বুকের ওপর—যে ভাবেই হোক, চেয়েই দেখো একবার। বল কি চাও ? যা চাও, সব দেবো। সমস্ত উজাড় করে।

মধুর অতীতটা চকিতে মিলিয়ে যায়। প্রিয়তমা শ্রীরাধা নয়; নটী প্রিয়ম্বদা।

কিছুক্ষণের জন্য ভারতচন্দ্র পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। পরক্ষণেই সারা শরীর পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। কুৎসিত একটা সরীসৃপ জড়িয়ে ধরেছে যেন তাঁকে। রাজসভার সেই অশ্লীলতারই চরম রূপ। মুখ ফিরিয়ে এক ঝটকায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হাত দুটো সরিয়ে দেন—তুমি ভুল করেছো বাঈজী।

—না কবি, না।

—হ্যাঁ। দৃঢ়স্বরে বাধা দেন ভারত ;—মানুষ তুমি চেনো নি বাঈজী। তা ছাড়া, আমি গরীব। তোমার দক্ষিণা দেবার মতো কিছুই আমার নেই।

—যদি কোন দক্ষিণা না চাই ?

—তবু তোমার আশা মেটাতে পারবো না।

—কেন ? কেন পারবে না ?

উত্তর দেবেন না ভেবেছিলেন। কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়—আমি ঘৃণা করি বাঈজী।

দপ্ করে যেন নিভে যায় প্রিয়ম্বদা ;—ঘৃণা করো ?

কথাটা বলেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র। রূঢ় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সামলাবার চেষ্টা করেন—এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থভাবে কেউ কিছু দেয় না বাঈজী। দিতে পারে না।

—পারে ; কিন্তু সে তর্ক আপাতত থাক। ঘৃণা কর কেন জানতে পারি কি ?

ভারতচন্দ্র ইতস্তত করেন—দেহের পাঁকের ভেতরে ডুবে থাকা আমি সহ্য করতে পারি না।

প্রিয়ম্বদা এবার উঠে দাঁড়ায়—যাকে তুমি পাঁক বলছো, তাই কিন্তু প্রাণের লক্ষণ। দেহের আকর্ষণ না থাকাটা অস্বাভাবিক। বিশেষ করে যৌবনে। বয়সের ধর্ম এড়িয়ে যৌবনে যারা সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তারা হয়তো ভগবান হতে পারে ; কিন্তু মানুষ নয়। তারা অসুস্থ।

বলতে বলতে স্বরটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—যাক ; এ নিয়েও তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে। একটা কথা কেবল বলবো। এ চোখের সামান্য একটু কটাক্ষের জন্যে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অনেক আমীর-ওমরাহ জান্ দিতে পারলেও নিজেদের ধন্য মনে করবে।

উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভারতচন্দ্র থতমত খেয়ে যান প্রথমটা। কিন্তু আপোসের কোন পথও নজরে পড়ে না। একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে হয়তো হারাতে হবে। তবু উপায় নেই। ঘৃণ্য-

জীবনের বিনিময়ে এমন বন্ধুত্ব মেনে নিতে পারবেন না। শান্ত, ধীর স্বরে জবাব দেন—হয়তো করবে। কিন্তু আমি আমীরও নই, ওমরাহ্ও নই। সামান্য রাজকবি। মাসান্তে দয়া করে মহারাজা চল্লিশটা করে টাকা দেন। আমায় মাপ করো।

—কবি।

—হ্যাঁ বাঈজী। হয়তো তুমি রাগ করবে। আমার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেবে। তবু বলবো, তুমি প্রকাণ্ড ভুল করেছো। কবি ভারতচন্দ্র গরীব হলেও, মানুষ। মানুষের মর্যাদা তার কাছে দেবতার চাইতেও বড়। মনুষ্যত্বের অপমান তাই সে সইতে পারে না। তোমার প্রস্তাব হল মনুষ্যত্বের অপমান।

—আমায় তা হলে ফিরিয়ে দিলে ?

—উপায় নেই। তবে মানুষের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে যদি কোন দিন আসতে পারো, সেদিন কি করবো বলতে পারি না। কিন্তু ও কি ? এই বৃষ্টি মাথায় করে চললে কোথায় ?

দরজার কাছে যেয়ে প্রিয়ম্বদা ফিরে দাঁড়ায়—প্রত্যাখ্যাত হয়ে নায়কের কাছে পড়ে থাকার চাইতে নারীর পক্ষে মৃত্যুও ভালো কবি। একথাটা তোমার জানা উচিত ছিল।

জবাবটা দিয়ে আর দাঁড়ায় না। আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি মাথায় করে নেমে যায় বাগানের মধ্যে।

বাক্যহারা ভারতচন্দ্র অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থাকেন। ব্যাপারটা যেন এখনো বিশ্বাস হয় না। প্রিয়ম্বদাকে যতটুকু চিনেছেন, তাতে অসম্ভব মনে হয় তার এই ব্যবহার।

তবু ঘটেছে। একথা অস্বীকারও করা যায় না। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন। ধীর পায়ে যেয়ে দাঁড়ান জানালার সামনে।

সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আজ রাতে আর থামবে বলে মনে হয় না। বৃষ্টিস্নাত মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক। চির-বিরহিণী ধরিত্রী পেয়েছে করুণার আশীর্বাদ। প্রার্থনা তার

সফল হয়েছে। নব রসে সিঞ্চিত হয়েছে বনানী। শুধু তাঁরই হৃদয়ে হাহাকার করছে উত্তপ্ত মরুভূমি। চিরতৃষিত, চির-অতৃপ্ত।

এলোমেলো ভাবনায় রাত বেড়ে চলে। রাজবাড়ির ঘড়ীতে এগারোটা বেজে যায়। প্রিয়ম্বদার কথাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারেন না। প্রেম-বিহ্বলা নায়িকার মতো মিলন অভিসারে অন্তত তাঁর কাছে আসবে না বাঈজী। সেজন্যে বহু রসিক নাগর অপেক্ষা করছে অর্থের ডালি সাজিয়ে।

অথচ এসেছে; নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে। ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়; সত্যি। কিন্তু কেন? অনেক চিন্তা করেও উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয় না কিছুতেই।

আবার আসনে এসে বসেন। প্রদীপে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়ে লেখনী তুলে নেন। সাদা কাগজটা যেন দাঁত বার করে উপহাস করছে। রাজনর্তকীর প্রিয় কবি নাকি ভারতচন্দ্র। উপহাস ছাড়া কি?

এ উপহাসের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্যে মন ফুঁসতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। এ যুদ্ধ করা নয়, যে কতগুলো সৈন্য সাজিয়ে নিয়ে রওনা দিলেই হ'ল। চণ্ডীদাস কিংবা বিদ্যাপতির মতো বাগদেবীর বরপুত্র হবার জন্যে চাই সারা জীবনের সাধনা। তারপর যদি সিদ্ধি লাভ হয়।

আপাতত যা হোক কিছু একটা লিখতেই হবে। অনেকদিন হয়ে গেল কোন নতুন রচনা রাজসভায় পাঠ করেন নি। মহারাজা অবশ্য সেজন্যে বলেন নি কিছুই। তাগাদাও দেন নি। তবু নিজেরই কেমন একটা সঙ্কোচ লাগে। কাজ দেখাতে পারবেন না, অথচ মাস গেলে মাইনেটা নেবেন হাত পেতে।

কি লিখবেন? মেঘদূতের শ্লোকগুলো তখনো মধুর রাগিণীর মতো হৃদয়-বীণায় বেজে চলেছে। কৃষ্ণনগরে আসবার পর ঠিক করেছিলেন পর্যায়ক্রমে ঋতু বর্ণনা লিখবেন। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। বসন্ত বর্ণনার পরই হাত দিতে হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের উক্তিতে। রস

চাই সভাসদ্‌দের। কাঁচা আদিরস। ঋতু বর্ণনার মতো কাব্যের কচকচিতে মন ভোলবার নয় তাদের।

এই মুহূর্তে কিন্তু আদিরসের চিন্তা মনে আসে না। কেবলই আনাগোনা করে কোন এক বিরহী হৃদয়ের দুঃখ। কলমটা নিয়ে ঝুঁকে পড়েন। এক মনে লিখে যান—

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভুজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা॥
হিম শীত তারপর শীর্ণ করে কলেবর
পুণ্যবাদে যার ঘর সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ পুন ভোর পরবেশ
ভারত না গেল দেশ আরে আরে বর্ষা॥

লিখেই চমকে ওঠেন। বার বার পড়েন শেষ ছত্রটা। অশান্ত হাহাকারটা যেন ভাষার রূপ ধরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। 'ভারত না গেল দেশ'—হঠাৎ হাসি পায়। হৃদয়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। দেশ—ভারতচন্দ্রের দেশ নেই; আত্মীয়-স্বজন নেই; কেউ নেই। আকুল অন্তরে কেউ অপেক্ষা করছে না তাঁর ফেরার পথ চেয়ে; এই বিরাট পৃথিবীতে তিনি নিঃস্ব, রিক্ত, ক্ষত-বিক্ষত একজন পুরুষ। সীমাহীন একাকীত্ব নিয়ে যাকে চলতে হচ্ছে জীবনের পথে। এই ভাবেই চলতে হবে শেষ দিন অবধি।

সত্যিই বুঝি চিরসঙ্গী হয়ে রয়েছে এই নিঃসঙ্গতা। কোন্ অভিশাপে বলতে পারেন না। আরম্ভ হয়েছিল সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। অসহায় বালকের সেদিন সবাই থেকেও কেউ ছিল না। বাপ, মা, ভাই কেউ না। লুণ্ঠিত পাণ্ডুয়াগড়ের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ আক্রোশে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ক্ষমা করবেন না কাউকে। কোনদিন নয়। স্বার্থপর পৃথিবীর ওপর

রাগে, ঘৃণায় চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর পথ ধরেছিলেন নওয়াপাড়ার—মামাবাড়ির।

ঘটনাগুলো একের পর এক ছবির মতো পার হয়ে যেতে থাকে চোখের সমুখ দিয়ে। পাণ্ডুয়াগড়, নওয়াপাড়া, বসন্তপুর, কটক। রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার এক একটা স্মৃতিস্তম্ভ। নিষ্ঠুর, নিদারুণ ধূ ধূ শুধু। কোনদিকে কোন শ্যামলতা নেই। স্নেহ, প্রেম, ভালো-বাসাহীন রুক্ষ মরু-প্রান্তর।

প্রেমের কথাতেই স্মৃতির পাতাগুলো উলটে যায় অনেকগুলো বছর পেছনে। তারপর থমকে দাঁড়ায় কল্পলোকের সেই স্বর্গে। সারদাগ্রামে। কেবলই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছে নামটা। প্রথম আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর আকাশ সবকিছু যেন ওলট-পালট করে দিয়েছে আজ। যে স্মৃতি মনে পড়লেও হৃদয় দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, সেই স্মৃতির পানেই কল্পনার পাখা মেলে দিতে ভালো লাগে। ভ্রমরের মতো গুনগুন করতে চায় একটা স্নিগ্ধ শিখাকে ঘিরে। আচার্য-দুহিতা শ্রীরাধা। কত স্বপ্নই না রচনা করেছিলেন তাকে নিয়ে।

ম্লান অথচ মধুর একটা হাসি ফুটে ওঠে মুখের ওপর। আজ আবাব নতুন করে স্বপ্ন দেখতে থাকেন ভারতচন্দ্র। অনেকক্ষণ ধরে কৃপণের মতো হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। ম্লান হাসিটুকু এক অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরে যায়।

নওয়াপাড়া থেকে সারদাগ্রাম। প্রতিদিনের যাওয়া-আসার পথ। গুরুগৃহে দিনের পাঠ সাঙ্গ করে সন্ধ্যায় আবার ফিরে যেতেন মাতুলালয়ে।

সেদিনও নওয়াপাড়া ফিরছিলেন। সকাল থেকেই মনটা কেমন উদাস হয়ে ছিল। শরৎকাল এসে গেছে। মাথার ওপর প্রসন্ন আকাশ। শেফালীর গন্ধে দিগ্বিদিক মাতিয়ে ঘিরে আসছে সন্ধ্যা। এই রকম এক শরতেই পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদে সেই বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল। সেই চিন্তাতেই ডুবে ছিলেন। হঠাৎ সামনে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

পথের ধারে শেফালী গাছের তলায় বনদেবীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা আচার্য-কন্যা। তরুণী সন্ধ্যার সমস্ত লাবণ্য এবং সন্ধিক্ষণের সব রহস্য যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে তার দেহ-বল্লরীর প্রতিটি রেখায়।

শ্রীমতী। এতদিন পরেও কথাটা মনে পড়তেই মুখখানা লাল হয়ে ওঠে ভারতচন্দ্রের। ত্রস্তে ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। কেউ নেই। বাঈজী চলে গেছে অনেকক্ষণ হ'ল। কারো কানে যায় নি ডাকটা। অনেকদিন আগে রাধাকে এই নামেই একদিন ডেকেছিলেন। কি খেয়াল হয়েছিল জানেন না। হয়তো সদ্য-সমাপ্ত রাধা কৃষ্ণের পালা গানটাই সে খেয়ালের মূলে ছিল। আচার্যদেবের ঘর থেকে লুকিয়ে নিয়ে পড়েছিলেন বড়ুচণ্ডীদাসের পুঁথিখানা। রাধাই এনে দিয়েছিল।

শ্রীমতীকে আজ নতুন দেখছেন না তিনি। পাঠ অভ্যাসের জন্যে রোজই আসতে হয় সারদাগ্রামে। রাধাকে দেখেন; কথা বলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেবল রাধাকৃষ্ণের পুঁথিখানা লুকিয়ে ফেরত দিতে গিয়ে একদিন ওই চপলতাটুকু করে ফেলে-ছিলেন। ওই একদিনই মাত্র। ওইটুকু ছাড়া, বেদনাহত, স্তম্ভিত হৃদয়ে আর কোন দিন কোন চাঞ্চল্য জাগে নি।

সেদিন কিন্তু দেখলেন এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে। নিঃসঙ্গ, তরঙ্গ-হীন, জীবন-সরসীতে যেন দক্ষিণ বাতাস দোলা দিয়ে গেল। রহস্য-মুগ্ধ তরুণ হৃদয় কি এক দুর্বোধ্য হাহাকারের আবেগ নিয়ে সামনে দাঁড়াল তার।

—শ্রীমতী?

—তুমি? আমি ভেবেছিলাম কে না কে। এমন ভয় হয়েছিল। অপূর্ব একটা হাসির সঙ্গে রাধা আরক্ত হয়ে ওঠে।

মনে হয়েছিল কথা নয়, গান। হাসিটুকু দেখেই মনে পড়ে গিয়েছিল জয়দেবের একটা পদ—বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি

কৌমুদী ; হরতিদর তিমিরমতি ঘোরং॥ আবিষ্ট ভারত্ও হেসেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসেছিল—হাসলে যে ?

—তুমিও তো হাসলে।

—বাঃ রে। আমি হাসলে তুমিও হাসবে ?

—হ্যাঁ। আপত্তি আছে কোন ? তোমার ওই সুন্দর মুখের সামান্য একটু হাসি যদি জীবনে আমার আনন্দের জোয়ার এনে দেয়, তা হলে হাসবো না ? বল, জবাব দাও।

আগে হলে হয়তো এত কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু সেদিন যেন কথার ঝড় উত্তাল হয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে। আবার অনুবোধ করেছিলেন—জবাব দাও শ্রীমতী।

রাধা কিন্তু উত্তর দিতে পারে নি। নীরবে মুখখানা নামিয়ে নিয়েছিল শুধু।

নিঃশব্দতায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ভারতচন্দ্র ;—তোমার হাসি দেখে একটা কবিতা মনে পড়ে গিয়েছিল।

—কবিতা ? কবিতাও লেখো নাকি তুমি ?

—এই তো কথা ফুটেছে। ভারতচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন ; —কবিতাটা আমার নয়, মহাকবি জয়দেবের। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি এখনো।

গাল দুটো সিঁদুরের মতো হয়ে গিয়েছিল রাধার। গাছ থেকে একটা আধফোটা শেফালীর কুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে অবনতমুখে পাঁপড়ি-গুলোকে গুণতে আরম্ভ করেছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে।

কথাগুলো মনের ভেতরে দাপাদাপি করতে থাকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুমারসম্ভবের ছবি। দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের কাছে এসেছেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। পর্বতদুহিতা পার্বতীর সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ। পিতার পাশে বসে লজ্জারুণ পার্বতী মুখ নীচু করে খেলার ছলে পদ্মের পাঁপড়িগুলোকে গুণে চলেছেন। সেই একই ছবি। হৃদয়ের সেই একই চিরন্তন

স্বীকারোক্তি। শ্রীমতীর হৃদয়টাকেও পরিষ্কার দেখে নিয়েছিলেন ভারত। মুহূর্তের ভেতর জীবনের রঙ বদলে গিয়েছিল। ধূসর থেকে গাঢ় শ্যামল।

স্বপ্নটা আরো ঘন হয়ে ওঠে। তন্ময় হয়ে যান ভারতচন্দ্র। মধুর অতীতটাই বর্তমান হয়ে দাঁড়ায় স্মৃতিতে।

—বাবা সেদিন মায়ের কাছে তোমার কথা বলছিলেন। লজ্জাটাকে ঢাকবার জন্যে রাধা অন্য কথা পাড়ে।

—কি বলছিলেন ?

—খুব ভালো ছেলে। সব দিক থেকে একটা রত্ন।

—তাই নাকি ? কিন্তু তুমি কি বল ?

এক ঝলক রক্ত আবার আছড়ে পড়ে রাধার মুখের ওপর। চোখ দুটো নামিয়ে নেয়।

মানুষের স্বার্থপরতার দিকটাকেই এতদিন একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন ভারত। সেদিন আর একটা সত্য দেখতে পেলেন। স্বার্থপরতাই শুধু নয় ; আরো রয়েছে। প্রেম ; যে প্রেম জীবনকে জাগিয়ে তোলে, আনন্দে ভরে দেয়। সেই আনন্দই হৃদয়ের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে—আমার জীবনে কি ওই হাসি ছড়িয়ে দেবে না শ্রীমতী ?

—ন্‌না। দুর্বোধ্য একটা কটাক্ষ তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় রাধা।

অনুমানে ভুল হয় নি ভারতচন্দ্রের। সত্যি স্রোত বদলে গিয়েছিল জীবনের। সৌন্দর্যে ভরে উঠেছিল অন্তর। নিজেকে এতদিন বড় অসহায় মনে হ'ত। পাণ্ডুয়াগড় থেকে পালিয়ে পিতা নরেন্দ্র রায় সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন বসন্তপুরে। খবরটা পেয়েছেন তিনি। আর নরেন্দ্র রায়ও জানেন কনিষ্ঠ পুত্র ভারত রয়েছে মাতুলালয়ে। মামাই দিয়েছেন খবরটা। কিন্তু আশ্চর্য, বসন্তপুর তাঁর সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। মামাও অদ্ভুতভাবে চুপ মেরে গেছেন এ ব্যাপারে। জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পান নি ভারতচন্দ্র।

অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু বলেছিলেন একটা কথা। বসন্তপুরে যেন কোনদিন না যান তিনি। সেখানে কোন জায়গা তাঁর নেই।

কথাটা জেনে সেদিন প্রচণ্ড দুঃখ হয়েছিল। সারারাত ধরে কেঁদেছিলেন। আজ কিন্তু জানলেন আর একটা কথা। কেউ না থাকলেও, তাঁর সব আছে। কারণ প্রেম আছে জীবনে। এক শুভ মুহূর্তে এ অমূল্য রত্নকে পেয়েছেন।

সারদাগ্রামের দিনগুলো তারপর থেকে যে কিভাবে কেটে গিয়েছিল বুঝতে পারেন নি। স্বপ্নের ঘোরে যেন পার হয়ে এসেছিলেন। স্বপ্ন দেখতেন দুজনে; তিনি এবং শ্রীমতী। নিভৃত, একান্ত একটা প্রেমের কুঞ্জ; যেখানে পৃথিবীর কোন মলিনতা নেই।

শিক্ষা শেষ হয়ে এলো। অধৈর্য হৃদয় আর অপেক্ষা করতে চায় না। হৃদয়ের দূরত্বকে জয় করেছেন। কিন্তু দেহের দূরত্ব এখনো রয়ে গেছে আগের মতোই। গুরুগৃহ ছাড়বার পূর্বেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত করা দরকার। রাধারও একান্ত ইচ্ছা ছিল তাই। সেইজন্যেই একদিন স্পষ্ট করে দাবী জানিয়েছিলেন নরোত্তম দেবের কাছে।

আচার্যদেব বোধ হয় আগেই কিছুটা আঁচ করেছিলেন। তাই রাগ করেন নি। মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন শুধু—সব বুঝলাম ভারত। কিন্তু অনেক কিছু ভাববার আছে। বিয়ে করবো বললেই তো আর বিয়ে হয় না। তুমি হলে রাজপুত্র। রাধা গরীব অধ্যাপকের মেয়ে।

—চক্রের মতো ভাগ্য বদলায় গুরুদেব। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির। একদিন রাজপুত্র ছিলাম ঠিকই; কিন্তু আজ পথের ভিখারী ছাড়া কিছুই নই।

—যুক্তিটা তোমার ঠিক। তবু সমাজের দিকটাও তো দেখতে হবে।

—সমাজের দিক্?

—হ্যাঁ। আমরা তোমাদের চেয়ে নীচু ব্রাহ্মণ।

তরুণ শিষ্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন—যে সমাজের ভয় আপনি করছেন, সে সমাজ হ'ল ক্লীব। তার মিথ্যা অনুশাসনের চাইতে অনেক বড় সত্য হ'ল আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছি। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন। প্রেমের বুনিয়াদের ওপর আমরা নতুন সমাজ গড়বো।

—কিন্তু রাজা নরেন্দ্র রায় যদি অসন্তুষ্ট হন?

নরেন্দ্র রায়। থমকে গিয়েছিলেন ভারত। পরক্ষণেই দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন—তিনি আমার পিতা গুরুদেব। আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ তাঁকে চেনে না। তা ছাড়া, তিনি যদি অসন্তুষ্ট হনও, কিছুই যায় আসে না। ভাগ্যগুণে আপনার কাছে শিক্ষা পেয়েছি।

সারাজীবন ধরে বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়েছেন নরোত্তম দেব। সেদিন কিন্তু হার মেনেছিলেন নিজের শিষ্যের কাছেই। নীরবে আশীর্বাদ করেছিলেন দুজনকে।

তীব্র একটা বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে ফিরে আসেন ভারতচন্দ্র। মানুষের আশা কত ছলনাময়ী। যে তরীর ওপর ভরসা করে বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন, তা ছিল শতছিদ্র। যে মাটির ওপর প্রেমের সৌধ খাড়া করবেন ভেবেছিলেন, তা ছিল বালিতে ভর্তি। তাই বুনিয়াদটাই ধ্বসে পড়েছে তার।

সদ্য লেখা কবিতাটার দিকে আবার চোখ ফেরান—ভারত না গেল দেশ আরে আরে বর্ষা। আর দেশে যাবে না ভারত। মলিন একটা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় ঠোঁটের কোণে। ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেন। রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। কাল রাতে লেখা কবিতাটা শোনাতে হবে মহারাজাকে।

রাজসভায় প্রবেশ করতেই অভ্যর্থনার সমারোহ পড়ে যায় যেন। সব চাইতে বেশি উৎসাহ দেখায় গোপাল ভাঁড়। পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে জোড়হাতে সামনে দাঁড়ায় ;—আজ প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে হবে কিন্তু।

সন্দেহের দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার দেখে নেন ভারত। চাপা একটা হাসি মনে হয় সবাইর মুখে উঁকি দিচ্ছে। এমন কি মহারাজেরও। সকাল বেলাতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ভাবটাকে প্রকাশ করেন না। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন—রোজই তো প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি গোপাল।

—তা করেন। তবে আজ পরিমাণটা একটু বাড়াতে হবে।

—কেন বলো তো ?

—এমনিই। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত মানুষ। আপনাদের শ্রীচরণ ধরেই তো পড়ে আছি।

কথাটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বলেনও না কিছু। আসলে এই মূর্খ লোকটাকে কি জানি কেন, দেখতে পারেন না একে-বারেই। প্রথম থেকেই। তবু খাতির করতে হয়। মহারাজার প্রিয় বিদূষক। তাই খাতির করে সকলে।

বিড়বিড় করে আশীর্বাদ করেন। তারপর এগিয়ে যান। প্রণাম করে দাঁড়ান কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে।

—বস ভারত। আজ দেরি হ'ল যে ? শরীর ভালো তো ?

—ভালো মহারাজ। কাল রাতে একটা কবিতা লিখেছি। অনেক রাত অবধি জাগতে হয়েছিল।

—তাই নাকি ? কি বিষয়ে লিখলে ?

—ঋতুবর্ণনার পর্যায়ে বর্ষা নিয়ে।

—এর আগেরটা বসন্ত নিয়ে ছিল না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। শোনাও তো দেখি কি লিখলে।

সভাটাকে আরেক বার ভালো করে দেখে নেন ভারতচন্দ্র।

কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। কপট গাম্ভীর্যের মুখোস পড়ে বসে রয়েছে সবাই। সন্দেহটুকু দৃঢ় হয়। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। নতুন কোন আমোদের সন্ধান পেয়েছে রাজসভা।

চোখদুটো ফিরিয়ে নেন হাতের কাগজখানার দিকে। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে স্থির, গম্ভীর স্বরে পড়তে আরম্ভ করেন। গম্‌গম্‌ করতে থাকে নিস্তব্ধ সভাগৃহ। শেষ ছত্র পড়েন ঃ

ভারতের দুখ মূল ঃ কেবল হৃদয়ে শূল ঃ
ফুটিল কদম ফুল ঃ আঃ আরে বর্ষা॥

পড়া শেষ হয়। তবু কথা বলে না কেউ। নড়া-চড়ার শব্দ অবধি শোনা যায় না। দুর্ভাবনায় অধীর হয়ে উঠেন ভারত—কেমন লাগলো মহারাজ ?

—সেই কথাই ভাবছি। কৃষ্ণচন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলেন ; —সবই রয়েছে, কিন্তু—।

মুখের কথাটাকে কেড়ে নেন রুদ্ররাম তর্কবাগীশ—মহারাজ যথার্থই বলেছেন। সবই রয়েছে ; কিন্তু—।

—কিন্তু কি নেই তর্কবাগীশ মশাই ?

রুদ্ররাম কিন্তু মোটেই ঘাবড়ান না। একটু হেসে বলেন—সেই কথাই আপনার শ্রীমুখ থেকে শোনবার জন্যে সকলে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছি।

কৃষ্ণচন্দ্র হার মানেন। ভেবেছিলেন তর্কবাগীশকে জব্দ করবেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল না। উল্টে জব্দ হলেন নিজে। খোঁচাটা হাসিমুখে হজম করে নেন এখনকার মতো ;—গাছ রয়েছে ; ডালপালা, পাতা সবই রয়েছে। কেবল নেই রস। শুষ্কং কাষ্ঠং আর কি। তুমি কি বল গোপাল ?

—যথার্থ বলেছেন মহারাজ। রসহীন মিষ্টান্নের মতো লাগছে।

কাজীর দরবারে যেন বসেছে আসামীর বিচারসভা। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শুনতে থাকেন ভারতচন্দ্র। অনেক যত্ন করে লিখেছিলেন

কবিতাটা। অনেক দরদ মিশিয়ে ; মনের দুঃখে। কিন্তু হৃদয়হীন রাজসভা অনুভব করলো না সে দুঃখ।

গোপাল ভাঁড়ের মন্তব্যটা লুফে নেন কৃষ্ণচন্দ্র—ঠিক উপমা দিয়েছো গোপাল। রসহীন মিষ্টান্ন।

—কিংবা যৌবনহীন যুবতীও বলতে পারেন।

—সাবাস গোপাল। বিদূষক অর্থে তুমি কেবল ভাঁড়ই নও ; ভাণ্ডও। রসের ভাণ্ড।

কথাটা বলেই ফিরে তাকান নির্বাক্ ভারতচন্দ্রের দিকে—রসের ভিয়ান চড়াও কবি। ওসব জোলো কবিতায় কাজ হবে না।

—ভিয়ান চড়াবেন কি? চিনিই যে নেই। গোপাল ভাঁড় আবার মন্তব্য করে।

—সে কি?

—হ্যাঁ মহারাজ। আজ সকালেই এ সম্বন্ধে আপনার কাছে নালিশ এসেছে। ফরিয়াদী এখনো বসে আছে বিচারের জন্যে। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

চাপা হাসিটা এবার ফেটে পড়ে। হতভম্ব ভারতচন্দ্র বুঝতে পারেন না কিছুই। কে ফরিয়াদী, কিসেরই বা ফরিয়াদ। উদ্বেগে ঘামতে থাকেন শুধু।

—না, ভুলি নি গোপাল। সত্যিই তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এসেছে কবি।

এতক্ষণে কথা ফোটে ভারতচন্দ্রের মুখে। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করেন—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো কোন অপরাধ করি নি মহারাজ।

—করেছো। সেই অভিযোগ নিয়েই এসেছেন আমাদের রাজনর্তকী।

বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যান কৃষ্ণচন্দ্র ;—সুরত অভিলাষিণী বাঈজীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছো। তার চুম্বনকে উপেক্ষা করে

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। পুরুষোচিত কাজ তো হয়ই নি। বরং হয়েছে নারীর অপমান। এ অপরাধ গুরুতর কবি। শাস্তি ভয়ানক। সভাই স্থির করবেন, কি সাজা তোমায় দেওয়া যায়।

এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যায় সবকিছু। প্রিয়ম্বদার গত রাতের অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারেন ভারতচন্দ্র। সেটাও ছিল মহারাজের একটা কৌতুক। লজ্জায়, ঘৃণায় মাথা নীচু করে নেন।

—চুপ করে থাকলে চলবে না কবি। বলো, অপরাধ স্বীকার করছো কি না?

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করেন ভারত। এই সভাতেই যখন থাকতে হবে, তখন গায়ে মাখলে চলবে না এসব। যে করেই হোক একটা আপস করতে হবে। কর্তব্য স্থির করে নিয়ে মুখ তোলেন—ঘটনাটা স্বীকার করছি মহারাজ; কিন্তু অভিযোগটা নয়।

—কি রকম? কৃষ্ণচন্দ্র আশ্চর্য হন।

—আপনার পাঠানো বাঈজীকে অপমান করবার ইচ্ছায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিই নি।

—তবে?

—ভয়ে বলবো, কি নির্ভয়ে বলবো?

—নির্ভয়ে বলো।

ভারতচন্দ্র একবার আড়চোখে তাকাল বাঁ-দিকে। কৌতুকে ঝিকমিক করছে প্রিয়ম্বদার চোখ দুটো। দেখে যেন মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সঙ্কোচটুকু ঝেড়ে ফেলে দৃঢ়স্বরে বলেন—বাঈজীর পীনোন্নত পয়োধরযুগল বড় কঠিন লাগলো মহারাজ। এমন আঘাত পেলাম, মনে হ'ল বুঝি বুক ভেদ করে বৃন্তদুটো পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার কোমল শরীরে সে আঘাত সইতে পারি নি। ব্যথা সামলাবার জন্যে তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

সভাগৃহ একটুখানি থমকে থাকে। পরক্ষণেই দমকা হাসিতে

লুটিয়ে পড়ে। অতি কষ্টে হাসি থামান কৃষ্ণচন্দ্র—সাধু কবি, সাধু। কে বলে তোমার প্রাণে রস নেই? গোপাল!

—যে আজ্ঞা মহারাজ।

—কবির কাছে ক্ষমা চাও।

হাতজোড় করে ভারতচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ায় গোপাল ভাঁড়—মহারাজার আদেশ না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কবি যা বললেন, তা'তে রস রয়েছে একথা প্রমাণ হয় না।

—কেন?

—মুখের কথায় নয় মহারাজ, প্রত্যক্ষভাবে সে রস আমরা চোখে দেখতে চাই। তবেই বুঝবো এবং মেনে নেবো।

—ঠিক। কবি, তুমি আমার পারিষদ্‌দের ইচ্ছা পূর্ণ করো।

ভারতচন্দ্র একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—হুকুম শিরোধার্য মহারাজ। তবে কিছুটা সময় দিতে হবে। .

—কত দিন?

—তা বলতে পারি না। কাব্য-লক্ষ্মী সদয় হলেই রসের ভিয়ান চড়াবো। প্রতিজ্ঞা করলাম!

—তিনি কবে নাগাদ সদয় হবেন কবি?

ভারতচন্দ্র অতি দুঃখে হাসেন—সে কথা কি বলা যায়। তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে কিছুই হয় না।

—ইচ্ছেটা যাতে তিনি একটু তাড়াতাড়ি করেন সেই চেষ্টাই করো কবি। রাজসভা ক্ষুধার্ত। বেশি দেরি সহ্য হবে না।

মনে হয়, প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী। ক্ষুণ্ণ মনে আসন গ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র। ভেতর থেকে একটা প্রতিবাদ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। এই বেরসিক সভায় বাদানুবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। নিজের অপমানটাই বাড়বে শুধু। অন্য কোন ফল হবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন। মৃদু হেসে বলেন—রসিকতা করেছিলাম ভারত। তোমার প্রয়োজন মতো সময় নাও। তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই।

—যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করবারই চেষ্টা করবো মহারাজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ; মহারাজ যখন আদেশ করেছেন, তখন যত শীঘ্র সম্ভব করা উচিত। পণ্ডিত রুদ্ররাম এতক্ষণে ফাঁক পান কথা বলবার। —তা'ছাড়া।

—তা'ছাড়া, রসটা যেন কড়া পাকের হয় মহারাজ। রুদ্ররামকে চাপা দিয়ে গোপাল ভাঁড় টিপ্পনী কাটে।

বিরস মুখে বসে পড়েন তর্কবাগীশ। সে দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোপাল ভাঁড় মুচকি হাসে; —হুকুম মতোই যখন কাব্য রচনা হবে, তখন কড়া পাকেরই হুকুম করা হোক।

—তাই হবে গোপাল। আমার সভাকবি কখনো কাঁচা কাজ করবেন না। সে বিশ্বাস আছে। তবে বিচার্য হ'ল, হুকুম মতো কাব্য রচনা করা যায় কিনা। এ বিষয়ে আপনার মত কি তর্কবাগীশ মশাই?

রুদ্ররাম আবার উঠে দাঁড়ান। মুখখানা জ্বল জ্বল করতে থাকে। বলেন—যায় মহারাজ।

—আপনি পারেন?

—না, তা পারি না। কারণ, আমার কাজ কাব্য রচনা করা নয়। সমালোচনা করা। কিন্তু সভাকবির কাজই হ'ল কবিতা লেখা। তাই ওঁকে পারতেই হবে।

—তোমার মত কি কবি?

—আমার কোন মতামত নেই। তবে চেষ্টা করবো। আশা করি রাজসভা নিরাশ হবে না।

সভার রীতি অনুযায়ী আলোচনার ছেদ টেনে রায় দেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র;—আপনাদের সবারই ভুল হয়েছে। সব কাজ হুকুম মতো করা যায়। যায় না কেবল লেখা। কারণ কাব্যের কারবার মনের সঙ্গে। শরীরের সঙ্গে নয়।

ঋতুর পরিবর্তন হয় অমোঘ নিয়মে। বর্ষা থেকে বসন্ত। চৈত্রের ঝরা পাতার ওপর সবুজের পরশ লাগে। ময়ূরের ডাক শোনা যায় না আর। তার বদলে পাগলের মতো ডেকে যায় কোকিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিরামহীন। রাজউদ্যানে যেন ঋতুরাজের উৎসব আরম্ভ হয়।

কিন্তু সভাকবির হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তোলে না কোন বসন্ত-রাগ। হৃদয়-মন নিবদ্ধ করে আরাধনা করেন দেবী ভারতীর। দিনের পর দিন চলে যায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আদিরসকে কতখানি সুন্দর করে পরিবেশন করা যায় দেখিয়ে দেবেন অরসিক রাজসভাকে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বুঝি রাখতে পারেন না আর। দয়া হয় না কাব্য-লক্ষ্মীর।

একটা ছত্রও বেরোয় না কলম দিয়ে। হতাশ হয়ে পড়েন ভারতচন্দ্র। ব্যর্থতা যত বাড়তে থাকে, ততই পৃথিবীর ওপর রাগে, দুঃখে পাগলের মতো হয়ে যান। দেবী ভারতীর আরাধনা হ'ল সৌন্দর্যের সাধনা। সেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে বসলেই আরো গভীরভাবে মনে পড়ে যায় অসুন্দরতার কথা; অপূর্ণতার বেদনা। প্রেম অপূর্ণ, সুখ পরিমিত, সৌন্দর্য খণ্ডিত। পূর্ণ যা রয়েছে, তা হ'ল স্বার্থপরতা, দুঃখ এবং কলুষতা।

তবু উপাসনায় ছেদ পড়ে না। সৌন্দর্যের উপাসক কবি আপ্রাণ চেষ্টা করেন যা কিছু অসুন্দরতার কথা, সব ভুলে মনকে সুন্দরের প্রতি কেন্দ্রীভূত করতে। রসমঞ্জরী কাব্য গুঞ্জন করতে থাকে মাথার মধ্যে। প্রকৃত রাজসভার মতো করেই লিখবেন। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল কথা দিয়েছেন মহারাজকে। আর সময় নেওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত রাজসভা হয়তো সহ্য করতে পারবে না ক্ষুধার তাড়না।

আর একটা প্রভাত আসে। রাজপ্রাসাদের নহবৎখানায় বেজে ওঠে শানাই। ললিত-ভৈরবের মধুর মূর্ছনা দিয়ে স্বাগত জানায় নব বসন্তের প্রভাতকে।

বাইরে দিনের আলো ফুটে উঠলেও, মাধবী-মালঞ্চের কুটিরে তখনো জ্বলতে থাকে মাটির প্রদীপ। বিরহী একটা কোকিল কোথায় যেন আকুল স্বরে ডেকে চলেছে। ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন ভারতচন্দ্র। জানালা দিয়ে দৃষ্টিটাকে একবার বাইরে মেলে দেন। কোকিলের ডাক ওই দিক থেকেই আসছে।

পাখিটাকে কিন্তু দেখা যায় না। তার বদলে নজরে পড়ে বিচিত্র একটা দৃশ্য। পত্রবিহীন শীর্ণ পলাশ গাছটার ডাল ভেঙে ফুল ফুটেছে। কামনার আগুনে আরক্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী। তাড়াতাড়ি চোখ দুটো ফিরিয়ে নেন। আগুনের আঁচ বুকে এসে লাগছে যেন।

খাতাখানার ওপর ঝুঁকে পড়েন। সময় বয়ে যায়; তবু বুঝি দয়া হয় না দেবী ভারতীর। প্রথম কয়েকটি ছত্র লেখার পরই কলম আটকে গেছে। কলম না বলে, কল্পনা বলাই উচিত। থমকে দাঁড়িয়েছে কল্পনা। যথারীতি রাধাকৃষ্ণের বন্দনার পর লিখেছিলেন রাজার গুণগান। সেই অপরাধেই বোধ হয় রুষ্ট হলেন বাগ্‌দেবী।

রাজ-বন্দনার অংশটুকু যেন ভেংচি কাটে। আবার পড়েন ভারতচন্দ্র:

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ   সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরতে রাজধানী।
সিন্ধু, অগ্নি রাহু মুখে   শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী॥

সত্যিই নির্লজ্জ স্তুতি। নিজেরই কেমন লজ্জা করতে থাকে। যা বিশ্বাস করেন না, তাই লিখেছেন। অজ্ঞাতেই রাজসভার কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন ক্রমশ। প্রতারণা করেছেন নিজের সঙ্গে।

একবার ভাবেন নষ্ট করে ফেলবেন। কেউ দেখে ফেলার

আগেই। নতুন করে শুরু করবেন। কিন্তু মন ওঠে না। পরম-স্নেহে খাতাখানা তুলে নেন। ভালোই লাগে পড়তে। স্তুতি হলেও, মুনশীয়ানা রয়েছে অলংকার দিয়ে সাজাবার।

—কবি আছো নাকি?

—কে? চিন্তামগ্ন ভারতচন্দ্র চমকে ওঠেন।

হাসিমুখে কুটিরে প্রবেশ করে প্রিয়ম্বদা: —লেখা কতদূর এগুলো?

—সবে আরম্ভ করেছি। খাতাটা বন্ধ করে একধারে সরিয়ে রাখেন ভারতচন্দ্র। তারপর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন—এ ক'দিন দেখি নি যে?

—রোজ আসতে হবে এমন কোন কথা রয়েছে নাকি?

—তা নেই। তবে, আগে আসতে।

—আসতাম নিজের গরজে।

—আজকের গরজটা কি শুনতে পাই না? নতুন কোন মতলব নেই তো?

ইঙ্গিতটুকু ছিল পূর্বের ঘটনাটার প্রতি। প্রিয়ম্বদা প্রথমে অতটা খেয়াল করে না। বলে—এমনিই এলাম। অনেকদিন দেখি নি তোমায়। রাজসভাতেও যাও না।

ইদানীং সত্যিই রাজসভায় হাজিরা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। বিনা কারণে যেয়ে শুধু নোংরা ভাঁড়ামি আর চাটুকারীতা শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করেন না। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেন—সত্যিই কি আমাকে দেখতে এসেছো?

এবার কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরে ফেলে প্রিয়ম্বদা। দুঃখিত স্বরে বলে—তোমায় তো সবই খুলে বলেছি। ক্ষমাও চেয়েছি। মহারাজার হুকুমেই অমন কাজ আমায় করতে হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। সত্যিই ক্ষমা চেয়েছিল বাঈজী। আন্তরিক ভাবেই। নিজেও বিশ্বাস করেছেন তিনি। তবু কেন যেন ভুলতে পারেন না কিছুতেই। যখনই নর্তকী আসে,

একবার করে শুনিয়ে দেন। খোঁচা দেবার লোভ দুর্বার হয়ে ওঠে। রাজসভার বদ অভ্যাস বোধ হয় তাঁর মধ্যেও এসে গেছে।

—বলো তো চলে যাই। আর কখনো আসবো না।

—সে কি? নিছক রসিকতা করে বললাম।

—তোমার কাছে হয়তো রসিকতা কবি। কিন্তু আমার কাছে বড় লজ্জার। অপরাধ করেছি, ক্ষমাও চেয়েছি। কিন্তু যখনই আসি, একবার করে খোঁচা দাও। কি আনন্দ পাও জানি না।

ভারতচন্দ্র আরো বিব্রত বোধ করেন;—আর কখনো বলবো না প্রিয়ম্বদা। বসো। এবারকার মতো মাপ করো।

—ছিঃ ছিঃ; তুমি ব্রাহ্মণ। এসব কথা বলে আরও অপরাধী করছো আমায়।

একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়—যাক, বাদ দাও এ সমস্ত। কোন্ কাব্য আরম্ভ করলে?

—রসমঞ্জরী।

—রসমঞ্জরী কাব্য ভানুদত্ত মিশ্র লিখে গেছেন না?

—রসমঞ্জরীও পড়েছো নাকি? ভারতচন্দ্র অবাক্ হন;—তা'হলে তো প্রায় সবই পড়া আছে তোমার।

মুচকি হেসে জবাবটা এড়িয়ে যায় বাঈজী;—একজনের লেখা কাব্য আবার লিখছো? সেটা কি ঠিক হবে? নতুন কিছু লেখো না তার চাইতে।

—নতুন করেই লিখছি। ভানুদত্ত লিখেছেন সংস্কৃতে। আমি লিখছি বাংলায়।

—বাংলায়? রাজনর্তকী আশ্চর্য হয় এবার।—দেখি কতদূর হ'ল।

—এই তো সবে শুরু করলাম।

—যেটুকু লিখেছো তাই দেখি।

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে খাতাখানা টেনে নেয়। তারপর চোখ বুলিয়েই হেসে গড়িয়ে পড়ে—বাঃ, এবার দেখছি গোপাল ভাঁড়ের চাকরী গেল।

—কেন ?

উত্তর না দিয়ে প্রিয়ম্বদা আবৃত্তি করেঃ কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ।

ওইটুকু পড়েই থেমে যায়—রাজসভায় এইটেই হবে তোমার প্রথম বড় কাব্য। তাই না ?

—হ্যাঁ।

—প্রথম চালেই তো বাজী মাৎ হবে।

ভারতচন্দ্র বিমূঢ়ভাবে তাকান ;—মানে ? কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝলে না ? গোপাল ভাঁড় মূর্খ। তাই তার খোসামোদ-গুলো হয় কাঁচা ভাঁড়ামি। চটক থাকে না কোন। কিন্তু তুমি পণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্যভরা খোসামোদে মহারাজা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবেন।

এই চিন্তাটাই আগাগোড়া বিঁধছিল মনের মধ্যে। ভারতচন্দ্রের মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। যে রাজসভাকে এত ঘৃণা করেন, সেই সভাই রাহুর মতো তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। কুরুচির স্রোতকে বদলে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তার বদলে নিজেই ভেসে পড়েছেন সেই তীব্র স্রোতে।

এ আসলে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই শাস্তি। যার প্রতি এতটুকুও বিশ্বাস নেই, তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা। যাকে ঘৃণা করেন, তারই আকর্ষণে অন্ধের মতো ছুটে চলা। মানুষের পক্ষে এর চাইতে বড় অপমান বোধ হয় আর হয় না। নিজেকে নিজেই অপমান করা। ইতস্তত করে বলেন—কি করবো বল ? টাকার জন্যে কবি আজ রাজসভার দাস হয়ে পড়েছে। এমনি করেই একদিন মনুষ্যত্বটুকুও খোয়াবো।

অকৃত্রিম দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নেন ভারতচন্দ্র। কিছুটা অভি-মানেও। প্রিয়ম্বদা লক্ষ্য করে। এতক্ষণ একটা রসিকতার ছোঁয়াচ ছিল গলায়, এবার কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায় ;—রাগ করলে ?

—না ; রাগ করবো কেন ? করবোই বা কার ওপর ? তোমার কাছ থেকে তো আর কোন সহানুভূতি আশা করি না। রাজসভার কারো কাছ থেকেই না।

—তবে ?

—দুঃখিত হয়েছি।

—কেন ?

—আমার অসহায় অবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করলে বলে। সব সইতে পারি। পারি না কেবল উপহাস সইতে।

একটু চুপ করে থেকে আবেগটা সামলে নেন,—অবশ্য দুঃখিত হবারও কোন যুক্তি নেই। ঠিক কথাই বলেছো। তবু হজম করা একটু কঠিন। যদিও হজম করতেই হবে। অসহায় মানুষের ওপর জুলুম করাই রাজার ধর্ম। রাজসভারও তাই।

গম্ভীর মুখখানা সহানুভূতিতে কোমল হয়ে ওঠে বাঈজীর। একটু কাছে সরে আসে ;—এ তোমার ভুল ধারণা কবি।

—কোন ধারণ ? নিস্পৃহ কণ্ঠে ভারতচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন।

—ওই যে বললে অসহায় অবস্থা।

—তাই নাকি ?

হ্যাঁ ; বাঈজীর স্বরটা দৃঢ় হয়ে ওঠে ;—তুমি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র। অসহায় নও। গণ্ডগোল বেধেছে এটা ভুলে গেছো বলেই।

—সত্যিই ভুলে যেতে বসেছি প্রিয়ম্বদা। রাজসভাই ভুলিয়ে দিচ্ছে।

—রাজসভা নিজের পথে চলেছে। তাই বলে তুমিও সেই পথ ধরবে ?

—উপায় কি ?

—তার আমি কি জানি ? উপায় বার করতে হবে তোমায়।

—মানে ? নিরাসক্ত ভাবটা কেটে যায় ভারতচন্দ্রের। উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

বাঈজী কিন্তু সে ধার দিয়েও যায় না। আলোচনাটাকে হঠাৎ অন্য পথে ঘুরিয়ে দেয় ;—এ তর্ক আপাতত মুলতবী থাক। বরং যাতে হাত দিয়েছো, তার কথাই বল। রসমঞ্জরী তো লিখছো। নায়িকাদের পরিচয় থাকবে তো ?

—নায়িকাদের পরিচয় ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমাদের পণ্ডিতী ভাষায় যাকে নায়িকা-প্রকরণ বলে।

মৃদু হাসির সঙ্গে বক্তব্যের জের টানে ;—কবিদের ওই এক দোষ। কাজকর্ম নেই ; খালি বাজে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো।

কটাক্ষটা গায়ে মাখেন না ভারতচন্দ্র। বলেন—থাকবে।

—ক' রকমের নায়িকার পরিচয় দেবে ?

—তিন রকমের। স্বীয়া, পরকীয়া আর সামান্য-বণিতা।

—আমাকে কোন্ পর্যায়ে ফেলবে ?

—কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে লিখছি না প্রিয়ম্বদা। অতএব তোমার কথাই ওঠে না এখানে।

বাঈজী আবার হাসে :—ব্যক্তি বিশেষকে নিয়েই কবিরা কল্পনার জাল বোনে। রসমঞ্জরী যখন লিখছো, তখন আমার কথা যে থাকবেই তা বাজী ধবে বলতে পারি।

বলতে বলতে মুখের ভাবটা কেমন করুন হয়ে পড়ে ;—'স্বীয়া' হব না জানি। 'পরকীয়া'ও হব না ; কারণ যে 'স্বীয়া' হতে পারে না, সে 'পরকীয়া'ও হতে পারে না। তবে কবি যদি সন্তুষ্ট হন, বড় জোর কোন এক বসন্ত রজনীতে সামান্য-বণিতার আসন হয়তো পেয়ে যেতে পারি। এক কাজ করো। সামান্য-বণিতার পরিচয় যখন লিখবে, তখন আমাকে কল্পনা করে নিও। খুব জীবন্ত হবে।

স্তম্ভিত হয়ে যান ভারতচন্দ্র। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন বাঈজীকে। আজ অবধি ঠিক মতো চিনে উঠতে

পারলেন না। একবার মনে হয় সব কলুষতার উর্ধ্বে বিকশিত পদ্মফুল। রুচিশীলা, বিদগ্ধা নারী। কালিদাসের প্রিয়সখি ললিত-কলাবিধৌ।

আবার এই নারীকেই কখনো কখনো মনে হয় কামনা-কলুষিত দুর্গন্ধের মতো। দেহের বন্ধনে আবদ্ধ অশ্লীল বারবিলাসিনী।

—কই, জবাব দাও।

—কি জবাব দেবো?

—তাও আমাকে বলে দিতে হবে?

—জবাবের ভাষা আমার নেই প্রিয়ম্বদা।

পরমাশ্চর্যের ভান করে রাজনর্তকী—সে কি? এ যুগের কলিদাসের মুখে ভাষা নেই?

—সত্যিই নেই?

—কেন?

উত্তরটা দেবেন না ভেবেছিলেন ভারতচন্দ্র। সত্য হলেও, অপ্রিয়। না বলাই ভালো। কিন্তু না বলেও পারেন না—নেই, কারণ তোমায় আজো ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না। কখনো মনে হয় দুর্গন্ধময় নরক। কখনো—।

মাঝপথেই প্রিয়ম্বদা বাধা দেয়—কখনো কি মনে হয়?

—অনন্যা।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে মনের ইচ্ছাটাকেই যেন সামনে ধরে দেন;—সেইজন্যেই তোমার কোন অশ্লীলতা বা রুচিহীনতা দেখলে দুঃখ পাই প্রিয়ম্বদা।

কথাটাতে কোন লুকোচুরি ছিল না। সরল ভাবেই অন্তরের প্রশ্নকে প্রকাশ করেছিলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু তারই প্রভাবে ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ বদলে যায়।

পরিহাস-মুখর রাজনর্তকী প্রথমটা চমকে উঠেছিল। সমস্ত চপলতা মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়। সজল, অতল চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। কাঁপা গলায় বলে—ভুল করলে কবি। আমি

অনন্যা নই। অতি সাধারণ একজন বারবণিতা। চরিত্রহীনা রমণী। যার ছায়াতেও অশ্লীলতা রয়েছে।

ভারতচন্দ্রের গলাটাও ধরে এসেছিল। অনুনয়ের স্বরে বলেন —ভুল যদি করেও থাকি প্রিয়ম্বদা, তবু সে ভুল মধুর। মনকে অনেক উঁচুতে তুলে দেয়। দোহাই তোমার, সে মাধুর্য ভেঙে দিও না।

মুখখানা নামিয়ে কথাগুলো শোনে রাজনর্তকী। বুকের ভেতর যেন অশান্ত ঝড় বইতে থাকে। ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দেয়। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো জানালা দিয়ে এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ে। আঁচলের তলা থেকে মল্লিকার মালাটা সাবধানে বার করে কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ স্বরে বলে—এ সম্মানের যোগ্য আমি নই। তবু, আমার ঘৃণ্যজীবন আজ ধন্য হয়ে গেল কবি।

বহুবল্লভা নারীর অন্তর থেকে এক অপূর্ব, শাশ্বত সত্য ফুটে বেরোয়। পঙ্কিলতার ভেতরেও শুভ্র, অম্লান পবিত্রতা। সে মুখের দিকে চেয়ে চিত্রার্পিতের মতো বসে থাকেন রাজসভা কবি। চোখ ফেরাতে পারেন না। কি একটা জিনিস ধরা দিয়েও যেন পালিয়ে যাচ্ছে। সামনে এসেও, সরে যাচ্ছে বারংবার। মনে হয়, যা এতদিন ধরে পাগলের মতো খুঁজে বেরিয়েছেন, তা আজ মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অবগুণ্ঠনটুকু না থাকলেই সব স্পষ্ট হয়ে যেত।

ক্ষণেকের জন্যে বাঈজী আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। সামলে নিয়ে ম্লান হাসে—অমন করে কি দেখছো ?

—তোমাকে।

—সে তো প্রায় রোজই দেখছো।

—তা ঠিক ; কিন্তু সে দেখা হ'ল রাজনর্তকী প্রিয়ম্বদাকে।

—আর আজ ?

—আজ দেখছি তার অন্তরকে। যেখানে সে রাজনর্তকীর চেয়ে অনেক বড়

আর বুঝি নিজেকে, সামলাতে পারে না প্রিয়ম্বদা। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। প্রসঙ্গটাকে পাল্টাবার জন্যেই বোধ হয় প্রশ্ন করে —সে আবার কি জিনিস কবি?

—কি জিনিস তা বোঝাতে পারবো না। তবে এইটুকু জানি, মানুষের অন্তর হ'ল ভগবানের আসন। সেই সত্যই আজ আবার নতুন করে অনুভব করলাম।

—তাই, না আর কারো কথা মনে পড়ে গেল?

গভীর বেদনার একটা ছায়া মুখের ওপর দিয়ে ভেসে যায় ভারতচন্দ্রের। আনমনা হয়ে পড়েন ;—মনে করবার মতো কেউ নেই।

—কেন ; ঘরে তোমার পথ চেয়ে বসে নেই কেউ?

—না।

—সে কি? বিয়ে করো নি এখনো?

—করেছি প্রিয়ম্বদা।

—তবে?

তবে—। বলতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যান ভারতচন্দ্র। তাঁকে মনে করবার মতো সত্যিই আজ কেউ নেই। মনে করবার পালাটা এখন কেবল তাঁরই।' স্মৃতির বন্ধ দরজার সামনে শুধু মাথা কোটা। সে দিনগুলো কি চিরকালের জন্যে ভোলা যায় না? মুছে ফেলে দেওয়া যায় না মনের পাতা থেকে?

একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি মানসনেত্রে ভেসে ওঠে। সারদা গ্রামের সেই মধুর সন্ধ্যা ; পঞ্চদশী তরুণী রাধার লাজ-রক্ত মু উৎকণ্ঠায়ভরা নিদ্রাহীন রাতের পর রাত। সেদিন তাঁর মরুভূ মতো জীবনে কিছু না থেকেও সব ছিল ; কারণ রাধা ছি আজ সব হারিয়েছেন ; কারণ রাধা নেই। প্রেমহীনা রাধা জীবনে মৃত ছাড়া আর কি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেন—সে অনেক ক প্রিয়ম্বদা।

—শুনতে পাই না ?

—কি করবে শুনে ?

—আর কিছু করতে না পারি, অন্তত সহানুভূতিটুকু তো জানাতে পারবো।

অকৃত্রিম সহানুভূতির স্পর্শ সত্যিই ছিল কথাটাতে। মাধবী-মালঞ্চের কুঠির সহসা যেন বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। জানালা দিয়ে পলাশ গাছটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভারতচন্দ্র। থোকা থোকা লাল ফুলগুলোকে রক্তের ফোঁটার মতো দেখায়। হৃদয়ের রক্ত। বেলা বেড়ে ওঠে।

অবশেষে প্রিয়ম্বদাই নিঃশব্দতা ভাঙে ; —কই, বললে না।

গভীর নিদ্রা থেকে যেন জেগে ওঠেন ভারতচন্দ্র ;—কি বলবো প্রিয়ম্বদা ? জীবনে দেখেছি শুধু স্বার্থের সংঘাত। পিতার, ভ্রাতার, স্ত্রীর, সবাইয়ের। তাই বলবার আমার কিছুই নেই। বলতে পারি কেবল মোট ফলাফল। ঘটনা শুনে কি করবে ?

—বেশ তো ; ফলাফলই না হয় শুনি।

—প্রেমের চাইতে প্রেমের আবির্ভাবই বেশি সুন্দর। পাওয়ার চেয়ে পাবার প্রতিশ্রুতিটাই বেশি মধুর। তার বাইরে গেলেই এসে পড়ে হীন স্বার্থ। তাই বোধ হয় কাব্যে সব থেকে বড় করে দেখানো হয়েছে পরকীয়া প্রেমকে। সেখানে তো আর দেনা-পাওনার সম্পর্ক নেই।

বাঈজী হাসি সামলাতে পারে না। বলে—হয়তো হবে। আমার ভাগ্যে তো আব ওসব জুটলো না।

—হয়তো নয়, সত্যিই। আসলে সব মাধুর্যই হ'ল মনগড়া ; স্বপ্নে ঢাকা। দূরে থাকে বলেই তাদের আকর্ষণ। কাছে আসলে, পেলে, আসল চেহারাটা ধরা পড়ে। আর, সেই চেহারা দেখে স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়। আঁতকে উঠি আমরা।

কথাগুলো বোধ হয় রেখাপাত করে না রাজনর্তকীর মনে। আবার হাসে ; —একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ? চটবে না তো ?

—কি কথা ?

—জীবনে কি খুব দুঃখ পেয়েছো ?

—দুঃখ জীবনের সঙ্গী প্রিয়ম্বদা।

—তা জানি। আমি বলতে চাইছি—। সঙ্কোচে কথাটা আটকে যায়।

—কি বলতে চাইছো ?

অহেতুক সঙ্কোচটাকে ঝেড়ে ফেলে বাঈজী ;—বলতে চাইছি, তুমি হয়তো এমন একটা কিছু চেয়েছো, যা পাও নি।

ভারতচন্দ্র বিমর্ষভাবে হাসেন। সত্যিই পান নি। এমন একটা জিনিস, যা কল্পনা করেই বোধ হয় সন্তুষ্ট থাকে লোকে।

চেয়েছিলেন প্রেম। প্রতিদিনকার সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, লেন-দেন সব বাদ দিয়ে শুধুই প্রেম। যা কোনদিন স্বার্থের আবর্তে পড়ে মলিন হবে না। কিন্তু পেলাম না। সারদাগ্রামে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় আচার্য-কন্যা শ্রীরাধাকে দেখে এক পুণ্য মুহূর্তে যে প্রেম পিপাসা হৃদয়ে জেগেছিল, তা আজো মিটলো না। ভেবেছিলেন, রাধা হয়তো দিতে পারবে। কত আশা, কত স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলেন। ভুল হয়েছিল সেখানেই। জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই প্রকাণ্ড ভুল। যা আজো শোধরানো গেল না।

শোধরানো হয়তো যেতো যদি বিশ্বাসটুকুও অন্তত থাকতো। রাধা যে বিশ্বাসই করে না এধরনের কোন প্রেমের অস্তিত্বে। অথচ এই শ্রীমতীই অন্য কথা বলতো বিয়ের আগে। স্বপ্ন দেখতো তাঁর সঙ্গে। এক রাত্তিরের ব্যবধানেই আগাগোড়া বদলে গেল।

আজ এ সমস্ত কথা আলোচনা করতেও বুক ভেঙে যায়। তাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন—মানুষ তো কত কিছুই চায়। সবই কি পায় ?

—পায় না জানি। আর না পেলেও, সব ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এমন চাওয়াও তো রয়েছে, যা না পেলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি সেই চাওয়ার কথাই বলছি।

আর কথা বাড়ান না ভারতচন্দ্র। ভালো লাগে না। অন্তর্দাহ তীব্র হয় শুধু এসব আলোচনায়। জবাব দেন—ঠিকই ধরেছো প্রিয়ম্বদা। যে নারীর কথা একটু আগে বললে, তার বোধ হয় হৃদয় নেই।

—মানে? রাজনর্তকী আশ্চর্যভাবে তাকায়।

—তাকে বিয়ে করে কেবল একটা নারীর দেহই পেয়েছি। আমার বিদেশ-বাসে তাই সে প্রোষিত প্রিয়তমা নয়, প্রোষিত-ভর্তৃকা মাত্র।

একটু থেমে দুঃখিত স্বরে বলেন—কিন্তু আমি তো তার কাছে তা চাই নি।

বাঈজী হেসে ফেলে কথাটা শুনে—তবে কি চেয়েছো? নারীর কাছে পুরুষ তো জানি খালি একটা জিনিসই চায়। ইনিয়ে-বিনিয়ে, ন্যাকামী করে, প্রেমের পলস্তারা দিয়ে চায় তার দেহ।

—ভুল প্রিয়ম্বদা, ভুল। ভারতচন্দ্র যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। —সব পুরুষ এক নয়। আমি চাই তার অনেক বেশি। দেহের সিঁড়ি বেয়ে দেহোত্তীর্ণ প্রেমে পৌঁছুতে।

—ওরে বাবা! এ যে বিরাট ব্যাপার। কেমন একটা ধর্ম ধর্ম গন্ধ বেরুচ্ছে।

—হাসি নয় প্রিয়ম্বদা। আমার কাছে এ হ'ল ধর্মের চেয়েও বড়।

বাঈজী এবার কিন্তু হাসে না। গম্ভীর স্বরে বলে—রহস্য করছি না কবি। আসলে ব্যাপারটা মাথাতেই ঢুকলো না।

—ঢুকবে না জানি। তোমরা বুঝবে না এসব।

প্রিয়ম্বদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে,—কেন বলো তো? বেশ্যা বলে বুঝি আমাদের হৃদয়ও নেই?

ব্যথিত হন ভারতচন্দ্র;—ওভেবে বলি নি। তোমাদের বলতে বোঝাতে চেয়েছি মেয়েদের।

খানিক চুপ করে থেকে কথাটাকে ব্যাখ্যা করেন;—আসলে,

অনেক দেখে আর ঠেকে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিয়ের ভেতর দিয়ে নিঃস্বার্থ প্রেম পাওয়া যায় না। কারণ, বিয়ের আগে যে মন স্বর্গীয় সুধায় ভরে থাকে, বিয়ের পর সেই মনই বিষিয়ে যায় প্রতিদিনকার ছোটখাট সাংসারিক গ্লানিতে। তখন আর প্রেম বড় থাকে না, বড় হয়ে ওঠে বস্তু। হৃদয়ের চেয়ে দেহ। আমি এমন প্রেম চেয়েছিলাম, যার সঙ্গে স্বার্থের কোন মিশাল থাকবে না। তুমিই বলো, এমন কিছু অসম্ভব জিনিস চেয়েছি কি?

চট করে কোন উত্তর জোগায় না বাঈজীর। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। রসিকতার ছোঁয়াচটুকুও থাকে না গলায়—বোধ হয়, না। প্রেম মানেই তো সমস্ত স্বার্থের বলি।

—তুমি বুঝবে প্রিয়ম্বদা; ভারতচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবার;—একটু আগেই বলি নি, কাব্যে সব চাইতে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে পরকীয়া প্রেমকে। আমার মনে হয় এর কারণও তাই। পরকীয়া প্রেমে বিয়ের গ্লানি নেই। তোমার প্রিয় কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পালাগানের কথাই ধরো। কৃষ্ণের জন্যে রাধার হৃদয়ে অত প্রেম, অত আকুলতা। কিন্তু আয়ানের জন্যে তো এতটুকুও নেই। কারণ আয়ান তার স্বামী।

—কিন্তু আমি যে বুঝবোই তা কি করে জানলে?

উত্তেজিত ভারতচন্দ্র কথার মারপ্যাঁচটুকু লক্ষ্য করেন নি নিজের উৎসাহেই বলে যান—কারণ তোমার সঙ্গেই সেরকম কোন সম্পর্ক আমার নেই। কিন্তু রাধা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাই বোঝে না; বিশ্বাসও করে না।

—মানে আমি হলাম তোমার পরকীয়া প্রেমের আধার?

দপ করে নিভে যান। ভারতচন্দ্র;—না, তা নয়। তবে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি। তাই বলছিলাম, তুমি হয়তো বুঝবে।

একটা ঢোঁক গিলে আবার বলেন—ইচ্ছে ছিল দেবী ভারতীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করবো। এমন কাব্য রচনা করবো, যা পড়ে লোকে চমকে উঠবে। কিন্তু তা হ'ল না। হৃদয় আমার মরে

গেছে। তাই কলম হাতে নিলেই বেরিয়ে আসে চাটুকারীতা। যা পড়ে তুমি বিদ্রূপ করলে।

প্রিয়ম্বদা মুচকি হাসে কথাটা শুনে ;—এ না হয় গেল বিয়ের পরের কথা। বিয়ের আগের হৃদয় তো আর মরে নি। তখন কি লিখেছো শুনি।

—তখন লিখি নি।

—লেখো নি ব'লো না ; বলো লিখতে পারো নি। প্রেম করবে, না লিখবে ? বিশেষ করে অপর পক্ষও যেখানে মন-প্রাণ দিয়ে বসে আছে। আগে রসিয়ে রসিয়ে প্রেমটাকে উপভোগ করা, তারপর না দেবী ভারতীর আরাধনা।

বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে ;—তা না হয় হ'ল। কিন্তু সে বেচারী বিশ্বাস করে না কেন বলো তো ?

আবার কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে রাজনর্তকী। ভারতচন্দ্র অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। অকৃত্রিম সহানুভূতির সামনে নিজেকে নিঃসঙ্কোচে মেলে ধরেছিলেন। আবার গুটিয়ে নেন। সাবধানে জবাব দেন—আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। বলতে পারবো না।

—বলবে না, তাই বলো। কপট অভিমানে প্রিয়ম্বদার ঠোঁট দুটো ফুলে ওঠে।

এবার কিন্তু আর ভোলেন না ভারতচন্দ্র। হাসেন—অমনি রাগ হ'ল ?

—না, আনন্দ হয়েছে।

—আনন্দ ?

—হ্যাঁ ; নিজের মূর্খতা ধরতে পেরেছি বলে আনন্দ লাগছে।

এটাও রাগের। আবার হাসেন ভারতচন্দ্র ;—বলবো প্রিয়ম্বদা। তবে আজ নয় ; অন্য দিন। কাব্যটা আমায় যে করেই হোক শেষ করতে হবে। মহারাজার আদেশ।

—এ কথাটা আগে বললেই পারতে। রাজনর্তকী উঠে

দাঁড়ায় ; —সেইজন্তেই আমায় দেখে মুখখানা অমন বেজার হয়ে উঠেছিল।

—এবার কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে।

বাঈজী সহ্য করতে পারে না খোঁচাটুকু। জ্বলে ওঠে—আমি ঝগড়া করছি ?

—মধুর কথার এই যদি নমুনা হয়, তবে তোমার ঝগড়া না জানি কি। ভারতচন্দ্র মুচকি হাসেন।

—বেশ, তবে চললাম। আর কখনো আসবো না।

ব্যাপারটা সহসা একটা বাঁকা পথ নিল সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেন ভারতচন্দ্র ;—না ; আর একটু বসো।

—আবার কেন ? তোমার ক্ষতি হচ্ছে।

—হোক ; তবু বসো। তুমি কাছে থাকলে আমার ভালো লাগে।

—ভালো লাগে ? লক্ষণ তো সুবিধের নয় কবি।

—কিসের লক্ষণ ? অপ্রতিভ হয়ে পড়েন ভারতচন্দ্র।

—রাজসভার পঙ্কিলতা তুমি সইতে পারো না। দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আমি যে সেই পঙ্কিলতারই একটা প্রধান অঙ্গ।

—না, তা নও। তুমি সেই পঙ্কিলতার মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুল। নিজেকে চিনতে পারো নি এখনো।

মুখখনা লাল হয়ে ওঠে বাঈজীর। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে একটুক্ষণ চুপ করে ভাবে। তারপর জিজ্ঞাসা করে—আমি না হয় নিজেকে চিনতে পারি নি। তুমি চিনেছো বুঝি ?

—চিনেছি কিনা জানি না প্রিয়ম্বদা। তবে একটা কথা জেনেছি। পাঁকের ভেতরে থাকলেও, পাঁক তোমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

রাজনর্তকীর চোখ দুটো কৌতুকে ঝিক‌মিক করে ওঠে এবার ; —কেন, একে মেয়েমানুষ, তায় সুন্দরী বলে বুঝি ? তোমার সেই পরকীয়া প্রেমের ব্যাপার নয় তো ? কবিদের বিশ্বাস নেই, কখন

কি বলো, কখন কি ভাবো, নিজেও জানো না। এর পর হয়তো ভালোবাসার কথাই বলতে শুরু করবে।

ভারতচন্দ্র হতবুদ্ধি হয়ে যান। তর্কের ঝোঁকে বলেছিলেন কথাটা। অতশত ভাবেন নি। অথচ রাজনটী সেই অর্থ ই ধরলো। ইতস্তত করে বলেন—দুঃখিত হলাম প্রিয়ম্বদা।

—কেন ?

—কথাটা অন্য কোন অর্থে বলি নি। বলতে চেয়েছিলাম, তুমি সব পাঁকের ওপরে। এটা আমাব ব্যক্তিগত ধারণা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে ধারণা ভুল।

কিছুক্ষণের জন্যে প্রিয়ম্বদা যেন থমকে পড়ে। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যায় !—হ্যাঁ ; ধারণাটা তোমার সত্যিই ভুল কবি। আমি যে সাধারণ একজন বেশ্যা, সে কথা ভুলে গিয়েই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছো।

একটু থেমে আবার বলে ;—এ রকম ভুল অবশ্য বেশির ভাগ লোকেই কবে। প্রায়ই দেখি তো। তবে তাদের সঙ্গে তোমার পার্থক্য হ'ল, ভাষার সামান্য অদল-বদল। তোমার এবং গোপাল ভাঁড়ে প্রভেদ হ'ল এখানেই।

দরজার মুখে যেয়ে ফিবে তাকায় ;—মহারাজা সদিন ঠিকই ধরেছিলেন। তাই পাঠিয়েছিলেন আমায়।

ভারতচন্দ্রের মুখের সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। অদ্ভুত ফ্যাকাসে দেখাতে থাকে। বাধা দেন—একটু দাঁড়াও।

—বেশ দাঁড়ালাম। বলো।

•—যা বললে, তা কি তোমার মনেব কথা ?

ক্ষণকালের জন্য দোটানায় পড়ে যায় বাঈজী। পরমুহূর্তেই মনস্থির করে শান্তস্বরে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

—তুমিও আমায় ভুল বুঝলে ?

—হতে পারে। তবে আশা করি ঠিকই বুঝেছি।

—কি বুঝেছো জানতে পারি কি ?

—অবশ্যই। কামিনী এবং কাঞ্চনের প্রতি লোভ তোমার যে কোন সাধারণ মানুষের মতো। রাজসভা কবি কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নন। বাইরে যা দেখা যায়, তা হ'ল একটা মুখোস। আসল চেহারাটা ঢাকা দিয়েছেন কেবল।

—ঠিক বলছো ?

প্রশ্নের ধরন দেখে ঘাবড়ে যায় প্রিয়ম্বদা ;—এখনো সন্দেহ আছে।

—না নেই। ভারতচন্দ্রের স্বরটা কেমন কঠিন শোনায় ;—আর কোন সন্দেহ নেই। তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। পাঁকের মধ্যে ফুল বলে ভ্রম হয়েছিল। ভেবেছিলাম, তোমারই মতো রাজসভার ওই নোংরামির ভেতরেই সৌন্দর্যের ফুল ফোটাতে হবে আমায়।

একটু থেমে নিজেকেই যেন বলেন—মনে হয়েছিল, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। কিন্তু আজ সব সন্দেহ ঘুচে গেছে। পাঁকের স্পর্শ বাঁচিয়ে যে সৌন্দর্য ফোটে, তা পদ্মফুল। বারবণিতা পদ্মফুল নয়।

শুনতে শুনতে রাজনর্তকীর মুখের রেখাগুলোও শক্ত হয়ে উঠেছিল। একটু এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বলে—আমরা দুজনেই দুজনকে খুব ভালো করে চিনে নিয়েছি কবি। তবে তোমার ভালো চাই বলেই একটা কথা বলবো।

অপ্রিয়, কটু কথাগুলো বলে ফেলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না ভারতচন্দ্র। এভাবে আঘাত দেবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। একটা ঢোঁক গেলেন—কি কথা ?

—তোমায় চেনার কথাটা পুরো বলি নি এখনো। খানিকটা বলেছি মাত্র।

একটু দম নিয়ে আবার বলে ;—নিজেকেই ঠিক করে এখনো বুঝতে পারো নি তুমি। নিজের অন্তরের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। চেনবার চেষ্টা ক'রো। তুমি কবি ; স্রষ্টা।

সৌন্দর্য সৃষ্টিই তোমার ধর্ম। সৌন্দর্যই একমাত্র পথ। নারী এবং অর্থের পেছনে ছোটা এবং চাটুকারীতা করা তোমার পথ নয়।

কথাটা বলেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায় মাধবী-মালঞ্চ থেকে।

প্রিয়ম্বদা চলে গেল। শূন্য দরজার দিকে চেয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজকবি। মনের মধ্যে উত্তাল ঝড় বইছে। নারীর সৃষ্টিই কি বিধাতা করেছেন আঘাত দেবার জন্যে? জীবনে প্রথম যাকে মনপ্রাণ সমপর্ণ করেছিলেন, সে তাঁকে হতাশ করেছে। হতাশই কেবল নয়; দিয়েছে মর্মান্তিক আঘাত। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন যাযাবরের মতো। সে ক্ষত আজো শুকোয় নি।

আজ আবার বন্ধু ভেবে যাকে হাত এগিযে দিয়েছেন, সেও দিল মর্মঘাতী বেদনা। বলার মধ্যে তাঁর কোন লুকোচুরি ছিল না। যা বিশ্বাস করেছিলেন, তাই বলেছেন অকপটে। দৈহিক কোন হীন সম্পর্কের কথা চিন্তাও করেন নি কোনদিন।

অথচ সেই ভাবনাটাকেই যে রাজনর্তকী প্রথম থেকেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। রাখ-ঢাক রইলো না আর।

তবু কি একটা খচখচ করে বিঁধতে থাকে। বাঈজীর শেষ কথাগুলোর সঙ্গে তার বিচিত্র ব্যবহারের কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পান না। প্রলোভিত করবার চেষ্টা করেও দূরে সরে যায় কেন? কেন নিজেকে আড়াল করে রাখে?

আর একটা ব্যাপারের অর্থও বোধগম্য হয় না। রাজনর্তকীর কথাটাই বা এত বড় করে কেন বাজলো? রাধার ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছেন; কারণ ভালোবেসেছিলেন তাকে। কিন্তু বাঈজী? তার সঙ্গে তো হৃদয়ের কোন সম্পর্কই নেই।

আজ আর লেখা হবে না। সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে

গেল প্রিয়ম্বদা। যত ভাবেন ততই নিজের অন্তরকে দুর্বোধ্য মনে হয়। আঘাত আরো অনেকে দিয়েছে। এখনো দেয়। রাজসভার বেশির ভাগ লোকই প্রসন্ন নয় তাঁর ওপর। ভালো করেই জানেন তিনি। কিন্তু কই, তাদের আঘাত তো এতটা উতলা করে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আসনে ফিরে আসেন। কলমটা তুলে নেন। অসমাপ্ত রসমঞ্জরী কাব্য যেন তাঁর কলঙ্কের সাক্ষী। উপহাস করছে। প্রিয়ম্বদা ঠিকই বলেছিল। যা লিখেছেন, তা নিছক চাটুকাবার্তা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। এ ভাবে শরীরটাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু জীবন বাঁচবে না। কাব্য তাঁর কাছে কেবলমাত্র শরীর রক্ষার উপায় নয়। তারও অনেক বেশি। কাব্যই আজ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সঙ্গিনী, প্রিয়তমা, আরাধ্যা দেবী। কিন্তু সেই রহস্যময়ী প্রিয়তমা আজো ধরা দিল না। দূর থেকে কেবলই হাতছানি দিয়ে লুকিয়ে পড়ে। প্রিয়ম্বদার মতোই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ; দুর্বোধ্য দিগন্তের মতো।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। কি রকম একটা অক্ষমতার ক্রোধ ফুঁসে উঠছে বুকের মধ্যে। যে বাঈজীর সামান্য একটু ইশারায় হাসিমুখে জীবন দিতে পারে আমীর-ওমরাহ্‌রা, সেই নারীই তাঁর মতো সামান্য মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের রাজকবির সামান্য-বণিতার আসন পেতে চায়। আঘাত দেবার কৌশলটুকু ভালো আয়ত্ত করেছে রাজনর্তকী। রহস্যচ্ছলে করে তীব্র আঘাত। ক্ষতের গভীরতাটুকু তখনই অতটা বোঝা যায় না। বোঝা যায় পরে।

কিন্তু কেন? কেন বারংবার এই অপমান করা? উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ভারতচন্দ্র কলম ফেলে উঠে দাঁড়ান। বাইরে বেরিয়ে আসেন। মালিনী হীরা গৃহকাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাস করেন ;—চলে গেছে।

—কার কথা বলচো গো?

—বাঈজী।

—সে তো কখন চলে গেছে। তা তুমি কি আজ বাপু গা তুলবে না? সারারাত তো পিদীম জ্বালিয়ে কি সব ছাই ভস্ম লিখেছো। আপন মনেই বকতে থাকে হীরা মালিনী।

ভারতচন্দ্র আবার ফিরে আসেন ঘরের মধ্যে। জানালার ধারে যেয়ে দাঁড়ান। বসন্তের আকাশে রঙের মেলা বসেছে। বারোমাস হয়ে গেল কৃষ্ণনগরে। বারমাস্যা রচনা করা যেতে পারে এখন। হাসি পায়। এ ছাড়া করবেনই বা কি? ছন্নছাড়া, ভবঘুরের জীবন, খানাবদোশী। গুলিস্তাঁতে কবি সাদী খাঁটি কথা বলেছেন। সবার কাছে একটু একটু করে আদায় হলে তবেই তো ভাণ্ডার ভরে উঠবে। তিনিও তাই করেছেন। আহরণ করেছেন জীবনের স্ফুলিঙ্গ। সব আদায়ই প্রায় উশুল হয়েছে। বাকী রয়েছে কেবল একটা জিনিস; প্রেম। বাধা দিতে পারে নি।

সে পারে নি বলে আর কেউ পারবে না, একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। মানুষের অনেক নীচতা এবং হিংস্রতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। তবু তো শ্রদ্ধা হারাতে পারলেন না। মানুষের ওপর যে অনেক বিশ্বাস, অনেক ভালোবাসা এখনো রয়ে গেছে। তিনিও তো সেই মানুষদেরই একজন।

হঠাৎ যেন একটা কুয়াশার আবরণ চোখের সমুখ থেকে সরে যায়। চমকে ওঠেন। নিজের মনকেই এতক্ষণ বুঝতে পারছিলেন না। হেঁয়ালীর মতো লাগছিল। সে হেঁয়ালীর সমাধান খুঁজে পেয়েছেন যেন। প্রেমের জন্যে হাহাকার। এরই জন্যে হৃদয়ে এতো আগুন অহরহ জ্বলছে।

এই হাহাকারকেই বিদ্রূপ করে প্রিয়ম্বদা। সেই কারণেই মনে এতো লাগে তার কথাগুলো। রাজসভার অনেকেই আঘাত দেয় তাঁকে। কিন্তু এ নিয়ে নয়। তাদের উপহাস এবং আঘাতের লক্ষ্য হ'ল অন্য। মহারাজার কৃপাদৃষ্টি লাভ। সে জিনিসের ওপর এতটুকুও লোভ তাঁর নেই। তাই আঘাতগুলো মর্মে লাগে না।

আর বাঈজীর লক্ষ্য হ'ল হৃদয়। একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ছিলেন এতদিন। প্রিয়ম্বদার হৃদয় রয়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস ভেঙে গেল আজ। আসলে বারবিলাসিনীর কাছে হৃদয়ের দাম এতটুকুও নয়। বোঝেও না প্রেমের কদর। তাই প্রেম তার কাছে উপহাসের বস্তু। ছলনার আড়াল দিয়ে উপহাস করে। সে উপহাসে মূঢ় কামুকের দল ভুলতে পারে। কিন্তু তিনি?

তৃপ্তির একটা হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে। রাজনর্তকী নির্বোধ। নইলে তাঁর মতো লোকের কাছে ছলনার ডালি সাজিয়ে নিয়ে আসতো না। জানে না, ওরকম পসরাকে ঘৃণা করেন তিনি। অপরিসীম ঘৃণা। তাঁর দৃষ্টি আরো অনেক উপরে। মানুষের হৃদয়ে।

সত্যিই কি নির্বোধ প্রিয়ম্বদা। সহসা একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে যায়। গোপাল ভাঁড়ও নির্বোধ সেজে থাকে। কিন্তু অমন খল এবং চতুর লোক বোধ হয় সারা বাংলা দেশে আর নেই। বেছে বেছে লোক যোগাড় করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। বাঈজীও তাঁরই যোগাড় করা।

সন্দেহটা ক্রমাগত খোঁচা দিতে থাকে। রাজনর্তকীর এই অদ্ভুত আচরণ মহারাজার আদেশে নয় তো? একবার ব্যর্থ হয়েও হয়তো সন্তুষ্ট হন নি কৃষ্ণচন্দ্র। বারবার যাচাই করে দেখতে চান ভারতচন্দ্র আত্মসমর্পণ করেন কি না ঘৃণ্য, পঙ্কিলতার কাছে। রাজসভার অসাধ্য কিছু নেই। আবারো হয়তো উদ্ভট খেয়াল চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই এসেছে বাঈজী।

রাজসভার প্রসঙ্গে আর একটা চিন্তাও উদয় হয়। চাটু-কারীতা তাঁর পথ নয়। প্রিয়ম্বদা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য দরকার ছিল না মনে করিয়ে দেবার। ভারতচন্দ্র তা জানেন; বিশ্বাস করেন। তাই দম বন্ধ হয়ে আসে রাজসভার আবহাওয়ায়।

তবু সেই চাটুকারীতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। এটা দুঃখজনক হলেও, সত্যি।

চিন্তা-ছুটো অস্থির করে তোলে। মহারাজাই যদি এবারও পাঠিয়ে থাকেন প্রিয়ম্বদাকে, তবে এ রাজসভার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর এখানেই শেষ করে দেবেন। স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে হবে রাজনর্তকীকে। আজই। রাজসভাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভারতচন্দ্র প্রলোভিত হন না কামিনী-কাঞ্চনে। একমাত্র প্রলোভন রয়েছে তাঁর হৃদয় এবং সৌন্দর্যের প্রতি। প্রেম এবং কাব্যের প্রতি।

আর চাটুকারীতা? চাটুকারীতাকে যদি বিদ্রূপের রসে জ্বাল দিয়ে পরিবেশন করা যায়? শুধু রাজনর্তকীরই নয়, রাজসভারও মুখের মতো জবাব দেওয়া যায় তা'হলে!

তাড়াতাড়ি আবার আসনে ফিরে আসেন রাজকবি। কলমটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়েন :

তার পরিজন নিজ : ফুলের মুখটি দ্বিজ : ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশিট রাজ্যবাসী : নানা কাব্য অভিলাষী : যে বংশে প্রতাপনারায়ণ
রাজবল্লভের কার্য : কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য : মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস : ভাষায় করিতে বশ : আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি : গ্রন্থারম্ভে ভয় করি : ছল ধরে পাছে খলজন।
রসিক পণ্ডিত যত : যদি দেখ দুষ্ট মত : সারি দিবা এই নিবেদন॥

এক নিশ্বাসে ভূমিকাটুকু শেষ করে থামেন। চোখ বুলিয়ে নেন একবার। মনে ধরে। খোসামোদের আড়াল থেকে ঝিকমিক করছে শাণিত বিদ্রূপ। রাজনর্তকীর উপহাসের জবাব। বিদগ্ধজন রসমঞ্জরার রসের স্বাদ জানেন। সে রসকে আবার রসে মিশিয়ে রচনা করতে হবে, এমন উদ্ভট আদেশ রাজসভা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

কাব্য শেষ হবেই। এর পরের কাজটুক বিশেষ কঠিন নয়। বাঁধা ছক ধরে এগিয়ে যাওয়া। তার আগে আর একটা করণীয় বাকী রয়েছে। বাঈজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা।

কোনরকমে দড়ির ওপর থেকে চাদরখানা টেনে নেন। আর দেরি নয়। যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে এখনি।

ঝোঁকের মাথায় এতখানি পথ চলে এসে কিন্তু দেউড়ীর মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনে রাজনর্তকীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বহু রসিক ব্যক্তির স্বর্গধাম। এখানে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন হয় অনেক কিছুর। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি। তাঁর সে-সব কিছুই নেই। নিঃস্ব ভিখারী! তাই প্রবেশ করতে পা সরে না।

এতক্ষণ মৃদুস্বরে ভেসে আসছিল সারেঙ্গীর আওয়াজ। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শোনা যায় সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব সুরলহরী। ভৈরবী ঠুংরী। 'রস্‌কে ভরে তেরে নৈন্‌ সজনওয়া ; ঘুরে-ফিরে, সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে গাইছে বাঈজী। নৃত্যের মতো মুখর মৃদঙ্গ বেজে চলেছে। বোল শুনেই বোঝা যায় কে বাজাচ্ছে। ওস্তাদ সমঝখেল ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে এ মিষ্টত্ব বেরুতে পারে না।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো পায়ে পায়ে দেউড়ীর দিকে এগিয়ে যান ভারত-চন্দ্র। হাবসী দরোয়ান পীরবক্স এতক্ষণ অবাক্ হয়ে দেখছিল তাঁকে। কাছে এগিয়ে আসতেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায়। সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে পথ করে দেয় ;—ওপরে চলে যান হুজুর। বাঈজী রেয়াজ করছেন।

এতক্ষণে হুঁস হয় ভারতচন্দ্রের। পরিস্থিতিটা একনজরে দেখে নেন। পীরবক্স আশ্চর্য হয়েছে। কবির মতো লোককে অন্তত এ জায়গায় সে আশা করে নি। আশ্চর্য অনেকেই হবে। রাজসভার কেউ দেখে ফেললে তো কথাই নেই। কুৎসিত রঙ্গ-রসিকতার তুফান বয়ে যাবে।

অথচ পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। ভাবতেও কেমন খারাপ লাগে নিজের। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বলেন—পথ যে চিনি না।

—আসুন আমার সঙ্গে।

দ্রুত পায়ে অনুসরণ করেন রাজকবি। উপরে উঠে ঘরের সামনে যেয়ে দাঁড়ান। ভারী পর্দাটা তুলে ধরে পীরবক্স—যান হুজুর।

এক ঝটকায় যেন সারেঙ্গীর তারগুলো ছিঁড়ে যায়। গান থামিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বাঈজী—কি কাণ্ড। কোন্ দিকে সূর্য উঠেছিল আজ? রাজসভা কবি আমার গরীবখানায়। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে। ওরে কে আছিস'?

ভারতচন্দ্র বাধা দেন—ব্যস্ত হতে হবে না প্রিয়ম্বদা। একটা বিশেষ দরকারে আসতে হ'ল। হয়তো বিরক্ত করলাম।

ঘরের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয় বাঈজী। পীরবক্স নীচে নেমে গেছে। ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁ এবং সমঝদারেরাও চলে গেছেন পাশের কামরায়। গলা নামিয়ে জবাব দেয়—করলেই বা। ভোরবেলা আমি যেয়ে বিরক্ত করেছিলাম। এখন তুমি করলে। শোধ-বোধ হয়ে গেল। এসো, ভেতরে এসো। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

সঙ্কোচে পা ওঠে না ভারতচন্দ্রের। যতই মুক্ত মন হোক, তবু বেশ্যা-বাড়ি। রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে আজন্মের সংস্কার। চেষ্টা করলেও চট করে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না।

প্রিয়ম্বদা বোধ হয় অনুমান করে। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে—ভেতরে ঢুকতে ঘেন্না হচ্ছে?

—না, ঠিক তা নয়।

—ঠিক তাই। কেন খামোকা মিথ্যে কথা বলছো। অবশ্য গোড়ায় অমনটা হয়েই থাকে। ক্রমশ সরগর হয়ে যাবে। সবারই হয়। পরে দেখবে হাজারটা চোখের সমুখ দিয়েও গটগট করে ঢুকতে একটুও পা কাঁপবে না।

চাবুকের আঘাত যেন। দৃষ্টিটা নামিয়ে নেন রাজকবি নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করেন। একটা আসন টেনে নিয়ে কৈফিয়ত দেন—রেয়াজ করছিলে; বাধা পড়ল।

ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁ ফিরে এসেছিলেন কামরার ভেতরে। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বাঈজী জবাব দেয়—তওবা তওবা; আমার কত বড় ভাগ্য যে আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো এখানে পড়ল। বলুন কি শুনবেন? ললিত, বিভাস, ভৈরোঁ, ভৈরবী।

—গান শুনতে আসি নি আমি।

—তবে?

বিশ্রাম খাঁর দিকে চকিতে দেখে নিয়ে ভারতচন্দ্র বিব্রতভাবে জবাব দেন;—বলেছি তো, একটা বিশেষ দরকার আছে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে বাঈজী। তারপর উঠে দাঁড়ায়;—বেশ, আসুন। আমার খাস-কামরায় যেয়ে কথা হবে।

খাস-কামরার পর্দাটা তুলে ধরে জিজ্ঞসা করে;—খেয়েছো কিছু? হীরার কাছে শুনলাম সারারাত ধরে লিখেছো। খাওয়াও হয় নি। আমার এখানে খাবে তো?

—তুমি তো ভালো করেই জানো, ওসব বাজে সংস্কার আমি মানি না।

—কি জানি। একে যবনী, তার ওপর বেশ্যা। তোমাদের জাত যে বড় ঠুনকো। একটুতেই ভেঙে পড়ে।

—কিন্তু তার আগে তুমি মানুষ। সে কথা থাক। একদফা ঝগড়া তো সকালে করলে। এখনো আশ মেটে নি?

—সেইজন্যেই তো খাওয়াতে চাইছি। প্রিয়ম্বদা হেসে ফেলে।

—খাওয়া পরে হবে। আপাতত তার চাইতে জরুরী কাজ আছে। নিস্পৃহকণ্ঠে কাজের কথা পাড়েন ভারতচন্দ্র।

রাজনর্তকী কিন্তু এ গাম্ভীর্যকে আমলই দেয় না। খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাব্বাঃ; মুখখানা যা গোমড়া করেছো। ঠিক দেওয়ান রঘুনন্দনের মতো লাগছে।

পরক্ষণেই হাসিটা সামলে নিয়ে বলে—এরই ভেতরে কি এমন জরুরী কাজ পড়ল? সামান্য-বণিতার আসন দেবার ইচ্ছে হয় নি তো?

এবার কিন্তু নিজেকে শক্ত করেন ভারতচন্দ্র। গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন ;—না। তবে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেই এসেছি। তার আগে এটা দেখো।

—চিঠি নাকি ? প্রেমপত্র ?

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে অবাক সুরে বলে ;—এ কি ? এ যে কবিতা। আমি ভাবলাম প্রেমপত্র দিচ্ছো। এতখানি লিখলে কখন ?

—তুমি চলে আসবার পর।

—তা'হলে স্বীকার করো ; ঝগড়াটা কাজ দিয়েছে।

—মানে ?

—ঝগড়া না করলে লিখতে পারতে না।

—বোধ হয় না। এবার ভালো করে পড়ো তো।

রাজনর্তকী নিঃশব্দে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিরিয়ে দেয় ; —পড়লাম।

—কেমন লাগলো ?

—মন্দ নয়।

—শুধু কি এইটুকুই বলবে ?

—আর কি জানতে চাও ?

—কি জানতে চাই তা বোঝো নি ? সত্যি বলছো ?

—তোমার মনের কথা কি করে জানবো বলো ?

—মনের কথাকে তো ভাষাতেই প্রকাশ করেছি।

—সেটা তো পরিষ্কারই লেখা রয়েছে। তোমার বংশের পরিচয় ; রাজ্যনাশের কাহিনী ; মহারাজা আশ্রয় দিয়েছেন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—।

—থামো ; রাজকবি অসহিষ্ণুভাবে বাধা দেন ;—আর কিছুই দেখতে পাও নি ?

—কি জানি। আমার মাথায় আর কিছু তো ঢুকলো না।

হতাশায় যেন ভেঙে পড়েন ভারতচন্দ্র। লেখা ব্যর্থ হয়েছে।

যে রচনা পাঠক এবং শ্রোতা বুঝতে পারে না, সে রচনা রচনাই নয়। তবু আবার জিজ্ঞাসা করেন—খোসামোদ ছাড়া আর অন্য কিছু নজরে পড়ল না?

বাঈজী আর একবার ভালো করে পড়ে। তারপরে জবাব দেয়—না।

—হতাশ হলাম প্রিয়ম্বদা। চেয়েছিলাম, এই রাজসভাকে বিদ্রূপের কশাঘাতে শায়েস্তা করতে।

—বিদ্রূপ? কই, তা তো ফুটে ওঠে নি।

—সেইখানেই আমি ব্যর্থ হয়েছি।

দুঃখে, হতাশায় স্বরটা কেমন করুণ হয়ে পড়ে;—বুঝতে পারছি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। বৃথা চেষ্টা।

—হবে। রাজনর্তকী দৃঢ়স্বরে বাধা দেয়;—আমি মূর্খ; বুঝতে পারি নি। হয় তো তোমার বক্তব্য ঠিকই ফুটেছে। যারা বোঝে, তারা ঠিকই বুঝবে।

—সান্ত্বনা দিচ্ছো?

কাগজটাতে আর একবার চোখ রাখে প্রিয়ম্বদা;—না, সান্ত্বনা নয়। ঠিকই বলেছি। প্রথমটা ধরতে পারি নি। কিন্তু এবার অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে।

—সত্যি? উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন ভারতচন্দ্র;—আমার বক্তব্য ধরতে পেরেছো?

—হ্যাঁ; প্রিয়ম্বদা একটা ঢোঁক গেলে।

আপন ভোলা কবি কিন্তু অতশত লক্ষ্য করেন না। উৎসাহের মাথায় বলে যান;—বুঝতে পেরেছো, কি বলতে চেয়েছি? রসমঞ্জরীর মতো কাব্যের রসকেও যারা রসে মিশিয়ে পরিবেশন করতে বলে, তারা রসিক নয়, মাতাল। ধেনো-মদের ভক্ত।

বাঈজীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে;—ঠিক বলেছো কবি। প্রথমে অতটা তলিয়ে দেখি নি।

হঠাৎ জাগা উৎসাহটাকে সামলে নেন রাজকবি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ;—এখন বুঝতে পারছো তো ?

—হ্যাঁ।

—আমি ব্যাখ্যা করবার পর ; তাই না ?

থতমত খেয়ে যায় রাজনর্তকী। চট করে কথা জোগায় না কোন।

—লজ্জার কিছু নেই ; বলো। আমি নির্বোধ নই। ঠিক ধরেছি।

—হ্যাঁ।

—তবে ? তুমি কি বলতে চাও, কবিতা লিখে প্রতিটি পাঠকের কাছে আমায় ব্যাখ্যা করতে হবে, তবে বোধগম্য হবে ? না প্রিয়ম্বদা ; সে লেখা লেখাই নয়। ব্যর্থ কচকচি।

—কিন্তু আমাকে দিয়ে বিচার করছো কেন ? আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। সাধারণ পাঠকের অনেক নীচে। তাই বুঝতে পারি নি।

ভারতচন্দ্র অতি দুঃখে হাসেন :—যুক্তিটা অবশ্য শুনতে মন্দ লাগছে না। একটা সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমি যে জানি, তুমি সাধারণ পাঠকের অনেক ওপরে।

—আবার খোসামোদ শুরু করলে। অন্য প্রসঙ্গ যাবার চেষ্টা করে বাঈজী ;—বরং বলো, কি জরুরী দরকারে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিলে। সত্যি বলছি, বড় আনন্দ হচ্ছে। ভাবতেই পারি নি তুমি কোনদিন আমার এখানে আসবে।

উদ্দেশ্যটা সফল হয়। ভারতচন্দ্র আবার গম্ভীর হয়ে যান ;—লুকোচুরি না করে একটা কথা বলো তো। আজো কি মহারাজাই পাঠিয়েছিলেন তোমায় ?

—কোথায় ?

—সকালে, আমার কাছে।

—এ প্রশ্ন কেন কবি ?

—আমার সন্দেহ হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা ম্লান হাসে ;—এখনো আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না ? কবে, কি একটা দোষ করে ফেলেছিলাম। সেইটাকেই মনে করে বসে রয়েছো ?

—তবে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে ?

—রোজই তো প্রায় যাই। কোনদিন তো এ প্রশ্ন কর না ?

—কোনদিন করি না, কিন্তু আজ করছি। তোমার ব্যবহারে খটকা লেগেছে। তা' ছাড়া রোজই বা যাও কেন ?

—তুমি কৃষ্ণনগরে আসবার আগেও যেতাম। মহারাজাই অনুমতি দিয়েছেন আমায়।

—তা যাও, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার কুটিরে কেন যাও তাই জানতে চাইছি।

—শুনবেই ?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ যেন বাঈজী মত বদলায়। উগ্রস্বরে বলে—না, বলবো না। কেবল এইটুকু জেনে রাখো, কারো হুকুমে যাই নি। গিয়েছিলাম নিজের ইচ্ছেয়। যদি আপত্তি থাকে, আঁর কখনো মাধবী-মালঞ্চে যাবো না।

ভারতচন্দ্র নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন—মানে ?

—মানে আবার কি ? আমার ইচ্ছে হয় তাই যাই।

—ইচ্ছেটা কেন হয় ?

প্রিয়ম্বদা এবার হেসে ফেলে ;—কি মুস্কিল। কবি হলে কি লোকে চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকে ? তা'ছাড়া আমার ইচ্ছের কারণটা জেনে কি করবে তুমি ?

সত্যিই কিছু করবার নেই। শুধুই কৌতূহল। তবু ভারতচন্দ্র অনুরোধ করেন—বলোই না।

—না।

—বেশ ; একটা কথার জবাব দাও। তোমার ইচ্ছের মূলটা কি ভালোবাসা ?

—ভালোবাসা? বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রাজনর্তকী। আবার বসতে বসতে শুকনো গলায় বলে ;—না।

—তবে কেন যাও? কেন অপমান করো? কেন আঘাত দাও?

—সে কি? অপমান, আঘাত, এসব কবে করলাম?

—করো নি?

প্রিয়ম্বদা এবার ইতস্তত করে ;—বিশ্বাস করো কবি, অপমান করি নি। তবে আঘাত দিয়েছি ; দিই।

—কেন?

—স্বভাব কবি, স্বভাব। বাঈজী অনেকটা সহজ হয়ে আসে ;—স্বভাবটাই আমার ঝগড়াটে। ছোটোবেলায় এর জন্যে মায়ের কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তবু গেল না।

ভারতচন্দ্র কিন্তু একবিন্দুও বিশ্বাস করেন না। বলেন ;—আমি যদি বলি ভালোবাসা।

রাজনর্তকীর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। চোখে চোখ রেখে পালটা প্রশ্ন করে—যদি বলি হ্যাঁ।

এ উত্তর সত্যিই আশা করেন নি ভারতচন্দ্র। হতবুদ্ধি হয়ে যান ;—সেইখানেই তো যত গোল বেধেছে। তোমার ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না। যদি প্রেমই হয়, তা'হলে দেহের এত উদ্দামতা কেন?

—তবে প্রেম নয়। আগেই তো বলেছি।

একটু থেমে মুখ টিপে হাসে ;—স্বপ্নেও যদি প্রেম বলে ভেবে থাকো, একান্ত ভুল করেছো কবি। প্রেম অত সস্তা জিনিস নয়, যে যাকে-তাকে বিলিয়ে বেড়াবো।

—ভুল আমি করি নি প্রিয়ম্বদা। তমি যদি ভুল করে থাকো, সেটাকে ভেঙে দিতে চাইছি।

—কোন প্রয়োজন নেই। তোমায় ভালোবাসা দেবার কথা কখনো স্বপ্নেও চিন্তা করি নি। দিতেও পারবো না।

বিমূঢ় কবি অবাক হয়ে যান ;—দেহ দিতে পারো, অথচ প্রেম দিতে পারো না ?

—না, না, না।

আলোচনাটাকে এইখানেই বন্ধ করে দিতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু পারেন না ভারতচন্দ্র। বিচিত্র একটা নারী-চরিত্রের সন্ধান পেয়ে কবিসত্তা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সবটা জানবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করেন—কিন্তু কেন ?

প্রিয়ম্বদা হাসে—আমরা বারবণিতা। দেহের ব্যবসা করি। প্রেমের নয়।

—কিন্তু সব জায়গাতেই তো আর ব্যবসা চলে না।

—চলে না বলেই প্রেম দিতে পারি না সবাইকে।

—মানে ?

—মানে ? প্রিয়ম্বদার গলাটা ধারালো হয়ে ওঠে ;—দেহের ব্যবসা করি বলে ঘৃণা করো আমায়। তাই না ? সত্যি করে বলবে।

—হ্যাঁ, তা করি।

—আমরা অসতী। জানি সমাজ আমাদের ঘৃণা করে। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

একটু দম নিয়ে সেই সুরেই আবার জিজ্ঞাসা করে ;—ঘরের বউয়ের সতীত্ব যাচাই করা হয়—সে স্বামী ছাড়া আর কাউকে শরীর দিল কিনা তাই দিয়ে। হৃদয় দশজনকে বিলিয়ে দিলেও তার সতীত্ব যায় না। যায় কেবল দেহ দিলেই। ঠিক কিনা ?

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু হৃদয় কাউকে দিল কি না তা তো আর দেখা যায় না।

—ওটা হ'ল একটা ছেঁদো যুক্তি। ও যুক্তি দিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করা যায় ; সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। যায় কি ?

—না, যায় না প্রিয়ম্বদা।

—কিন্তু আমরা, বারবণিতারা সতীত্ব যাচাই করি আরো সূক্ষ্ম

জিনিস দিয়ে। হৃদয়। দেহ আমরা দশজনকে দিতে পারি। কিন্তু হৃদয় দিতে পারি না। অন্তরের শুচিতাই আমাদের কাছে আসল সতীত্ব।

বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এসে একখানা হাত তুলে নেয় ভারতচন্দ্রের ;—চাও এই শরীর ? এই নির্জন খাস-কামরা। আমার হুকুম ছাড়া জনপ্রাণীও ঢুকতে পারবে না। এই শরীরের জন্যে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রাণ দিতে পারে। বলো নেবে ? ধরে দিচ্ছি তোমার পায়ে।

কৌতূহল মিটলো না। বরং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে আরো। কিন্তু আর সহ্য করতে পারেন না ভারতচন্দ্র। কানের ভেতর যেন তরল সীসে ঢেলে দিচ্ছে কেউ। অপরিসীম ঘৃণায় সারা শরীর কুঁচকে যায়। কুৎসিত একটা সরীসৃপ যেন স্পর্শ করে রয়েছে তাঁকে। ক্লেদাক্ত অনুভূতি প্রতি রোমকূপে ছড়িয়ে পড়ছে। চকিতে হাতখানা ছাড়িয়ে নেন। পাগলের মতো উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। রাজনর্তকীর প্রাসাদের সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে পথের উপর যেয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বুক ভরে নিশ্বাস নেন।

বিচিত্র একটা চরিত্রকে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। যা সামনে এসে দাঁড়াল, তা নরকের চয়েও ঘৃণ্য। তবে একটা কথা ভুলতে পারেন না বাঈজীর। অন্তরের সতীত্ব। অন্তরই যদি পঙ্কিল হয়ে পড়ে, তবে দেহের পবিত্রতা থাকে কি করে ? রাধার অদ্ভুত পরিবর্তনের কোন সূত্র কি নিহিত রয়েছে এর মধ্যে ? ভাবতেও বুকটা মুচড়ে ওঠে।

—আমাদের রাজকবি না ?

চিন্তামগ্ন ভারতচন্দ্র আঁতকে উঠেছিলেন। যা ভয় করেছিলেন তাই হ'ল। ফিরে তাকাতেই একেবারে সামনাসামনি হয়ে যান গোপাল ভাঁড়ের।

হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে গোপাল—রসের পুকুরে ডুব দিয়ে এলেন বুঝি ? দেখি মুখখানা এগিয়ে দিন তো।

চেটে একবার পরখ করি মিষ্টি লাগে কিনা। আমরা হলাম যাকে বলে ইতরজন। রাজা-মহারাজা, কবি, এঁরা সব ভোগ করবেন ভালো ভালো জিনিস। কালিয়া, পোলাও, কোর্মা, কাবাব। আমাদের কপালে কেবল মিষ্টান্ন।

ঘৃণা এবং ক্রোধে শরীর জ্বলে যেতে থাকে। তবু কিছু বলতে পারেন না ভারতচন্দ্র। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছেন। কৈফিয়ত দেবার কিছুই নেই। দিলেও বিশ্বাস করবে না কেউ। তার ওপর মহারাজার প্রিয় বিদূষক গোপাল। তাকে কোন কটু কথা বলা এবং মহারাজাকে অসন্তুষ্ট করা দুই-ই এক। মনের রাগ মনে চেপে নিরুত্তরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যান।

—বাঈজী আজ রাজসভায় আসবেন তো?

কদর্য ইঙ্গিতটা মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তবু, নীরবে মুখ লুকিয়ে অপরাধীর মতো পালিয়ে আসেন ভারতচন্দ্র। সোজা মাধবী-মালঞ্চে।

রসমঞ্জরী কাব্য শেষ হয়েছে। খাটতে হয়েছে অনেক। কিন্তু সন্তুষ্টি আসে না কিছুতেই। অথচ নতুন করে লেখবার মতো সময় কিংবা ধৈর্য কোনটাই নেই। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল রাজসভায় যান না। আজ আবার খবর দিয়ে গেছে গোপাল। মহারাজা স্মরণ করেছেন।

সময় থাকলেও হয়তো লিখতে পারতেন না। মন অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। প্রায় বিবর্ণ হয়ে আসা মর্মন্তুদ স্মৃতিগুলোর ওপর আবার রঙ বুলিয়ে দিয়েছে প্রিয়ম্বদা। একই যুক্তির এপিঠ আর ওপিঠ। দেহ দেওয়া যেতে পারে একাধিককে; কিন্তু মন দেওয়া যেতে পারে শুধু একজনকেই। রাধার যুক্তি হয়তো ঠিক এর বিপরীত। মন দেওয়া যেতে পারে একাধিককে; কিন্তু দেহ শুধু একজনকেই। ভালো করে খোঁজ নিলে হয়তো আচার্য-দুহিতার এই অন্তরের কথাটাই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

চিন্তাটাকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না রাজকবি। এ সন্দেহ মারাত্মক। যদি মিথ্যা হয়, তবে এর চেয়ে হীন আর কিছু হতে পারে না। সব বোঝেন। তবু ফল্গুধারার মতো সন্দেহের ক্ষীণ একটা স্রোত বইতে থাকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নহবৎখানায় পূরবী রাগিণীতে বাজছে শানাই। রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে যেতে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। হাহাকার করে ওঠে। রাধাকে বুঝতে পারেন না; প্রিয়ম্বদাকেও দুর্বোধ্য মনে হয়। নিজের মনকেও ধোঁয়াটে লাগে। এই না-বোঝার জন্যেই হৃদয় আরো চঞ্চল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নতুন করে লেখা সম্ভব ছিল না।

ভারাক্রান্ত মনে রাজসভায় প্রবেশ করেন। সভাগৃহ উজ্জ্বল করে চারিদিকে জ্বলে উঠেছে বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠন। তার মধ্যে মহারাজাকে ঘিরে বসে আছেন পঞ্চরত্নসভার চারজন সভ্য। অন্যজন তিনি নিজে। একদিকে বসে আছেন ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁ, সমঝখেল এবং নর্তকপ্রধান শের মামুদ। এ সভায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। মহারাজা কিছু বলবার আগেই গোপাল ভাঁড় স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে আহ্বান জানায়—আসতে আজ্ঞা হোক। কেন্দ্রমণি ছাড়া কি পঞ্চরত্নসভার শোভা হয়?

সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন ভারতচন্দ্র। বিদ্রূপ কিনা ধরতে পারেন না। কাঠের পুতুলের মতো বসে রয়েছে সবাই। নির্বিকার, সমাধিস্থ ভাব। কুণ্ঠিত চরণে মহারাজাকে প্রণাম জানিয়ে সামনে যেয়ে দাঁড়ান।

স্মিত হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানান কৃষ্ণচন্দ্র;—এসো কবি। কাব্য শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ; খুশী হলাম। বসো। ওস্তাদজীর গানটা হয়ে যাক; তারপর শুনবো তোমার কাব্য। পঞ্চরত্নসভার একটা রত্ন এতদিন অনুপস্থিত ছিল। ভালো লাগতো না।

সসঙ্কোচে একপাশে বসে পড়েন রাজকবি। আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। সবাই রয়েছে। কিন্তু যাকে দেখবার আশা করেছিলেন, সে নেই। অবাক্ লাগে। সান্ধ্য-সভায় রাজ-নর্তকীর গরহাজরী কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়।

গোপন কথাটা বুঝি ধরে ফেলে গোপাল ভাঁড়—কাকে খুঁজছেন কবি?

ধরা পড়ে চমকে উঠেছিলেন ভারতচন্দ্র। সামলে নিয়ে বলেন—তোমাকেই খুঁজছি গোপাল।

—আমাকে? আমার কাছে তো রস নেই। ভাঁড় যে শুকনো।

—নাই বা রইলো। রস ভরে দিলেই শুকনো ভাঁড় ভিজে উঠবে।

মৃদঙ্গ এবং সারেঙ্গীর মৃদু আওয়াজ হচ্ছিল এতক্ষণ। তানপুরা নিয়ে মাঝখানে চোখ বুঁজে বসে আছেন ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁ। সেদিকে দৃষ্টি থাকলেও মহারাজার কান কিন্তু ছিল এদিকের কথোপকথনে। সভাকবির জবাবটা শুনেই সজোরে হেসে ওঠেন—হেরে গেলে গোপাল?

মাথা নীচু করে উঠে দাঁড়ায় গোপাল ভাঁড়।

—ও আবার কি রঙ্গ? লজ্জা নাকি?

—না মহারাজ। যুদ্ধে হেরে গেছি; তাই পরিশ্রান্ত।

সভার সকলেরই মুখ চাপা হাসিতে লাল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করেন—তার মানে?

কবিতায় উত্তর দেয় গোপাল: রসিকা নারীর কাছে: পুরুষের কিবা আছে: অর্থ, যশ, তনু, মন, ধন।

—বাঃ, তুমি যে আজকাল কবিতা লেখাও আরম্ভ করলে।

—সঙ্গদোষ মহারাজ। কবির সঙ্গ পেয়ে শুকনো ভাঁড় রসে টুপু টুপু হয়ে পড়েছে।

—বুঝলাম; এবার তোমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর।

— ব্যাখ্যা আর কি করবো মহারাজ। অত্যন্ত সোজা। কবি হলেন রসিকা নারী। কোমল হৃদয় কিনা, তাই। সব কবিরাই রসিকা নারী। আর, আমি হলাম কাঠখোট্টা পুরুষ। পুরুষ চিরদিনই নারীর কাছে হারে। আমিও হেরেছি। তাই কবি হাসিমুখে বসে আছেন। আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রয়েছি।

ঝড়ের মতো একটা হাসির তরঙ্গ বয়ে যায় সভার ওপর দিয়ে। ভারতচন্দ্র কিন্তু ঘৃণায় মুখ নামিয়ে নেন। অশ্লীল, ক্লীব একটা সভা। নিজের ওপর ধিক্কার জন্মে যায়। এই সভায় কাব্য-সুধা পরিবেশন করবেন? এ যে মরুতে ফুল ফোটানোর চেষ্টা।

হাসির ধাক্কাটা একটু কমতেই কৃষ্ণচন্দ্র ডাক দেন—কবি।

—আদেশ করুন মহারাজ।

—এবার যে একটা উপযুক্ত জবাব দিতে হয় তোমায়। কবিরা নারী। এ অপমানের শোধ নিতে হয়! গোপালের পদটা পূরণ কর।

কি জবাব দেবেন ভেবে পান না ভারতচন্দ্র। জবাব দিতেও ঘৃণা হয়। তবু রাজার আদেশ; দিতেই হবে। এইজন্যেই মাস গেলে চল্লিশ টাকা করে দেওয়া হয় তাঁকে।

বিরূপ মন ধূমায়িত হচ্ছিল। উঠে দাঁড়ান—জবাব কি না দিলেই নয় মহারাজ?

—না দিলে বুঝবো তুমি হেরে গেছো। শুধু হারা নয়; মুখ বুঁজে সমস্ত কবিদের অপমান মাথা পেতে নিয়েছো।

ভারতচন্দ্র অবজ্ঞাভরে হাসেন;—এ অপমানে কিছু যায়-আসে না মহারাজ। তবে আদেশ যখন করেছেন, তখন পদ পূরণ করবো।

একটু থেমে পরিষ্কার কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—

রসিক পণ্ডিত যত: যদি দেখ দুষ্ট মত: সারি দিবা এই নিবেদন॥

একমুহূর্ত নির্বাক্ থেকেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তারপর বলেন—সাবাস কবি। মুখের মতো জবাব হয়েছে।

হিংস্র চোখ দুটো জ্বলতে থাকে গোপাল ভাঁড়ের। কি একটা বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মহারাজা বাধা দেন;—এখন থাক গোপাল। আগে গান হোক।

বিশ্রাম খাঁ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। ইঙ্গিত পেয়ে এবার গান ধরেন।

সভার আবহাওয়া সহসা বদলে যায়। হীনতা এবং হিংস্রতার পরিবর্তে শান্ত, স্নিগ্ধ একটা ভাব ছেয়ে যায় চারিদিকে। 'একেলী না জাইহো রাধে যমুনা কে তীর।' নিজস্ব পদ্ধতিতে গাইতে থাকেন ওস্তাদ। লঘু, চপল একটি নারী যেন ছুটে বেড়াচ্ছে সভাময়। সুর এবং ছন্দে বিভোর করে দেয়। নানা রকম প্রশংসার ধ্বনি ক্রমশ মুখর হয়ে ওঠে। ওস্তাদ সমঝখেলের হাত মৃদঙ্গের ওপর নাচতে থাকে। মুগ্ধ, আবিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র চোখ বুজে বুঝি চলে গেছেন অন্য কোন জগতে।

গান শেষ হয় একসময়। তবু রেশ কাটে না। সুরের মায়ায় বিবশ সভা বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। এতক্ষণে একটু সহজ বোধ করেন ভারতচন্দ্র। এটুকু বাদ দিলে, এ সভাঁকে মনে হয় পূতিগন্ধময় নরক।

—এবার তোমার পালা কবি।

ভারতচন্দ্র উঠে দাঁড়ান। অমনি বাধা দেন কৃষ্ণচন্দ্র—তুমি পড়বে? তার চাইতে বরং নীলমণিকে দাও। গায়ক মানুষ। সুর দিয়ে বেশ রসিয়ে গাইবে।

নীলমণি সমাদ্দার উঠে আসে। কবির হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে গাইতে শুরু করে।

নিস্তব্ধ রাজসভা। সময় ব'য়ে যায়, তবু খেয়াল থাকে না কারো। গোপাল ভাঁড়ের মতো মানুষও মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে। কথা যেন হারিয়ে গেছে তার কণ্ঠ থেকে। স্বরগ্রামের বিভিন্ন সিঁড়ি ভেঙে শেষ ছত্রে পৌঁছয় নীলমণি: নরনারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয়। কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয়॥

কৃষ্ণচন্দ্রই নিস্তব্ধতা ভাঙেন প্রথমে। এই রেওয়াজ। আগে বলবেন মহারাজা। তারপর অন্য কেউ। একমাত্র ব্যতিক্রম দেওয়া রয়েছে গোপাল ভাঁড়কে। কিন্তু সেও বসে থাকে নির্বাক্ হয়ে।

—ওই অধ্যায়টা আবার শোনাও তো নীলমণি। ওই 'পরকীয়া নবোঢ়া।'

একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে নীলমণি সমাদ্দার আবার গাইতে আরম্ভ করে ঃ

আপনার পতি আছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায়ে হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরে হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পলাইল লাজ আশা-বাসা হরে হে॥
সুখের বাড়াও প্রীতি হৃদয়ের হব ভীতি
তারপরে যেবা রীতি রাখ রক্ষা কর হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চুর
হিয়া কাঁপে দুরদুর পাছে যাই মরে হে॥

গান শেষ হতেই কৃষ্ণচন্দ্র সোজা হয়ে বসেন ;—কি গোপাল, কথা বন্ধ যে ?

করজোড়ে উঠে দাঁড়ায় গোপাল ভাঁড়—কি বলবো মহারাজ আজ্ঞা করুন।

—তুমি কি বলবে তা আমি বলে দেবো ? হাসালে দেখছি।

—তা প্রাণ খুলে হাসুন ; কিন্তু চিরদিন এই হয়ে এসেছে। বড়োর হুকুমে ছোট কথা বলবে।

কৃষ্ণচন্দ্র সত্যিই হেসে ফেলেন—আমি তোমার মত জানতে চাইছি।

গোপাল কিন্তু হার মানে না। নিরীহ মুখ করে উত্তর দেয়—আপনি যা বলতে চান, ঠিক তাই।

—মানে ?

—আপনি কি বলতে চান আগে বলুন।

—অর্থাৎ, আমার যা মত, তোমারও তাই ?

—এইবার মহারাজা ঠিক ধরেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মুখখানা গম্ভীর করে নেন ;—আমার মনে হয়—।

বলবার ধরণ দেখেই আন্দাজ করে নেয় গোপাল ভাঁড়। ভালো লাগে নি মহারাজের। মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে—আমিও সেই কথাই বলছি। একটু যেন—।

কৃষ্ণচন্দ্র অমনি চেপে ধরেন—একটু যেন কি ?

—নতুন রসে তাড় কম রয়েছে।

—বল কি হে ?

—ঠিকই বলেছি মহারাজ। বসটা ঠিক জমাট হয় নি।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণচন্দ্র খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বিদূষকের দিকে। কিন্তু পরিহাসের বিন্দুমাত্রও নজরে পড়ে না। বিস্ময়টাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে নীলমণির কাছ থেকে খাতাখানা চেয়ে নেন। কয়েকখানা পাতা উল্‌টে এক জায়গায় থামেন ;— 'বিশ্রব্ধ নবোঢ়া' অধ্যায়টা পড়ছি গোপাল। দেখো তো তাড় পাও কি না রসের।

বলেই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন—

স্তন দুটি করে ছ্যাঁদা উরু দুটি ভুজে বাঁধা
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তা
টাল-টোল এখন তখন॥
যদি খেয়ে লাজ ভয় কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়
তবে আর না যায় ধারণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস বাস
নব রস কে করে গণন॥

আবৃত্তি শেষ করে মুচকি হাসেন—এবার কি বল ?

—এবারও সেই একই ব্যাপার মহারাজ। মুখ বিকৃত করে গোপাল।

চট করে ধরে ফেলেন কৃষ্ণচন্দ্র। মুখভঙ্গীটুকু না করলে এখনো ধরতে পারতেন না যে ভাঁড়ামি করছে তাঁর বিদূষক। স্বর পালটে জিজ্ঞাসা করেন—আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন বলতো?

—নতুন বলে।

সভার মধ্যে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্র আবার শুধোন—নতুন? কি করে বুঝলে?

—অভয় দেন তো খুলে বলি।

—দিলাম অভয়। বলো।

—কবি এই সবে রসে ডুব দিয়েছেন। এখনো মজেন নি।

— আরো খোলসা কর গোপাল।

—ওঁকেই খোলসা করতে বলুন মহারাজ।

বাক্যালাপগুলো নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন ভারতচন্দ্র। সন্দেহটা এইবার দৃঢ় হয়। পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে উঠে-পড়ে লেগেছে গোপাল ভাঁড়। কিন্তু আক্রমণটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে ধরতে পারেন না।

কৃষ্ণচন্দ্র একবার আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসেন:—ওঁকে আবার কেন? তুমিই বলো না।

—মহারাজ যখন আদেশ করছেন তখন বলতেই হবে। সেদিন সক্কালবেলা কবিকে দেখলাম।

—কোথায়?

—আলুথালু বেশে বাঈজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন।

—কি বললে? বাঈজীর বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ মহারাজ।

অট্টহাসির আওয়াজে জবাবটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটু থামতেই কৃষ্ণচন্দ্র আবার প্রশ্ন করেন—আমাদের রাজনর্তকীর মহল থেকে?

—হ্যাঁ।

—সত্যি নাকি কবি?

অপমানে, লজ্জায় অবনতমুখে বসে থাকেন ভারতচন্দ্র। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে যান।

উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করেন মহারাজা। তারপর যেন সামলাবার চেষ্টা করেন—তা'তে কি হয়েছে?

—সেইখানেই তো বেধেছে যত মুস্কিল। নতুন রস কিনা। দানা বাঁধতে একটু সময় নেবে। তারপরই দেখবেন কাব্য থেকে জলো ভাবটা কেটে গেছে।

আর একটা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। গোপাল ভাঁড় সগর্বে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে আবার বলে—বেচারি কবির ভাগ্যটাই খারাপ, নইলে এ বয়েসে কোথায় মজে লাল টুকটুকে হয়ে যাবেন। তা নয়।

—কি রকম?

—কুড়ি বছর বয়েস থেকে পিরিতি-রসে ডুব দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু সেখানেও সেই একই হাল। একে কাঁচা ভাঁড়, তায় নতুন রস।

উৎসাহে ঝুঁকে পড়েন কৃষ্ণচন্দ্র—তুমি কি করে জানলে?

—খবর নিতে হয়েছে মহারাজা। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। ওঁকেই শুধোন সত্যি কিনা। নরোত্তম আচার্যের মেয়েকে যখন পাকাবার তালে ছিলেন, তখন সে বেচারির বয়েস ছিল মাত্র চোদ্দ বছর। কাঁচা ভাঁড়। বিয়ে করলেও সইতে পারলো না। চিড খেয়ে গেল।

অসহ্য ক্রোধে উঠে দাঁড়ান ভারতচন্দ্র—মহারাজ।

—বল কবি।

—এগুলো ব্যক্তিগত অপমান। রসিকতা নয়।

গোপাল ভাঁড় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইঙ্গিতে বারণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর কবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—কিছু মনে করো না ভারত। এটা বিশুদ্ধ রসিকতা বই নয়।

—মাপ করবেন মহারাজ। আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না। এটা স্রেফ অপমান। ইচ্ছাকৃতভাবে অপদস্থ করা।

উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন সভাকবি ;—এ ব্যাপারটাকে আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে আসছি মহারাজ। কারো সাতে-পাঁচে থাকি না। তবু রাজসভা যেন প্রতিজ্ঞা করে পেছনে লেগেছে।

স্পষ্ট, নির্ভীক দোষারোপে কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমটা বাক্যহারা হয়ে যান। খানিক চুপ করে থেকে বলেন—ওর কথা বাদ দাও কবি। মহারাণীদের নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়ে না।

তারপর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বলেন ;—আচ্ছা, এবার রসিকতা থাক। আমার সভা জ্ঞানী, গুণী মহাজনদের পায়ের ধূলোয় ধন্য হয়েছে। আপনারা এবার নিজেদের মত প্রকাশ করুন। রসমঞ্জরী কাব্য কেমন লাগল।

রুদ্ররাম তর্কবাগীশ এতক্ষণ ছটফট করছিলেন। সুযোগ পেয়েই উঠে দাঁড়ান। আসল ঘটনা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। মনে ধরে নি কৃষ্ণচন্দ্রের। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেন—গোপাল যা বলেছে, তা যথার্থ মহারাজ।

—আপনার বক্তব্য কি বিদ্যালঙ্কার মশাই ?

ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ান বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করতে সাহস হয় না। ঘুরিয়ে জবাব দেন—আলংকারিক আনন্দবর্ধন বলেছেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। অর্থাৎ কিনা, রসাত্মক বাক্যই হ'ল কাব্য। তা রসমঞ্জরী কাব্যে রসাত্মক বাক্য যে নেই, তা নয়।

—সবারই কি সেই মত ?

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সকলে। মহারাজার উদ্দেশ্যটা ধরতে না পেরে কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র একটু অপেক্ষা করেন। তারপর ফিরে তাকান—কবি !

সেই থেকে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। আসন পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। অপমানের জ্বালা অন্তরটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তার উপর কাব্য সম্বন্ধে সকলের এই বিরূপ মনোভাব। রুদ্ধস্বরে জবাব দেন—আদেশ করুন মহারাজ।

অভিমানটুকু কৃষ্ণচন্দ্র বোঝেন। মৃদু হেসে বলেন—তুমি কিছু বলবে না?

—বলবো; কিন্তু কাব্য সম্বন্ধে নয়। সে বিচার করবেন প্রকৃত গুণীজন। দেশের পরিধি কৃষ্ণনগরে সীমাবদ্ধ নয়। তার বাইরেও রয়েছে। আমি বলবো অন্য কথা।

—অন্য কথা? মহারাজ বিস্মিত হন।

—হ্যাঁ। এভাবে অপমানিত হতে হলে, রাজসভা আমায় ছাড়তে হবে। মাসান্তে চল্লিশটা টাকা আমি যে কোন স্থানে রোজগার করতে পারবো। সম্মান বজায় রেখেই।

আমোদ-উচ্ছল রাজসভা হঠাৎ কেমন গুমোট ভাব ধারণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রও প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। পরক্ষণেই স্মিত হেসে বলেন—আপনারা সবাই মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কেউই সুবিচার করেন নি।

সভাকক্ষ যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র আবার বলেন;—অসংখ্য কাব্যের ফুলে বাংলাভাষা ভরে রয়েছে। কিন্তু সেসব ফুলে গন্ধ নেই। রয়েছে কেবল শোভা। রসমঞ্জরী কাব্যে হয়তো অনেক কিছুই নেই। কিন্তু একটা জিনিস রয়েছে, যা আর কোন কাব্যে পাই নি। তা হ'ল এ ফুলের গন্ধ।

উৎকণ্ঠিত সভা এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে। মুখ কালো করে বসে থাকেন রুদ্ররাম এবং বাণেশ্বর। অনুমান তাঁদের ভুল হয়েছে। রসমঞ্জরী ভালো লেগেছে মহারাজের। আগে বুঝতে পারলে এই সুযোগে কিছু পারিতোষিক জুটে যেত। মহারাজার সন্তুষ্টি হ'ত উপরি লাভ। কিন্তু সে সুযোগ হেলায় হারালেন তাঁরা। এর জন্যে দায়ী গোপাল ভাঁড়। ভুল পথে চালিয়েছে সে-ই।

গোপাল ভাঁড় কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মহারাজ বাধা দেন। সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে এসে ভারতচন্দ্রের একখানা হাত গভীর স্নেহে তুলে নেন;—তোমায় অপমান করে এমন ক্ষমতা

কারো নেই কবি। তুমি শিল্পী, স্রষ্টা। তোমার স্থান যে সবার ওপরে; আসন যে সবার হৃদয়ে।

ব্যাপারটা যেন নাটকীয়ভাবে ঘটে গেল। চোখে জল এসে গিয়েছিল ভারতচন্দ্রের। বুক ঠেলে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চায়।

ধরে-রাখা হাতখানাতে একটু চাপ দেন কৃষ্ণচন্দ্র;—শাস্ত্রে রয়েছে, রাজার সম্মান কেবল নিজের দেশে, কিন্তু বিদ্বানের সম্মান সর্বত্র। এ শাস্ত্রবাক্য তো তোমার অজানা নয় কবি। আমার, এমন কি নবাব আলিবর্দীর সম্মানও শুধু দেশের ভেতরে সীমাবদ্ধ। স্বার্থের খাতিরে আর ভয়ে সম্মান করে লোকে। মৃত্যুর সঙ্গেই সবাই ভুলে যাবে আমাদের। কিন্তু তোমাকে যে মনে রাখবে চিরদিন। এক যুগ থেকে আরেক যুগের হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তোমার স্মৃতি।

বলতে বলতে স্বরটা গাঢ় হয়ে ওঠে; —আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি কবি। কি বলে যে তোমায় সম্মান জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আজ থেকে তোমায় উপাধি দিলাম রায়গুণাকর। বলো, আর কি পুরস্কার চাও।

দু'চোখ বেয়ে সত্যিই নেমে আসে জলের ধারা। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না ভারতচন্দ্র। জীবনের সার শ্রেষ্ঠ দিন আজ। এরই জন্যে কত রাত জেগে কাটিয়েছেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—আমি ভুল বুঝেছিলাম মহারাজ। ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণনগর রাজসভায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সভাকবিকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

সভা ভঙ্গ হবার পরও কিন্তু ছাড়েন না। নিয়ে যান নিজের গুপ্ত-মন্ত্রণাকক্ষে।

মুখোমুখি বসেন দুজনে। কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে নিঃশব্দতা ভাঙেন —কবি রায়গুণাকর।

—বলুন মহারাজ।

—এবার কি লিখবে?

—এখনো ভাবি নি কিছু।

—লিখে যাও। আর কোন ভাবনা-চিন্তা ক'রো না। আমি চাই, তোমার নামে আমার রাজসভা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।

ভারতচন্দ্র হাসেন ;—এতটা দুরাশা রাখি না মহারাজ।

—দুরাশা নয় ভারত। জয়দেব, বিদ্যাপতি এঁদের জীবনেও তো এ আশা সত্য হয়েছিল। তোমারই বা হবে না কেন?

প্রশ্নটার উত্তরও নিজেই দেন ;—আমি বলছি হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। আজ তোমার কথা শুনবো বলেই আটকে রেখেছি।

—আমার কথা কি শুনবেন মহারাজ? সে হ'ল দুঃখের ইতিহাস। মানুষের হীনতা এবং স্বার্থপরতার ইতিহাস।

কৃষ্ণচন্দ্র একটু চুপ করে থাকেন। তারপর প্রশ্ন করেন—মানুষের শুধু এই রূপই দেখেছো?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই দেখেছি ভারত। আমায় দেখে, রাজসভার জাঁকজমক দেখে লোকে ভাবে আমি কত সুখী। কিন্তু সেটা প্রকাণ্ড ভুল। তাই এমন মানুষের কথা শুনতে চাই, যে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং ভারতচন্দ্র মুখয্যা। একজন মহারাজা, চতুঃসমাজের শিরোমণি। মুর্শিদাবাদ দরবারে যাঁর প্রবল প্রতাপ। অন্যজন ভাগ্যহত রাজপুত্র। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের রাজসভাকবি। সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি সত্তা হৃদয়ের আগল খুলে মুখোমুখি দাঁড়ায় এসে!

—কি জানতে চান মহারাজ?

—তোমার কথা; তোমার অভিজ্ঞতার কথা। তোমার পিতা রাজা নরেন্দ্র রায়ের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী শুনেছি। বর্ধমানের

মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে রাগের মাথায় কটূক্তি করে ভয়ঙ্কর ভুল করেছিলেন। নিজের শক্তি যাচাই করা উচিত ছিল আগে। সেইটাই হ'ল রাজনীতি। তবু ভালো, সে ভুল শুধরে নিয়েছেন। শুনেছি, আবার নাকি কিছু জমিদারীও পেয়েছেন বর্ধমান-রাজের কাছ থেকে। কিন্তু একটা কথা জানি না। সব থাকতেও তুমি স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন নিয়েছো কেন?

ভারতচন্দ্র বিমর্ষভাবে হাসেন;—সে অনেক কথা মহারাজ। পিতার রাজ্যনাশের সূত্র ধরেই আমার একটা চরম অভিজ্ঞতা হয়েছে। ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে দূরে সরে এসেছি।

—সেই অভিজ্ঞতার কথাই জানতে চাই রায়গুণাকর।

—পৃথিবীতে স্বার্থই হ'ল সবচেয়ে বড়। পিতা, মাতা, ভাই, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র সবারই পরস্পরের সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বার্থের ভিতের ওপর।

কৃষ্ণচন্দ্র চমকে ওঠেন—বল কি?

—হ্যাঁ মহারাজ। আমার ব্যাপারটাই ধরুন। রাজা নরেন্দ্র রায়ের রাজ্যনাশের ঘটনা আপনি জানেন। কিন্তু জানেন কি তার কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্রের কাহিনী?

—না কবি।

মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে ওঠে ভারতচন্দ্রের;— ল্পনা করুন; মাঝরাতে বর্ধমানের সৈন্যেরা পাণ্ডুয়াগড় আক্রমণ করেছে। নারকীয় চিৎকারে ভরে গেছে রাজপ্রাসাদ! তারই মধ্যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল চোদ্দ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। বাপ-মা'কে খুঁজল, বড় ভাইদের খুঁজল। কেউ নেই।

সে রাতের বীভৎস ঘটনা চোখের সামনে যেন জেগে ওঠে। ত্রাসে স্বরটা কেঁপে যায়;—কেউ ছিল না মহারাজ। ভয়ে মুখ খুলে কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি বেচারি। বিজয়ী বর্ধমানের সৈন্যেরা গড় লুট করতে ব্যস্ত। সেই ফাঁকে লুকিয়ে গুপ্তপথ দিয়ে বাইরে বেরুতেই ধরা পড়ে গেল। তখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে নি, কিছুক্ষণ

আগে ওই গুপ্তপথ দিয়েই নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গেছেন রাজা নরেন্দ্র রায়। অন্য তিন পুত্রকে নিয়ে। অথচ ছোট ছেলের কথা একবার মনেও পড়ে নি কারো।

—তোমায় শত্রুর হাতে ফেলে রেখে ?

তিক্ত একটা হাসি ফুটে ওঠে ভারতচন্দ্রের মুখে ;—হ্যাঁ মহারাজ। আমার ধারণা ছিল কেউ বেঁচে নেই। শত্রুর হাতে মারা পড়েছেন। কিন্তু ভুল ভাঙলো সকাল হতেই। বন্দী করে আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল বর্ধমানের মহারাণীর সামনে। পরিচয় পেয়েই ঘৃণায় মুখখানা কেমন বিকৃত হয়ে পড়েছিল মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর। কথাগুলো এখনো পরিষ্কার মনে আছে মহারাজ। গভীর দাগ কেটে বসে গেছে মনের মধ্যে। বলেছিলেন, আশ্চর্য ; নরেন্দ্র রায়ের এতো প্রাণের ভয় যে এই দুধের বাচ্চাকে ফেলেই পালালো ?

কৃষ্ণচন্দ্র যেন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—বিশ্বাস হয় না ভারত।

—হবার কথাও নয় মহারাজ। তবু সত্যি। লজ্জায়, অপমানে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল আমার। এর চাইতে যদি শুনতাম সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, তা'হলেও খুশী হতাম। সে দুঃখ একদিন সহ্য হয়ে যেত। অথবা আমায় মেরে ফেললেও রেহাই পেতাম সে অপমানের হাত থেকে। কিন্তু তা হ'ল না। নরেন্দ্র রায়কে শাস্তি দেবার জন্যেই বোধ হয় মনের মধ্যে আমায় বিষ দিয়ে ছেড়ে দিলেন বিষ্ণুকুমারী। সে বিষের জ্বালা আজো ব'য়ে বেড়াচ্ছি।

একটু দম নিয়ে আবার বলেন ;—আশ্রয়হীন অবস্থায় সেদিন পথে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছিলাম। কেউ এগিয়ে আসে নি। শেষ পর্যন্ত ধরেছিলাম নওয়াপাড়ার পথ। মামার বাড়িতে আশ্রয় পাবার আশায়।

—আমার মনে হয় তোমার ভুল হয়েছিল কবি।

—কি রকম ?

—পিতা-মাতা কখনো সন্তানকে এভাবে ফেলে পালাতে

পারেন না। তাড়াহুড়োর মধ্যে বোধ হয় ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। তারপর যখন বুঝতে পেরেছিলেন, তখন পাণ্ডুয়াগড়ে ফিরে গিয়ে তোমায় নিয়ে আসার আর কোন উপায় ছিল না।

ভারতচন্দ্র আবার হাসেন। অদ্ভুত তিক্ততা ঝরে পড়ে সে হাসিতে। বলেন—ভুল হলে সব চেয়ে বেশি আনন্দিত হতাম মহারাজ। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

—প্রমাণ পেয়েছো ?

—একবার নয়, অনেকবার। নওয়াপাড়া পৌঁছুতেই মামা খবর পাঠিয়েছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু উত্তর এসেছিল, আমার মতো ছেলের মুখ দর্শন করতে চান না তিনি। শেষ পর্যন্ত মামার বাড়িতেই থেকে গেলাম। ভরণ-পোষণ থেকে নিয়ে লেখাপড়া পর্যন্ত সব ভার নিলেন মামা। পাশের সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য নরোত্তম দেবের কাছে রোজ যেতাম। ব্যাকরণ এবং অভিধান শেখার জন্যে।

—কিন্তু ও উত্তর দিলেন কেন রাজা নরেন্দ্র রায় ?

—আমার ব্যবহারের জন্যে মহারাজ। পিতা কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না আমার ওপর।

—কেন ?

—তাঁর রাজকার্যে বাধা দিতাম, প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম। অনেক দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে সেই অপরাধে। কিন্তু মানুষের ওপর অমানুষিক, বর্বর অত্যাচার চালিয়ে রাজ্যশাসন করা, সে কোনদিনই সহ্য করতে পারি নি। তাই বাবা প্রায়ই বলতেন, আমি নাকি ভূরশুট রাজবংশের কলঙ্ক।

—কিন্তু জমিদারী রাখতে হলে প্রয়োজন মতো শক্ত হতেই হয় ভারত।

—সেরকম জমিদারী না থাকাই মঙ্গল মহারাজ। প্রজাদের ওপর একমাত্র অত্যাচার করাই যে জমিদারীর ধর্ম, তার ধ্বংস হওয়াই উচিত।

—কিন্তু এই সামান্য কারণে পুত্রকে শত্রুর মুখে ফেলে দিলেন ?

—আমিও কম আশ্চর্য হই নি মহারাজ। তখন অবশ্য এতটা ভাববার মতো বয়স ছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করে আমিও অবাক্ হয়েছি। সন্তান-স্নেহ যদি এত হালকা, এত ঠুনকো হয়, তবে সে সমাজ এবং সভ্যতার ভিত পর্যন্ত একদিন নড়ে উঠবে।

—আমিও তাই ভাবছি রায়গুণাকর। একটা মূল বিশ্বাসের ওপর আমরা সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছি। তা হ'ল স্নেহ এবং স্বার্থহীন প্রেম। কিন্তু তুমি একবার বসন্তপুরে গিয়ে দেখলেই পারতে। হাজার হোক পিতা। সামনে যেয়ে দাঁড়ালে ফেলতে পারতেন না।

—হয়তো পারতেন না মা বেঁচে থাকলে।

—তবু যাওয়া উচিত ছিল।

—গিয়েছিলাম মহারাজ। একবার নয়, দু'-দুবার। একটুখানি স্নেহের আশায় সব ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাবার সামনে। প্রথমবার গিয়েছিলাম শিক্ষা শেষ করে। কি অভ্যর্থনা পেলাম জানেন ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কৃষ্ণচন্দ্র তাকান।

—পেলাম অকথ্য তিরস্কার। সবার কাছ থেকেই।

—তিরস্কার ? কেন ?

ভারতচন্দ্র ইতস্তত করেন ;—কেশরকুণি বংশের মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি বলে। ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁরা আমাদের চাইতে নীচু। তার ওপর বড় তিন ভাইয়ের বিয়ে হবার আগেই বিয়ে করেছি। ভূরশুট রাজবংশে নাকি এমন কলঙ্ক দিয়েছি, যা কোনদিন মুছবে না। দাদারা অবশ্য আরো ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রেম নাকি করে বেশ্যারা। তাই অমন বউকে ঘরে তুলতে রাজী নন তাঁরা। আর, ভূরশুট রাজবংশের ছেলের নাকি এমন দুর্মতি হয়েছে সংস্কৃত শিখে। তাঁদের মতে সংস্কৃত সাহিত্য হ'ল লম্পটের।

কৃষ্ণচন্দ্র গুম্ হয়ে যান। অনেকক্ষণ পর বলেন--এই সামান্য কারণে ?

—কারণ অবশ্য আরো একটা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন। অর্থকরী রাজভাষা ফারসী না শিখিয়ে অকেজো সংস্কৃত ভাষা শিখিয়েছিলেন বলে অনেক গাল-মন্দ করেছিলেন মামার উদ্দেশ্যে। ফারসী শিখলে এই অসময়ে তাঁদের কত উপকার হ'ত।

—তারপর ?

—অনেক কথা আমিও বলতে পারতাম। কিন্তু ঘেন্নায় বলতে পারি নি। সেই সঙ্গে স্নেহের আশাও ছাড়ি নি। তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ফারসীর প্রতি যখন এত ঝোঁক, তখন তাই শিখবো। কোন বাদানুবাদ না করে সেই দিনই ছাড়লাম বসন্তপুর। সোজা চলে এলাম দেবানন্দপুরে মুন্সী রামচন্দ্র দত্তরায় মশাইয়ের কাছে। স্নেহের চাইতে যখন স্বার্থটাই তাঁদের কাছে বড়, তখন দেখব তাঁদের স্বার্থ পূরণ করে স্নেহ পাওয়া যায় কিনা।

ভারতচন্দ্র বলে যান ;—শিখেও ছিলাম মনপ্রাণ দিয়ে। বসন্তপুরে ফেরবার ইচ্ছা শেষের দিকে আর ছিল না। কিন্তু ফিরতে হল দত্তরায় মশাইয়ের অনুরোধে।

—ঠিকই বলেছিলেন দত্তরায় ; কৃষ্ণচন্দ্র সায় দেন —হাজার হলেও পিতা। সন্তানের উচিত নয় তাঁর দোষ-গুণ বিচার করা।

—হ্যাঁ মহারাজ ; দত্তরায় মশাইও একই কথা বলেছিলেন। পিতার অপরাধের বিচার পুত্র করতে পারে না। পুত্র কেবল করে যাবে তার নিজের কর্তব্য।

—দত্তরায়কে আমি জানি ভারত। অতি সজ্জন ব্যক্তি।

—ফিরে কিন্তু অবাক্ হলাম মহারাজ। অদ্ভুত ভালো ব্যবহার করলেন সকলে। কিছুই যেন ঘটে নি। কিন্তু তারও পেছনে যে হীন চক্রান্ত লুকিয়ে ছিল, তা ভাবতেও পারি নি।

—হীন চক্রান্ত ? কৃষ্ণচন্দ্র তিরস্কারের সুরে বাধা দেন ,—কি বলছো তুমি ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

—হলে অন্তত এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতাম মহারাজ। কিন্তু তা হ'ল কই। পিতার ইচ্ছায় এবার যেতে হ'ল বর্ধমান দরবারে মোক্তারী করতে। মানুষের নীচতার সঙ্গে পরিচয় যে ছিল না, তা নয়। এবার কিন্তু দেখলাম তার চরম নমুনা। আমায় বর্ধমানে পাঠিয়ে, কিছুদিন পরেই খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন তাঁরা। যা চেয়েছিলেম তাই হ'ল। হাজত-বাস।

—সত্যি? কৃষ্ণচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—একবিন্দুও মিথ্যা নয়। বর্ধমান সরকারেরই একজন কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিল। তাদেরই সাহায্যে শেষ পর্যন্ত একদিন বর্ধমান থেকে পালালাম। পৃথিবীর ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। যে দিকে তাকাই সে দিকেই কেবল স্বার্থের সংঘাত। স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা সব মিথ্যে। আর সংসারে ফেরা নয়। মানুষের সংসর্গ এড়াবার জন্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। ঘুরে বেড়ালাম বহু জায়গায়। কিন্তু সেখানেও দেখলাম সেই একই ব্যাপার। মনের দিকে তাকালাম। আরো আশ্চর্য হলাম। যে মানুষের সংসর্গ এড়াবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস নিয়েছি, তাদেরই জন্যে মন কাঁদছে রাতদিন।

—সন্ন্যাসও নিয়েছিলে? কৃষ্ণচন্দ্র হেসে ফেলেন:—ভগবানকে পেলে কি?

—কই আর পেলাম। তার আগেই ফিরে আসতে হ'ল। কিন্তু একটা প্রশ্ন এখনো দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। মানুষ মানেই কি স্বার্থপরতা?

—বোধ হয় তাই রায়গুণাকর। অন্তত এই একটা ব্যাপারে তোমার এবং আমার অভিজ্ঞতা মিলে যায়। বিষয়-লালসা যে মানুষকে কতখানি অন্ধ করে তোলে, তা কল্পনাও করা যায় না। আমার ঘটনাটাই ধরো। তুমি বোধ হয় জানো না, পিতা রঘুরাম যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন আমায় বঞ্চিত করে কাকা রামগোপালের নামে জমিদারীর সনদ নিতে দূত রওনা হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদে।

—ষড়যন্ত্র?

—হ্যাঁ কবি।

—কে ছিল এর পেছনে?

—কাকা তো ছিলেনই। বোধ হয় বাবাও ছিলেন। কিন্তু আমিও কম যাই না। সনদ বেরুলো: নবাবের মোহরও পড়ল তার ওপর। কিন্তু রামগোপাল রায়ের নামে নয়; কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামে। সজোরে হেসে ওঠেন মহারাজ।

তারপর হাসি থামিয়ে বলেন;—আমার বিশ্বাস, তোমার বিরুদ্ধে যদি সত্যিই চক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে তা করেছিল তোমার ভাইয়েরা। বৃদ্ধ নরেন্দ্র রায়ের অক্ষমতার সুযোগ নিয়েছিল তারা।

—হতে পারে মহারাজ। কিন্তু ভাইয়েরা করলেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ায়।

—তা ঠিক; মনে লাগে বইকি। কাকার ব্যবহারে আমিই কি কম দুঃখ পেয়েছিলাম? যাক, বাদ দাও এসব। তোমার ব্রাহ্মণীর কথা তো বললে না কিছু? এতক্ষণ তো কেবল দুঃখের কথাই শোনালে। ভালোবেসে বিয়ে করেছো। প্রেমের আনন্দের গানও শোনাও একটু।

আনন্দের গান। ম্লান হাসেন ভারতচন্দ্র;—সে গানও দুঃখের গান মহারাজ।

—দুঃখের গান?

—হ্যাঁ। আগেরটা ছিল স্নেহের অপমৃত্যু দেখে। এটা হ'ল নিজের অপমৃত্যুর দুঃখ।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, ভালোবাসাও ঠুনকো। স্নেহ যেমন পিতার কাছে বড় নয়, প্রেমও তেমনি বড় নয় নারীর কাছে। বড় হ'ল স্বার্থ। নারী আসলে সব সময় চায় নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়। সেই কারণেই বালিকা বয়েসে পিতাকে আশ্রয় করে থাকে; যৌবনে উপার্জনক্ষম স্বামীকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে। তাই তারা সবার প্রথমে চায় স্বামীর রোজগার এবং পুত্র।) প্রেম তাদের কাছে

একটা সাময়িক আনন্দের জিনিস। উপার্জনক্ষম স্বামীকে সন্তুষ্ট করাও হয়, পুত্রলাভও হয়। উপরি লাভ ভবিষ্যতের একটা নিশ্চিন্ত ভরসা।] এক নিশ্বাসে বলে যান ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্র অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন :—নতুন কথা শোনালে ভাবত। নতুন এবং অদ্ভুত।

—অদ্ভুত কিন্তু সত্যি।

—সত্যি হলেও এ ব্যাখ্যা সর্বনাশা। তাই মানা উচিত নয়।

—এ শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক হ'ল মহারাজ। সত্য যা তা সর্বনাশা হলেও সত্য। হেরফের হয় না কখনও।

—না হয় মানলাম। কিন্তু কি আসে-যায় তাতে?

—সকলের হয়তো যায় আসে না। আর সেইজন্যেই না-মানাব স্বপক্ষে আপনাব যুক্তিও টেকে না। আসলে এ সত্যটাকে লোকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। মুখোমুখি হতে ভয় পায়।

—বেশ তো; তুমিও সেই দলে ভীড়ে গেলে সব গোল চুকে যায়। খামকা অপ্রিয় সত্যের মোকবিলা করে ঝঞ্ঝাট বাড়িযে লাভ কি?

—সেইটেই যে পারি না মহারাজ। আমাব কাছে হৃদয় হ'ল সবচেয়ে বড। প্রেমহীন দেহ-সম্ভোগ, কিংবা দেহ সম্ভোগের জন্যেই যে প্রেম, তা স্বার্থেরই কুৎসিততম রূপ। সে রূপ দেখলে প্রাণ আমার কেঁদে ওঠে। অন্য সমস্ত দুঃখ কোনরকমে সহ্য করতে পারি। পিতার নিষ্ঠুরতা, ভাইদের চক্রান্ত, দারিদ্র্যেব যন্ত্রণা, সব। কিন্তু সইতে পারি না প্রেমের অসম্মান। সে যে মানুষকে অপমান করা।

—কবিদের নিয়ে ওই এক মুস্কিল। যত তুচ্ছই হোক না কেন, হৃদয়ের ব্যাপার হলেই আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে ফেলে।

—তার কারণ, আনন্দের কারবারই হ'ল হৃদয় নিয়ে।

—তা ঠিক; কৃষ্ণচন্দ্র তর্ক করেন না আর; তারপর বল। রসেব গন্ধ পাচ্ছি। মন উতলা হয়ে উঠেছে।

—বলবার বিশেষ কিছুই নেই। নওয়াপাড়া থাকতে বাইরের সব আকর্ষণ হতে আহত মনকে গুটিয়ে এনে কেন্দ্রীভূত করেছিলাম পড়াশোনার মধ্যে। হয়তো সেইভাবেই জীবনটা কেটে যেতো। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ভেতরে নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলে যেতাম ক্রমশ। কিন্তু আচার্য-কন্যা রাধা তা হতে দিল না। প্রেমের ভিতের ওপর জীবনটাকে আবার খাড়া করবো ভেবেছিলাম। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম রাধাকে।

—গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ।

শ্লোকটা বলেই কৃষ্ণচন্দ্র হো হো করে হেসে ওঠেন।

—চেয়েছিলাম তাই মহারাজ। কিন্তু ভুল হয়েছিল আমার।

—ভুল? হাসিটা যেন একটা হুঁচোট খায়।

—হ্যাঁ। রাতের মধুর স্বপ্ন যেমন প্রভাতেই মিলিয়ে যায়, তেমনি অলীক স্বপ্ন দেখেছিলাম। ফুলসজ্জার রাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, রাধা গৃহিণী হতে পারে, সচিব হতে পারে, আমার সন্তানদের জননী হতে পারে, কিন্তু ললিতকলা কৌশলা প্রিয় সখী, জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না।

—কেন? সাশ্চর্যে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণচন্দ্র।

—কারণ, যে চিন্তাটা তার মনে প্রথমেই দেখা দিয়েছিল, তা ছিল স্বার্থের। সারদাগ্রাম ছেড়ে আমার সঙ্গে বসন্তপুরে যেতে চায় রাধা। তার শ্বশুরবাড়িতে।

বলতে বলতে অতীতের মধ্যে যেন ডুবে যান ভারতচন্দ্র। ভুলে যান রাজপ্রাসাদের একটা ঘরে বসে আছেন। সামনে রয়েছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। বর্তমানকে ঢেকে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় অতীত। বসন্তপুরের নাম শুনেই একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে শত্রুর মুখে ফেলে একদিন পালিয়েছিলেন, তাঁদেরই কাছে যেতে চায় রাধা; তাঁর শ্রীমতী। আপত্তি জানিয়েছিলেন—না, তা হয় না রাধা।

—কেন ? শ্বশুরবাড়ি যাবো না ? শুনেছি শ্বশুর আমার রাজা।

—ঠিকই শুনেছো ; তবু যাবে না। কোনদিন নয়।

—কেন ?

—সে কথা জানতে চেয়ো না। একদিন না একদিন নিজেই জানতে পারবে।

—সব জানি আমি। কিন্তু তাই বলে কি এখানেই পড়ে থাকবো ? বাপের-বাড়িতে ?

ভারতচন্দ্র চমকে উঠেছিলেন। শেষের প্রশ্নটার কোন উত্তর না দিয়ে পালটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি করে জানলে ?

—সব খবর না নিয়েই কি তোমার হাতে বাবা মেয়েকে দিয়েছেন ? তেমন কাঁচা মানুষ তিনি নন। অধ্যাপক হলে কি হবে।

ফিক করে হেসে আবার বলে—জানো, আগের থেকেই তোমার ওপর নজর ছিল বাবার। তুমি না বললেও, তিনি নিজেই বলতেন বিয়ের কথা।

ভুলের একটা যবনিকা সরে যেতে থাকে ভারতচন্দ্রের চোখের সমুখ থেকে। বিয়েটা তা'হলে তাঁর দিক থেকে, কেবলমাত্র প্রেমের নয়। আচার্যদেবের তরফ থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান—তা'হলে তো সবই জানো। ওখানে তোমার যাওয়া চলবে না। তাই আপাতত এখানেই থাকবে।

—আর তুমি ?

—আমিও যদি থাকি ?

রাধা আতকে ওঠে—ছিঃ, পুরুষ মানুষ। কোথায় রোজগার করে নিজের সংসার পেতে বসবে। তা নয়, শ্বশুরের কাঁধে বসে খাওয়া।

—তা'হলে অন্য কোথাও চলে যাবো আমরা।

—যাবো কোথায় ? সংসার চালাবে কি করে ? রুজি-রোজগার তো কিছুই নেই।

মধুর স্বপ্নটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার হয়ে যায়। এ রাতের

জন্যে কত কল্পনার জাল বুনেছিলেন ভারতচন্দ্র। মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাজমহল।

তবু আঁকড়ে ধরেন—ও ভাবনা আজ থাক রাধা। পরে করা যাবে। আজ আমাদের প্রথম মিলনের রাত।

রাধার বাস্তববাদী মন কিন্তু এতে ভোলে না। ঝাঁঝিয়ে ওঠে—ওইটাই যে আগে ভাবতে হয়। এর পর ছেলেপুলে হবে; লোকজন বাড়বে। শেখার মধ্যে তো শিখলে শুধু সংস্কৃত। ফারসী শিখলেও না হয় একটা হিল্লে হ'ত।

কড়া একটা জবাব এসে গিয়েছিল জিভের ডগায়। কিন্তু ভারতচন্দ্র সামলে নেন। অনুনয় করেন—আমরা ভালোবেসে বিয়ে করেছি রাধা।

—তবে আর কি? না খেয়েই থাকা যাবে।

—তা অবশ্য যাবে না। কিন্তু দেহের ক্ষুধাটাই তো একমাত্র নয়। মনেরও একটা চাহিদা রয়েছে। তা মানো তো?

রাধা হেসে ফেলে। উপহাসের হাসি। বলে—এ যে দেখছি কবির মতো কথা বলতে আরম্ভ করলে। শরীর বাঁচলে তবে তো মন। তার চাইতে বরং তোমার বাবার সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেল। রোজগারের ক্ষমতা যখন নেই, তখন অত মান-অপমানের খেয়াল করলে কি চলে?

একটু চুপ করে থেকে হতাশায় ভেঙে পড়ে:—বাবা ওদিকে নিশ্চিন্ত যে মেয়ে তাঁর রাজার ঘরের বউ হ'ল। আগে যদি জানতেন—

এ তাঁর সেই শ্রীমতী, যাকে ভালোবেসে নতুন জীবন গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতচন্দ্র। শুধু স্বপ্নই নয়, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাকেও আমূল বদলে দিয়েছিলেন। প্রেমময়, নিভৃত একটা সংসার। সেই স্বপ্নই মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। আসল চেহারা দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে যেন দিশাহারা হয়ে যান;—আগে জানলে কি হ'ত রাধা?

—হ'ত আবার কি ? পাশ ফিরে শুয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে শ্রীমতী ; —বাবা কি তোমায় দেখে মেয়ে দিয়েছিলেন ? দিয়েছিলেন তোমার বাবাকে দেখে।

আঘাতের পর আঘাতে সহ্যের সীমা বুঝি ছাড়িয়ে যেতে চায়। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করেন ভারত। স্বরটা কেমন বিকৃত শোনায় ;—শোনো, ঘুমের সময় অনেক পড়ে রয়েছে। একটা কথার জবাব দাও। তুমিও কি তাই দেখে বিয়ে করেছিলে ?

—যদি বলি হ্যাঁ।

—তবে কেন ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে ? কেন খুলে বল নি আমাকে চাও না, চাও রাজা নরেন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারীর টাকা আর সম্পত্তি। কেন এই ছলনা করলে ? কেন ?

—বড় যে পৌরুষ দেখাচ্ছো। মারবে নাকি ?

আকস্মিক উত্তেজনাটা দপ্ করে নিভে যায় ;—তুমি এই কথা বললে ?

—আর কি বলবো ? যা দাপট দেখাচ্ছো।

কথা বলতেও মরমে মরে যান ভারতচন্দ্র। লজ্জায়, ঘৃণায় শরীরের মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। ঘরের ভেতর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে রোয়াকের ওপর এসে দাঁড়ান।

রাত ঢলে পড়ে প্রভাতের দিকে। আকাশে সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা। সহস্র প্রশ্ন শেষনাগের মতো ফণা উঁচিয়ে দুলছে মনের মধ্যে। আজকের এই মিলনের রাতের জন্যে কত অধীর প্রতীক্ষা জমে উঠেছিল। সেই রাতকে মনে হয় ভীষণতম দুঃস্বপ্নের মতো। এর পরের কথা ভাবতেও ভয় লাগে। মিলনের ভিতটাকেই আজ রাধা অস্বীকার করলো। পরেরটুকুকে সে হয়তো স্বীকারই করবে না।

অস্থির হৃদয়ে দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ান। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে তাঁর শ্রীমতী। বুকটা কেমন মুচড়ে

ওঠে। অবরুদ্ধ খানিকটা কান্না দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে গলা দিয়ে। একবার ভাবেন ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলবেন। জিজ্ঞাসা করবেন, যা বলেছে তা সত্যি, না মিথ্যে।

কিন্তু পারেন না। ভয়ে। নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। আবার ফিরে আসেন বাইরে।

ভাবনার যেন কোন কূলকিনারা নেই। ব্যর্থ মিলন রজনীর অন্ধকার ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। ঘরের ভেতরে নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে রাধা। তাঁর চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। প্রেমের সঙ্গে প্রয়োজনেব লড়াই। এ যুদ্ধে কি হার মেনে নেবেন? রাধার যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে হৃদয়কে অস্বীকার করবেন?

অন্তরাত্মা প্রতিবাদে চিৎকার করে ওঠে। না, না, না। দেহকে তিনি হৃদয়ের ওপরে বসাতে পারবেন না কোনদিন। সে চেষ্টা হবে কেবল নিজের সঙ্গে প্রতারণা। প্রতারণার ভেতর দিয়ে জীবনকে টেনে নিয়ে চলা, সে অসম্ভব।

হৃদয়কেই জয়ী করবেন। দেহের চাহিদা মিটিয়েই।

—কি হ'ল? ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেলে যে। কৃষ্ণচন্দ্র তাগাদা দেন।

চমকে বর্তমানে ফিরে আসেন ভারতচন্দ্র। অনেক দূর থেকে যেন কথাগুলো ভেসে আসে,—ভোরেব পাখিরা জাগবার আগেই পথে নেমে পড়লাম মহারাজ। কেউ জানতে পারলো না প্রথম মিলনের ব্যর্থ বাসরকে অন্ধকারেব মধ্যেই রেখে এলাম সারদা-গ্রামে। আলো যখন ফুটলো, সারদাগ্রাম তখন বহুদূর পেছনে পড়ে রয়েছে। একমাত্র চিন্তা তখন ছিল বসন্তপুর।

—বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইবে, এইটাই তো স্বাভাবিক রায়গুণাকর। হতবাক্ কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে এতক্ষণ পর ভাষা জোগায়।

—তা মানি; কিন্তু তারও তো ক্ষেত্র বিশেষ রয়েছে। প্রেমকে যে স্বার্থের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, তাকে ভালোবেসেছি,

বিয়ে করেছি; এ আক্ষেপ, এ লজ্জা যে মরলেও যাবে না আমার।

—কিন্তু একটা কথা যে স্বীকার করতেই হবে কবি; কৃষ্ণচন্দ্র তর্ক তোলেন;—সব সম্পর্কের ভেতরেই কিছু না কিছু স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। এই যে আমার কুমাররা। আমি কি আশা করি না, যে আমার বৃদ্ধ বয়েসে তারা পাশে এসে দাঁড়াক; হাতের লাঠি হোক। তেমনি স্ত্রীও আশা করেন নিজস্ব আনন্দময় একটা সংসার।

—সে কেবলমাত্র একটা আশা মহারাজ। সে আশা পূর্ণ না হলে কি আপানার হৃদয় থেকে স্নেহ, প্রেম সব উবে যাবে?

—তা হয়তো যাবে না; তবে কিছুটা কমবেই। একেবারে স্বার্থহীন প্রেম হয় না রায়গুণাকর। ওটা কেবল কল্পনা। সেই অসম্ভব জিনিসই তুমি চেয়েছো স্ত্রীর কাছে।

ভারতচন্দ্র নির্বাক্‌ভাবে বসে থাকেন। মনে পড়ে যায়, প্রিয়ম্বদার সঙ্গেও এই প্রসঙ্গ নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল। সে কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রেমকে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয় নি।

—বল, অসম্ভব জিনিস চাও নি কি?

—না মহারাজ। আমি বিশ্বাস করি স্বার্থহীন প্রেম পাওয়া যায়। মানুষ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে। একজন হয়তো পারলো না; কিন্তু অন্যজন পারে। মানুষের অনেক দোষ দেখেছি। তবু শ্রদ্ধা হারাই নি এই কারণেই।

—কি জানি, হয়তো পারে। কিন্তু এই সামান্য কারণেই তাকে ত্যাগ করলে?

—ত্যাগ আমি করি নি মহারাজ। বলতে পারেন, সেই আমায় ত্যাগ করেছে। সন্ন্যাসজীবন ছাড়বার পর অনেক আশা এবং বিশ্বাস নিয়ে আর একবার ফিরে গিয়েছিলাম সারদাগ্রামে। ভেবেছিলাম, এতদিনে হয়তো ভুল ভেঙেছে তার।

বিমর্ষ, করুণভাবে হাসেন ভারতচন্দ্র;—কিন্তু আবারো ভুল

হ'ল। প্রেম বাদে রাধা দিয়েছে সব কিছু। এবং যা দিয়েছে, তার বদলে দাবী করেছে অনেক বেশি। জীবনের সব আদর্শকে ছেড়ে, তার সংসার সাজিয়ে দিতে হবে। বুঝলাম, এখনো সে নিজের মতটাকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আমার চেয়ে, আমার রোজগারই বড় তার কাছে। আলোচনা করে দেখলাম, আচার্য-দেবেরও একই মনোভাব।

—খারাপ কিছু তো তাঁরা বলেন নি।

—তা হয়তো বলেন নি। কিন্তু আদর্শকে কোন মূল্যের বিনিময়েই ছাড়তে পারবো না মহারাজ। ভেবে দেখলাম, এভাবে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। অর্থ উপার্জনের পথ আমার জন্যে নয়। আমি কবি; দেবী বীণাপাণির সাধক। তাঁকে অপমান করে অর্থের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে পারবো না। তাই আবার একদিন সারদাগ্রাম ছাড়লাম। তারপর এসে ঠেকেছি এখানে।

অদ্ভুত ম্লানভাবে আবার হাসেন রায়গুণাকর। কান্না যেন ঝরে পড়ে সে হাসিতে। বলেন ;—রাধা হয়তো এত কিছু ভাবে না। তার কাছে সব হ'ল ঘর-সংসার। ওইটুকু পেলেই সন্তুষ্ট সে। জীবনকে সার্থক জ্ঞান করবে। কিন্তু আমি কি নিয়ে ভুলে থাকবো বলতে পারেন? পুরুষাকার দিয়ে নিজের ভাগ্যকে বদলাতে পারি; কিন্তু নিঃসঙ্গতাকে ভরাট করবো কি দিয়ে? অপরের দেহের ওপর আমার হাত থাকতে পারে; কিন্তু অন্যের হৃদয়ের ওপর যে কোন হাতই নেই। আমি সেখানে অক্ষম, অসহায় দর্শক মাত্র। পুরুষের জীবনের এই নিঃসঙ্গতার দিকে কেউই কি কোনদিন দৃষ্টি দেবে না? কোন নারীই কি অনুভব করবে না হৃদয়ের হাহাকার? অথচ দোষ দেবার বেলায় সবাই দেবে পুরুষকে।

বাক্যহারা কৃষ্ণচন্দ্র স্তম্ভিতভাবে বসে থাকেন। প্রশ্নের পর প্রশ্নগুলো চিন্তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজের অন্তরেও কোথায় যেন একটা করুণ রাগিণী মৃদু শব্দে বেজে চলেছে।

অথচ কবির মতো একলা তিনি নন। নিঃসঙ্গতার বেদনার কোন উপলব্ধিই তাঁর নেই। সে সুযোগই হয় নি কখনো। সর্বদা কর্মব্যস্ত জীবনের যেটুকু খালি থাকে, সেটুকুকে পুরোপুরি অধিকার করে রয়েছেন মহারাণী সুনন্দা এবং পদ্মিনী। তবু একটা জায়গায় রায়গুণাকরের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। কবির মতো তিনিও বিশেষ একটা জায়গায় একেবারে একলা। সেখানে কোন সঙ্গী নেই, সাথী নেই, সমব্যথী নেই। অনুভূতিটা অত তীব্র না হলেও রয়েছে, তা বেশ অনুভব করা যায়।

—আমার কথা তো শুনলেন মহারাজ।

—হ্যাঁ শুনলাম ভারত; সম্বিত ফিরে পান কৃষ্ণচন্দ্র;—সেই কথাই ভাবছি। যা বললে, খুঁটিয়ে দেখলে তা প্রায় সব পুরুষেরই অন্তরের কথা। তোমার শুধু একলার নয়। আসলে বোধ হয় নারী এবং পুরুষ দু'য়ের জগতের মাঝে একটা দেওয়াল রয়ে গেছে। দেওয়ালের ওপারে কেউ কাউকে চেনে না, জানে না। ভয় করে। হয়তো ঘৃণাও করে। কিন্তু তাই বলে কেউ তো সারাজীবন সেজন্যে আক্ষেপ করে না।

—আক্ষেপ আমিও করি না মহারাজ। কেবল আমার তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল হৃদয়ের জন্যে দুঃখ পাই।

—কিন্তু তাতে লাভ কি?

—লাভ-ক্ষতি জানি না। শুধু জানি, এই অনুভূতিটুকু হারালেই আমার মৃত্যু হবে। দৈহিক নয়, মানসিক। সেভাবে জড়পদার্থের মতো বেঁচে থাকার চাইতে, নরকযন্ত্রণাও অনেক ভালো।

—অর্থাৎ, সারাজীবন দুঃখের কান্না কাঁদবে?

—না; ভারতচন্দ্র দৃঢ়স্বরে আপত্তি করেন;—আবর্জনার সার দেওয়া মাটিতে ভালো ফুল ফোটে। দুঃখের সার দেওয়া জীবনে আমিও আনন্দের ফুল ফোটাবো, সৌন্দর্যের গান গাইবো। কাঁদবো না; কখনো কাঁদি নি।

—কি জানি কবি, আমার মাথায় ঢুকছে না কথাগুলো। তাই

বলে তর্কও তুলবো না। আমার ধারণাই যে একমাত্র ঠিক, তা বলি না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। জীবন-দর্শনের ব্যাপারে কবিরা ঋষিতুল্য। তাঁদের সে অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নেই।

ভারতচন্দ্র বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বলেন—একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়।

—কি?

—ভূরশুট রাজবংশ যদি রাজ্য না হারাতো, তবে আমিও বোধ হয় দেবী সরস্বতীর করুণা থেকে বঞ্চিত রয়ে যেতাম।

—মানে? কৃষ্ণচন্দ্র সাশ্চর্যে তাকান।

—বিষয়-সম্পত্তির মোহের জালে জড়িয়ে পড়লে সৃজনী-প্রতিভা জাগে না।

—তাই কি?

—হ্যাঁ।

—প্রমাণ দিতে পারো?

—অসংখ্য। কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস; কত নাম করবো।

—কিন্তু আমিও যে উল্টো প্রমাণ হাজির করতে পারি রায়-গুণাকর। হর্ষবর্ধন, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান-কন্যা জাহানারা।

—প্রমাণ হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল মহারাজ। আমি যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের তুলনায় এঁদের কীর্তি প্রায় কিছুই নয়। একথা আপনিও মানবেন।

—তা অবশ্য ঠিক; কৃষ্ণচন্দ্র স্বীকার করেন। একটু ভেবে বলেন;—বোধ হয় দুঃখই মানুষকে কবি করে তোলে। জীবন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেয়। ঠিকই ব'লছো মনে হয়।

কথাটা শেষ করে মৃদু হাসেন;—কিন্তু এবার যে তুমি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লে রায়গুণাকর।

—জড়িয়ে পড়লাম?

—হ্যাঁ। দুঃখ না পেলে তুমি দেবী ভারতীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে না; কবি হতে পারতে না। পারতে কি?

—বোধ হয় না।

—অর্থাৎ দুঃখই তোমাকে জীবনের আদর্শ পাইয়ে দিয়েছে।

—সে কথা আগেই স্বীকার করেছি মহারাজ।

—তবে? তোমার এই দুঃখের যাঁরা কারণ, তাঁদের ওপর তুমি দোষারোপ করছো কেন? প্রকারান্তরে তাঁরা তোমার বিরাট উপকার করেছেন। এর জন্য তাঁদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—সে কৃতজ্ঞতা আমি সব সময়েই মনে রাখি।

—কেবল মনে রাখলেই তো হবে না কবি। শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না।

—আর কি করতে পারি মহারাজ?

—কর্তব্য। যে কর্তব্য এতদিন এড়িয়ে গেছো, তাই করতে হবে এবার। তুমি যে অকৃতজ্ঞ নও, তার প্রমাণ দিতে হবে।

নির্বোধ দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র তাকান;—তার মানে?

—স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্য এখন পর্যন্ত পালন করেছো?

—সেও তো স্বামীর প্রতি কোন কর্তব্য করে নি।

কৃষ্ণচন্দ্র মুচকি হাসেন;—নিজের কথাকে নিজেই অস্বীকার করছো রায়গুণাকর।

—কি রকম?

—স্ত্রী তোমায় দুঃখ দিয়েছেন। সেই দুঃখই তোমায় কবিত্ব দিয়েছে।

রায়গুণাকর আর কোন জবাব দিতে পারেন না।

—তা'ছাড়া অন্য যুক্তিও রয়েছে। স্ত্রী নিজের কর্তব্য করেন নি বলে, তুমিও করবে না?

এ প্রশ্নেরও উত্তর জোগায় না কোন। কৃষ্ণচন্দ্র আবার বলেন; —না কবি; তোমার কাজের কোন কৈফিয়ত নেই; হয় না। এ ভুল তোমাকে শোধরাতেই হবে।

—কি ভাবে ?

—স্ত্রীকে আনিয়ে নাও এখানে। সে বেচারির মনের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হোক এবার। তা'ছাড়া, এ ভাবেই বা আর কতদিন কাটাবে ?

—মাপ করতে হবে মহারাজ। প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের উপার্জনে বিষয় সম্পত্তি না করে তাকে আনবো না। সে চায় অর্থ এবং সম্পত্তি। আমায় নয়।

—ওটা হ'ল অভিমানের কথা।

ভারতচন্দ্র তর্ক করেন না। বিমর্ষভাবে বলেন ;—কোথায় এনে তাকে তুলবো ? আমার নিজেরই তো কোন চাল-চুলো নেই।

—তা বটে ; কৃষ্ণচন্দ্র একটু চিন্তা করেন ;—কোন্ জায়গাটা তোমার পছন্দ হয় বলতো ? অবশ্য আমার জমিদারীর ভেতরে।

—এ কথা কেন মহারাজ ?

—কিছু বিষয়-সম্পত্তি তোমায় দেবো। গঙ্গাতীরে বাস করবে ?

অভিভূত হয়ে পড়েন রায়গুণাকর ;—কোথায় ?

—মূলাজোড়ে। ওপারেই ফরাসডাঙা। ইন্দ্রনারায়ণ তোমার বহু উপকার করেছেন। তাঁর কাছাকাছিও থাকতে পারবে।

—আপনার অসীম অনুগ্রহ !

—অনুগ্রহ নয় কবি ; এ হ'ল গুণের সমাদর। কালই দেওয়ানজীকে বলে দেবো মূলাজোড় গ্রামখানা তোমার নামে ইজারা দেবার সব ব্যবস্থা করে দিতে। বাড়ি তৈরির জন্যে যা লাগে তাও দিয়ে দেবেন।

আর কিছু যেন চিন্তা করতে পারেন না ভারতচন্দ্র। রাত বেড়ে ওঠে। রাজপ্রাসাদের ঘড়ী ঘণ্টায় দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হ'ল। ঘণ্টার আওয়াজে সম্বিত ফিরে পান ;—এবার যাবার অনুমতি দিন মহারাজ।

—যাবে ? যাও ; রাতও হ'ল। প্রার্থনা করি সাধনা তোমার সার্থক, জয়যুক্ত হোক। হলে, আমার চাইতে বেশি আনন্দিত আর

কেউ হবে না। তবে একটা কথা। স্ত্রীকে কিন্তু অবশ্যই আনবে। এটা কেবল আমার অনুরোধই নয় . আদেশও মনে করতে পার।

একটু হেসে রসিকতার সুরে বলেন ;—বিক্ষিপ্ত মনে কাব্য সৃষ্টি হয় না রায়গুণাকর। কাব্যের কারবার হ'ল হৃদয়ের সঙ্গে। সেই হৃদয়ই যদি চঞ্চল থাকে, তবে সৃষ্টি হবে কি করে? সংসার পেতে বসে মনকে আগে শান্ত করো।

খবরটা যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে পরের দিনই। বিশেষ করে চাঞ্চল্য জাগে রাজসভায়। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন ভারতচন্দ্র। সেইটাই ছিল প্রধান অপরাধ। সভাসদেরা প্রায় কেউই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি তাঁকে।

ভয়টা তাঁদের অবশ্য একেবারে অমূলক ছিল না। যে কারণেই হোক কৃষ্ণচন্দ্র ক্রমশ বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন কবির প্রতি। সে আকর্ষণ চরমে উঠল যেদিন মহারাজা তাঁকে দিলেন "রায়গুণাকর উপাধি। ক্ষুব্ধ রোষে ফুঁসতে থাকে রাজসভা।

ফুঁসতে থাকে; কিন্তু প্রকাশ করবার সাহস ছিল না। মহারাজার ভয় তো ছিলই। তার ওপর ছিল নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা।

খবরটা সেই কারণেই যেন বেশি করে আঘাত দেয়। মূলাজোড় গ্রাম ইজারা পেয়েছেন ভারতচন্দ্র। তার ওপর বাসগৃহও তৈরি করিয়ে দিচ্ছেন মহারাজা। নিজের খরচে। অথচ তাঁদের ভাগ্যে প্রাপ্তিযোগ বিশেষ কিছুই ঘটে নি। আফসোসে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে সকলের।

এরই ভেতরে তবু একটু সান্ত্বনার স্পর্শ পায়। চলে যাচ্ছেন ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণনগর ছেড়ে। রাজসভায় যদি তাঁর উপস্থিতি না থাকে, আকর্ষণও ক্রমে কমে আসবে কৃষ্ণচন্দ্রের। বড়দের রীতিই

এই। যতদিন চোখের সম্মুখে থাকবে ততদিন দহরম-মহরম। আড়াল হলেই ভুলে যাওয়া। মহারাজাও ভুলে যাবেন। এত দুঃখের মধ্যে তবু এইটুকুই যা শান্তি। রাজসভাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পঞ্চরত্ন সভার সদস্যদের ভেতরে খুশী হন না কেবল একজন। ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁ। প্রকৃত গুণী; অন্যের গুণের আদর করতেও জানেন। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না কোনদিন। নিজের অন্তরের গন্ধে নিজেই মাতোয়ারা হয়ে আছেন সব সময়। সুরের সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আব কোন জিনিসের প্রয়োজনও মনে জাগে না।

এমন যে মানুষ, তিনিও খবরটাতে চঞ্চল হন। পরিষ্কার বলেই ফেলেন একদিন ;—এতদিনে একজন সত্যিকারের মানুষের দেখা পেয়েছিলাম বাবুজী। তাও চলে যাচ্ছেন।

স্বল্পভাষী, আদর্শমুগ্ধ গায়ক। মনের ভাবকেও সব সময় ঠিক মতো প্রকাশ করতে জানেন না। কিন্তু সামান্য কয়েকটা কথার আন্তরিকতা ভারতচন্দ্রকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। গাঢ়-স্বরে বলেন :—তবু তো ভালো করে পরিচয়টাও হ'ল না ওস্তাদজী।

—পরিচয় কি আর কথা দিয়ে হয় বাবুজী। পরি হয় হৃদয় দিয়ে। যতটুকু দেখেছি তাইতেই বুঝেছি আপনি একজন সাঁচ্চা গুণী লোক।

—ও কথা বলবেন না ওস্তাদজী। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ।

ক্ষোভটাকে প্রকাশ করবেন না ভেবেছিলেন ভারতচন্দ্র। চলেই যখন যাচ্ছেন, তখন কি দরকার এসব কথায়। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ে ;—তা'ছাড়া, আমি চলে গেলে অনেকেই খুশী হবে।

এ কথার কোন জবাব দেন না বিশ্রাম খাঁ। দুঃখিতভাবে কেবল হাতখানা চেপে ধরেন ভারতচন্দ্রের।

খুশী অবশ্য হয় না আর একজন। প্রিয়ম্বদা। সংবাদটা পেতে

একটু দেরি হয়েছিল তার। কৃষ্ণনগরে ছিল না। ফিরে এসেই শোনে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে ;—তুমি নাকি চলে যাচ্ছো ?

অলস বিকেলে ভারাক্রান্ত মনে বাগানের মধ্যে বসেছিলেন ভারতচন্দ্র। নতুন কাব্যে হাত দিয়েছেন ; অন্নদামঙ্গল। এখনো শেষ হয় নি। মূলাজোড়ে যেয়েই লিখে ফেলবেন বাকীটুকু। ওখানকার প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। এখন কেবল একটা শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশ করলেই হয়।

এই কয়েক বছরে কৃষ্ণনগরকে যে এমন গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, সে কথা বোঝেন নি। যতই যাবার দিন এগিয়ে আসছে, ততই যেন বেশি করে অনুভব করছেন বন্ধনটাকে। এক একবার মনে হয়, না গেলেই ভালো হ'ত। কি প্রয়োজন তাঁব বিষয়-সম্পত্তির ? একমাত্র রয়েছে কর্তব্যপালন। কৃষ্ণচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন। রাধার প্রতি স্বামীর কর্তব্য করতে পারেন নি তিনি। সেটুকুর ব্যবস্থা এখান থেকেও করা যায়। মহারাজাকে একবার মুখ ফুটে বললেই মাইনে বেড়ে যাবে। তাই থেকে একটা মোটা টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেই সবদিক বজায় থাকে। কর্তব্যও করা হয় ; রাধাও খুশী হয়।

কিন্তু ব্যবস্থাটা কিছুতেই মনে ধরে না। স্ত্রীকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। অনুরোধটাতে প্রথমে বিরক্তি জেগেছিল। দিন কয়েক যেতেই কিন্তু একটা অপূর্ব অনুভূতির সাড়া পেয়েছিলেন। বিরক্তির তলায় যেন ফল্গুধারার মতো ক্ষীণ একটা খুশীর স্রোত বইছে। শ্রীমতী তাঁকে ভুললেও, তিনি তাকে ভুলতে পারেন নি।

সেই কথাই ভাবছিলেন। রাজনর্তকীর প্রশ্নে ম্লান হাসেন :—হ্যাঁ প্রিয়ম্বদা। এখানকার বাস এবার উঠলো।

—কোথায় যাচ্ছো ?

—মূলাজোড়ে।

—মূলাজোড় ? সে আবার কোথায় ?

—গঙ্গার ধারে ; ফরাসডাঙার ওপারে।

—সেখানে কি রয়েছে যে কৃষ্ণনগরের মতো জায়গা ছেড়ে যাবে ?

—ছিল না কিছুই প্রিয়ম্বদা। এখন হয়েছে। মূলাজোড় গ্রামখানা মহারাজা আমায় ইজারা দিয়েছেন। সরকারী খরচে বসতবাড়িও তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন !

গম্ভীরমুখে চত্বরের ওপর বসে রাজনর্তকী :—খুব সুখবর। আগেই বলেছিলাম, রসমঞ্জরী কাব্য সবাইকে টেক্কা দেবে।

কথাটার অন্তর্নিহিত খোঁচায় ভারতচন্দ্র দুঃখিত হন :—এখনো এভাবে বিদ্রূপ করবে ?

—বিদ্রূপ কোথায় করলাম ? খোসামোদের পুরস্কার পেয়েছো ; রায়গুণাকর উপাধি, জায়গীর। সেই প্রশংসাই তো করছি।

ভারতচন্দ্র হাসেন। হাসি দিয়ে যেন ঢেকে দিতে চান ব্যঙ্গটাকে ; —একটা কথা বলবো ? রাগ করবে না তো ?

—রাগ করবো কেন ? যা ইচ্ছে বলো।

—মনে আছে, তোমায় প্রথম দেখে নাম দিয়েছিলাম প্রিয়ম্বদা ?

—খুব মনে আছে।

—আজ কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল করেছিলাম।

—কেন ? অবাক্ দৃষ্টিতে তাকায় বাঈজী।

—প্রিয়ম্বদা নাম না দিয়ে, দেওয়া উচিত ছিল অ প্রিয়ম্বদা।

—আমি অপ্রিয় কথা বলি ?

—অন্তত আমার সঙ্গে। এ ব্যাপারে মালিনী হীরা এবং তোমার মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে।

—আমার সঙ্গে হীরা মালিনীর তুলনা করলে ?

অভিমানের সুরটুকু লক্ষ্য এড়ায় না ভারতচন্দ্রের। হেসে জবাব দেন ;—না করে উপায় কি ? হীরা যখনই কথা বলে, মনে হয়

ঝগড়া করছে। তুমিও যেন ঝগড়া করবার জন্যে সব সময় পা বাড়িয়ে রয়েছো।

একটু থেমে বলেন ;—আমি না হয় খোসামোদের পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু তুমি চটছো কেন বলো তো ?

বাঈজী সত্যিই দুঃখিত হয়েছিল। চট করে সামলে নেয় :—চটেছি বুঝি ?

—তা' তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্ত যদি না পেতাম তা'হলে তুমি খুশী হতে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে যান ;—যাক ; ঝগড়া করে দরকার নেই। যাবার সময় কারো রাগ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। নিয়ে যেতে চাই অনুরাগ। কে জানে, আর কখনো দেখা হবে কিনা।

আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছিলেন রায়গুণাকর। বাঈজী কিন্তু তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় ;—অনুরাগের ওপর এত লোভ ?

—হ্যাঁ প্রিয়ম্বদা। এ লোভ যার নেই, সে মানুষ নয়।

—তা'হলে একমাত্র তুমি ছাড়া আর সবাই অমানুষ। কি বলো ?

—সে কথা বলি নি। বলেছি, মানুষ মাত্রেই অনুরাগের ওপর লোভ আছে।

—কিন্তু আমার যে একেবারেই নেই। রাজনর্তকী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

পরক্ষণেই সামলে নেয় ;—রাগ, অনুরাগ, প্রেম, ভালোবাসা, কোন কিছুর ওপরই আমার লোভ নেই কবি।

—আশ্চর্য। আমি কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলাম।

—কি ভেবেছিলে ? আমি একজন উঁচুদরের প্রেমিকা ?

—না, তা নয় ; তবে—

মুখের কথাটা কেড়ে নেয় বাঈজী ;—তাই বুঝি আমার কথায় আঘাত পাও ?

আবার সেই পরিহাসের তরল সুর দেখা দেয়। মনটা কেমন কঠিন হয়ে ওঠে রায়গুণাকরের। তিক্তস্বরে জবাব দেন ;—আঘাত আর পাই না প্রিয়ম্বদা। মানুষের হিংস্রতা এত দেখেছি যে দুঃখ আর হয় না। এখন কেবল অবাক্ লাগে।

—অবাক্ লাগে?

—হ্যাঁ। কত বড় কারিগর এই বিধাতা। সব মানুষের কাঠামো এক। তবু একজনের সাথে অপরজনের কোন মিল নেই। প্রত্যেকেই আলাদা। যেমন চেহারার দিক থেকে, তেমনি অন্তরের দিক থেকে। যে অন্তর ভগবানের নাম করে, সেই অন্তরই হাসিমুখে খুন করে। যে হৃদয় ভালোবাসে, সেই হৃদয়ই আঘাত দেয়।

—তা'হলে তো অনেক কিছু দেখেছো? মুখ টিপে হাসে বাঈজী।

—হাসছো তুমি?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রাজনর্তকী। পরিহাসের আভাসটুকু মিলিয়ে যায় চোখ দুটো থেকে :—হাসলাম, একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল বলে। তোমাব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে।

—কি রকম? ভারতচন্দ্র বিস্মিত হন।

—হ্যাঁ; চোখের ওপর ঘটতে দেখেছিলাম বলেই প্রতিটি কথা মনে রয়েছে। যে হৃদয় প্রেম করে, সেই হৃদয়ই আবার খুন করে নৃশংসভাবে। বড় সুন্দর কথাটা বলেছো কবি। স্বীকার করছি, তোমার অন্তর্দৃষ্টি আছে।

তিক্ত মন অনেকখানি প্রসন্ন হয়ে আসে রায়গুণাকরের। স্মিত হেসে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করেন ;—আপত্তি না থাকে বলো। শুনি তোমার ঘটনা।

—সত্যি শুনতে চাও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো, কাউকে বলবে না।

মুহূর্তের ব্যবধানে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেছে রাজনর্তকীর মধ্যে। রায়গুণাকর প্রথমটা হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারপর জবাব দেন ;—বেশ, কথা দিলাম।

বাঈজী মৃদু হাসে ;—রাজনীতির খবর রাখো কিছু ?

—না প্রিয়ম্বদা। ওসব নীচতা আমার বরদাস্ত হয় না।

—মুর্শিদাবাদের নাম শুনেছো ?

—সে তো সবাই জানে।

—আলিবর্দী খাঁর নাতি সিরাজের নাম শুনেছো ?

—সিরাজউদ্দৌলা ? ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত হয়ে যায় ভারতচন্দ্রের ;—ও নাম সবাই শুনেছে বাঈজী। তবে না শুনলেই বোধ হয় ভালো হ'ত।

মতামতটুকুকে কোন আমল দেয় না রাজনর্তকী। আপন মনেই বলে যায় ;—সিরাজউদ্দৌলা একবার দিল্লী থেকে ভালোবেসে এক বাঈজী কিনে এনেছিল। একলাখ টাকা দাম দিয়ে। নাম ছিল তার ফয়জান। শুনেছো ?

—বলেছি তো : নবাব বাদশাহদের কোন খবর আমি রাখি না।

রাজনর্তকী হাসে ;—হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। শোনো তারপর। ফয়জান বাঈয়ের ওজন ছিল মাত্র বাইশ সের। বাঈজীকে পেয়ে সিরাজ ভুলে গেল সবকিছু। ভুলে গেল চেহেলসতুন প্রাসাদের বেগম লুৎফউন্নিসাকে। ভুলে গেল হীরাঝিল প্রাসাদে তার প্রেয়সীকে। অথচ এই দুজনকেই সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তার সাক্ষী আমি নিজে।

বলতে বলতে দূর অতীতের মধ্যে যেন ডুবে যায় রাজনর্তকী ;—দিনের আলোয় কোনদিন সিরাজকে হীরাঝিলে আসতে দেখি নি। সাহস করতো না। আসলে ভয় করতো দাদুকে। সেদিন কিন্তু সূর্য ডোববার অনেক আগেই হীরাঝিলে তাকে ঢুকতে দেখে

চমকে উঠেছিলাম। একজনকে মাত্র সঙ্গে দিয়ে এসেছে মোহনলাল। জানালার ধারে বসে কিছুই নজর এড়ায় নি আমার।

—তুমি হীরাঝিলে কি করছিলে? অবাক্ কণ্ঠে বাধা দেন রায়গুণাকর।

—তা দিয়ে তোমার দরকার?

—না, দরকার কিছু নেই। এমনি জানতে চাইলাম।

রাজনর্তকী রসিকতাভরে হাসে;—মুর্শিদাবাদের বেগম হবার আশা নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম কবি। বেগম লুৎফাকে হটিয়ে সে জায়গা আমি দখল করবো এই ছিল ইচ্ছে। এগিয়েও ছিলাম অনেকটা। ফয়জান বাঈ মধ্যে এসে না পড়লে হয়তো হতামও। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনতে চাও, না ফয়জান বাঈয়ের কথা?

একটা বর্ণও কিন্তু বিশ্বাস করেন নি ভারতচন্দ্র। হেসে বলেন; —গালগল্পই যখন শুনবো, তখন দুজনেরটাই না হয় শুনলাম।

—গালগল্প! ক্ষণেকের জন্যে রাজনর্তকী যেন বেঁকে বসে। পরক্ষণেই হেসে ফেলে;—ফয়জান বাঈয়ের গল্পটাই তা'হলে আগে শোনো। আমারটা পরে বলবো। তবে গালগল্পই হোক, আর যাই হোক, আর কারো কানে যেন না যায়।

—মনে থাকবে প্রিয়ম্বদা। এবার বলে যাও।

—সিরাজকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখেই বুকটা কেঁপে উঠেছিল আমার। না জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। এভাবে দেহরক্ষী ছাড়া কখনো চলাফেরা করে না সে। তাড়াতাড়ি গোলকধাঁধার পথে নেমে গেলাম। সিরাজই চিনিয়ে দিয়েছিল গুপ্তপথগুলো। কাজে লেগে গেল সেদিন। পা টিপে টিপে বাঈজী মহলের ঝরোখার আড়ালে যেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি দেখলাম জানো?

—আমি কি করে জানবো। আমি তো আর ওখানে হাজির ছিলাম না।

রসিকতাটাকে উপেক্ষা করে রাজনর্তকী;—ওপাশের দৃশ্য দেখে

শরীর যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সিরাজ আর ফয়জান। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আর ক্রোধে কেমন বীভৎস দেখাচ্ছিল নবাবজাদাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—বাজারের বেশ্যাকে শাহী-তখ্‌তে বসালেও তার স্বভাব যাবে না।

ফৈজীর গোলাপী গাল দুটোতে এক ঝলক রক্ত আছড়ে পড়ে কথাটা শুনে। মুক্তোর মতো দাঁত দিয়ে কঠিনভাবে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হাসে ;—ঠিকই বলেছেন নবাবজাদা। স্বভাব যাবে না আমাদের। নইলে নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলার আম্মাজান হয়েও আমিনাবেগমের স্বভাব বদলালো না কেন ?

বাঈজী মহলে যেন বাজ পড়লো। কিছুক্ষণের জন্যে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল সিরাজ। রূঢ়, কঠিন সত্য। হোসেনকুলীর বংশকে নির্মূল করেও আমিনাবেগমের এ কলঙ্ক ঘুচলো না। লোকে ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, উলটে সে কথা মুখের ওপর উচ্চারণ করতেও ভয় পায় না।

অতীতের স্মৃতিগুলো মনে করে শিউরে ওঠার ভাণ করে রাজনর্তকী ;—মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল ঘরের মধ্যে। ঝরোখার এপাশে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকি। এর পর যে কি ঘটতে পারে, তা ভাবতেও ভয় হয়। ফয়জান জানে না নবাবজাদাকে। জীবন-মৃত্যু তার কাছে খেলার সামগ্রী। খুব ভালো করে চিনেছি তার স্বভাব। তবু একটা ভরসা ছিল। ফয়জানকে ভালোবাসে সিরাজ। হয়তো সেই ভালোবাসার জোরেই এ যাত্রা উতরে যাবে। কিন্তু তা হ'ল না কবি। একটু আগেই তুমি যা বললে তাই হ'ল।

একটু থেমে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নেয় সে ;—ধারণাই করতে পারি নি যে এতখানি নিষ্ঠুর মানুষ হতে পারে। বুঝতে পারলাম যখন মোহনলালকে ডেকে হুকুম করল রাজমিস্ত্রী আনতে।

—রাজমিস্ত্রী ?

—হ্যাঁ কবি, রাজমিস্ত্রী। ফৈজীকে জ্যান্তো গেঁথে ফেলবার জন্যে।

—কি ভয়ানক। ব্যাপারটা কি সত্যি?

—কেন, সত্যি না হলে কি গল্প হয় না? না, গল্প সত্যি হয় না?

ভারতচন্দ্র যেন অনেকটা আশ্বস্ত হন;—এমন গুছিয়ে বলতে পারো তুমি। মনে হয় সত্যি ঘটনা শুনছি।

—শোনো তারপর। রাজমিস্ত্রী কিন্তু তখন-তখনই আনা হ'ল না। মোহনলালের অনুরোধে সে রাতের মতো রেহাই পেল ফয়জান। আটকে রাখা হ'ল ঠাণ্ডাঘরে। পরদিন সকালে ব্যবস্থা করা হবে।

প্রিয়ম্বদা আবার যেন ডুবে যায় অতীতের মধ্যে;—হীরাঝিলের তলায় ঠাণ্ডাঘর। শুনেছি, ওখানে যে একবার ঢোকে, বেরুবার ভাগ্য তার বড় একটা হয় না। সে ঘরের দরজা অবধি গিয়েছিলাম একদিন। সিরাজ সঙ্গে ছিল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় নি। সেই ঠাণ্ডাঘরে আটক হ'ল লাখটাকা দামের সুন্দরী ফয়জান বাঈ।

অতদূর থেকেও তার কাতর কান্না ভেসে আসছিল ওপরে আমার কামরায়। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সে কান্না। পাথরের মতো জানালার ধারে বসে শুনি। রাত বাড়তে থাকে। জানি, সিরাজ যা বলছে তা হবেই। আজকের রাতই ফৈজীর জীবনের শেষ রাত। ওই তারা ঝিলমিল আকাশ আর দেখতে পাবে না বেচারি।

আমার খুশী হওয়া উচিত ছিল। প্রবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাবে সামনে থেকে। ফয়জান আসবার পর হতে লড়াই করতে করতে হয়রান হয়ে গেছি। দুজন প্রতিপক্ষ হয়েছে। চেহেলসতুনে লুৎফা এবং বাঈজামহলে ফয়জান। এই ক'দিন ধরে দারুণ দুশ্চিন্তার ভেতর কেটেছে। কাল সকালে একজন অন্তত সরবে।

কিন্তু কেন যেন খুশী হতে পারি না। কান্নার আওয়াজটা অস্থির করে তোলে। আর সহ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত মনস্থির

করে উঠে পড়ি। জানতাম যা করতে যাচ্ছি, তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার জীবনেও বীভৎস মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। বিশ্বাস-ঘাতককে সিরাজ কখনই ক্ষমা করবে না। সে যত আপনার জনই হোক। বিশ্বাস করে হীরাঝিলের অন্ধি-সন্ধি জানিয়েছে আমায়।

তবু অসহ্য মনে হয় ওই ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ। পাগলের মতো লাগে। গুপ্তপথ ধরে নিঃশব্দে সোজা ঠাণ্ডা ঘরের সামনে যেয়ে দরজাটা খুলে দিই।

ভুত দেখার মতো চমকে উঠে দাঁড়ায় ফয়জান। কান্না ভুলে যায়;—কে?

মশাল তুলে ভালো করে কাছ থেকে দেখি। লাখটাকার এই ফৈজী। শুনেছি ওজন নাকি মাত্র বাইশ সের। হাতে করে পরখ করতে মন চায়।

—কে তুমি? ফয়জান প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

অমনি হাত দিয়ে মুখখানা চেপে ধরি;—চুপ। প্রহরীরা সিঁড়ির ওপরে থাকলেও, এত জোরে চেঁচালে শুনতে পাবে। ছুটে আসবে।

কথাটা শুনে ফৈজান খানিকটা আশ্বস্ত হয়। অতর্কিত ভয়টা ক্রমশ কেটে যায়। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে;—জানি না তুমি কে। তবু পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও।

ইচ্ছা হচ্ছিল নিজের পরিচয় জানিয়ে দিই। কিন্তু সামলে নি। এ সমস্ত কথা আলোচনা করবার সময় কিংবা স্থান এটা নয়। নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করি;—এখান থেকে বার করে দিলে পালাতে পারবে?

—আমি যে কিছুই চিনি না।

হাসি পেয়ে গিয়েছিল আমার। এই সাহস এবং শক্তি নিয়ে সিরাজের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিল। শুধুমাত্র রূপের ওপর ভরসা করে। কিন্তু জানে না, এ লড়াইয়ে রূপের চেয়ে বেশি দরকার সাহস এবং শক্তির।

মুষড়ে পড়েছিল ফৈজী। হঠাৎ যেন একটা আশার আলো দেখতে পায়। সাগ্রহে হাতখানা আবার চেপে ধরে ;—হ্যাঁ, পারবো পালাতে।

—কি ভাবে ?

—হবীবের মঞ্জিল চিনি। ওখানেই এসে প্রথমে উঠেছিলাম। কোনরকমে তার কাছে চলে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। সোজা দেহলী পালাবো।

—কিন্তু হবীব কি তোমায় সিরাজের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে ?

—পারবে। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের ফৌজদার হ'ল হবীবুল্লা সাহেব।

—বেশ, তবে এসো।

গুপ্তপথ ধরে খুব সাবধানে আবার ফিরলাম ফৈজীকে সঙ্গে নিয়ে। সোজা নিজের কামরায়। ভেতরে পা দিয়েই কিন্তু জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেল আমার। নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলা।

অনেকক্ষণ ধরে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সিরাজ। লক্ষ্যই করে না ফয়জানকে। সে চোখে কি ছিল জানি না, কিন্তু নজর ফেরাতে পারি না। শুধু কানে আসে একটা কথা ; তুমিও ? কিন্তু তোমায় যে বড় বিশ্বাস করেছিলাম।

ভয় নয়, দুঃখ হয়েছিল আমার। সিরাজের ওই কথাগুলো মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। আকুল একটা কান্নার আবেগ অনুভব করি সারা শরীরে। বাধা দিই ;—না সিরাজ, না। ভুল বুঝো না।

—তবে ?

—তোমার অমঙ্গল হবে, তা আমি প্রাণ থাকতে হতে দেবো না।

—মানে ?

—যা করতে যাচ্ছো, তা ঘোরতর অন্যায় ; পাপ। খোদার

অভিশাপ পড়বে তোমার ওপর। জেনেশুনে চুপ করে থাকতে পারবো না।

নবাবজাদা হাসে ;— অর্থাৎ আমাকে বাঁচাবার অছিলায় খুন করতে চাও ?

—না, না, না।

এতক্ষণ রাগটাকে সামলে ছিল সিরাজ। এবার চিৎকার করে ওঠে ;—প্রহরী !

যমদূতের মতো চারজন কাফ্রি ছুটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

—এরা দুজনে এই ঘরে কয়েদ রইল। যদি পালায়, তোমাদের গর্দান যাবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে সাপের মতো হাসে :—ফয়জান বাঈয়ের শাস্তি তোমায় দেখাবো। তাই দেখে নিজেরটাও আন্দাজ করে নিতে পারবে। আমি সত্যিই দুঃখিত, তোমায়ও শাস্তি দিতে হ'ল।

অনেকক্ষণ ধরে একটানা কথা বলে হাঁফিয়ে পড়ে প্রিয়ম্বদা। একটু দম নিয়ে আবার বলে :—এত চেষ্টা করেও ফয়জানকে বাঁচাতে পারলাম না কবি। ভোর হতে না হতেই মিস্ত্রীর দল হাজির হয়েছিল ইট, চুন, সুরকি নিয়ে। ছোট্ট একটা কুঠরীর ভেতর বেচারিকে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজাটাকে নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছিল সিরাজ। আমাকে পাশে নিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে উপভোগ করেছিল শাস্তিটা। পলকের মধ্যে দেওয়াল উঠে গিয়েছিল দরজাটাকে বন্ধ করে।

উত্তেজিতভাবে রায়গুণাকর কি একটা বলতে যান। কিন্তু প্রিয়ম্বদা বাধা দেয় ;—জীবনের জন্যে মানুষ কি করে সেইদিন দেখেছিলাম কবি। আজো বুক কেঁপে ওঠে ভাবলে। কাতর প্রার্থনা ক্রমশ বদলে গেল ভয়াবহ চিৎকারে। তারপর অকথ্য গালাগালি। শেষের দিকে বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল ফয়জান। বাকি অংশটুকু গাঁথা হতেই সে চিৎকারও বন্ধ হয়ে

গেল। কেবল অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসছিল গোঙানি আর দেওয়ালে মাথা ঠোকার আওয়াজ।

রাজনর্তকী থামতেই ভারতচন্দ্র হাতখানা চেপে ধরেন ;—এটা গল্প, না সত্যি প্রিয়ম্বদা ?

গভীর ঘুম থেকে যেন জেগে ওঠে বাঈজী। মুচকি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে ;- -কি মনে হয় ?

—বুঝতে পারছি না।

—গল্প কবি। নিছক সাজানো।

—কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে যে।

—ভালো করে বলতে পারলে কল্পনাও বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কবি। এভাবে বলবার কৌশলটুকু আয়ত্ব করতে পারলে কাজে আসবে। বাজে খোসামোদ না করে, চেষ্টা করে দেখো।

আবার সেই বিদ্রূপ। ভারতচন্দ্র আহত হন ; —চেষ্টা না হয় করা যাবে। কিন্তু গল্পটা আমায় শোনাবার মানে ?

—মানে বুঝলে না ?

—না।

—বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির কথা বলেছিলে না ; তাই বললাম। আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। রাজা-বাদশার ভালোবাসার ওপর বিশ্বাস নেই। সেই কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। যে রাজার খোসামোদে কলম খুইয়ে দিলে, সেই রাজাই একদিন দাগা দেবে।

—তা হয়তো দেবে ; দুঃখিত স্বরে জবাব দেন রায়গুণাকর ;—দাগা সকলেই দিয়েছে প্রিয়ম্বদা। বলেছি তো, ওতে আর দুঃখ হয় না।

রাজনর্তকী লক্ষ্য করে পরিবর্তনটুকু। আন্তরিক সুরে বলে ;—আমার কথায় রাগ করছো ?

—না প্রিয়ম্বদা। তোমার যা ইচ্ছে হয় বলতে পারো ; বলোও।

—বলি, কিন্তু বুঝতে পারো না, কেন ?

—তোমার মনের কথা কি ভাবে বুঝবো ?

—সাধারণ দশজনের সঙ্গে তোমাকে এক আসনে ভাবতে পারি না কবি। তোমার আসন তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। তাই ওদের সঙ্গে নীচে নেমে আসতে দেখলে দুঃখ পাই। সেইজন্যই বলি। বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করলাম প্রিয়ম্বদা। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেন রায়গুণাকর।

—তা'হলে অ-প্রিয়ম্বদা বললে কেন?

—এমনিই বললাম রহস্য করে।

—সত্যিই?

—হ্যাঁ।

রাজনর্তকী নিশ্চিন্ত হয় যেন;—বাঁচালে। কিন্তু, একটা কথা বুঝি না। তুমি যে সাধারণ দশজনের চাইতে ওপরের মানুষ, এ কথা যখন বিশ্বাস করো, তখন সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করো না কেন?

—আমি যে মানুষ প্রিয়ম্বদা। তাই ভুল হয়। ভারতচন্দ্র মলিনভাবে হাসেন;—তবু কথা দিচ্ছি করবো। কিন্তু তার জন্য সময়ের দরকার। তোমার গল্পের কথাটা মনে ধরেছে। মূলাজোড়ে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তারপর চেষ্টা করে দেখবো।

মূলাজোড়ের প্রসঙ্গেই রাজনর্তকীর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে;—সে চেষ্টা তো এখানে থেকেও হতে পারে কবি।

—না, এখানে থেকে যা হবে, তা শুধু খোসামোদ। এখানকার আবহাওয়াই হ'ল দূষিত।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ। আমার অন্তত বিশ্বাস তাই।

—তবে যাও। বাধা দেবো না। আশা করে বসে থাকবো তোমার সেই মহৎ সৃষ্টির অপেক্ষায়।

মনে মনে বিস্মিত হ'ল ভারতচন্দ্র। বুঝতে পারেন না, তাঁর সম্বন্ধে এত আগ্রহ কেন রাজনর্তকীর। একবার ভাবেন জিজ্ঞাসা

করবেন। আবার চেপে যান। যে মধুর সম্ভাবনার ইঙ্গিতটা উঁকি দিচ্ছে, সেটা হয়তো ভেঙে যাবে। সেদিনের কথাগুলো আজো ভোলেন নি। স্পষ্ট করেই নিজেকে প্রকাশ করেছিল প্রিয়ম্বদা। কোন আড়াল রাখে নি। ভালোবাসতে সে পারে না কাউকে; বাসবে না।

তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই তাঁর। বাঈজী কাকে ভালোবাসলো, না বাসলো সে খবরে তাঁর কোন দরকারই নেই। তবু মানুষের মন। কেউ একজন তাকে ভালোবাসে, এটুকু জানতে পারলেও আনন্দ হয়। তাই জানতে চায়।

অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝি ধরে ফেলে রাজনর্তকী;—তোমায় আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি কবি তা বলে বোঝাতে পারবো না। তাই তোমার কোনরকম অপমান দেখলে আমার হৃদয় কেঁদে ওঠে।

শুধু শ্রদ্ধা। হাসি পায় কথাটা শুনে। সাধারণ দশজনের চেয়ে তাঁর আসন অনেক ওপরে। তবুও তো তিনি পাথরের দেবতা নন; রক্তমাংসের মানুষ। এ দেহে উষ্ণ একটা হৃদয় রয়েছে। এবং প্রেম পিপাসায় অধীর হয়ে আছে সে হৃদয়। শুকনো শ্রদ্ধায় সে পিপাসা মিটবে না।

—তোমায় একদিন একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে?

—কোন্ কথা! কত কথাই তো বল।

রাজনর্তকী একটু এগিয়ে আসে;—ভালোবাসা তোমায় দিতে পারবো না।

চমকে ওঠেন ভারতচন্দ্র। তাঁর অপ্রকাশিত চিন্তাগুলোকে যেন নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে বাঈজী। বিব্রতভাবে বলেন; —তা মনে আছে।

—সেদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম কেন জানো?

—ফিরিয়ে দিয়েছিলে? হাসিটাকে চাপতে পারেন না রায়-গুণাকর,—আমি তো তোমার কাছে কোন প্রার্থনা নিয়ে যাই নি, যে ফিরিয়ে দেবার কথা ওঠতে পারে।

—ঠিক বলছো ? চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে বাঈজী।

—বিনা কারণে মিথ্যে আমি বলি না প্রিয়ম্বদা। সেদিনও বলেছিলাম, আজো বলছি ; তোমার ব্যবহারটা এখনো রহস্যময় লাগে। যে ভাবে আঘাত দাও, তার কারণ হতে পারে দুটো। ভালোবাসা, অথবা ঘৃণা। সেইটাই জানতে চেয়েছিলাম।

প্রিয়ম্বদা গুম্ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে ;—হয়তো আমিই ভুল বুঝেছিলাম। যাই হোক ; একটা কথায় তুমি ভয়ানক অবাক্ হয়েছিলে। দেহ দিতে পারি অথচ প্রেম দিতে পারি না।

—তা হয়েছিলাম, স্বীকার করছি। আজো হই।

—সেই কথাই বলছি, কেন প্রেম দিতে পারি না। আমি জানি প্রেমের জন্যে তোমার কত আকুলতা ; কত হাহাকার। বলো ঠিক কিনা ?

—সত্যিই প্রিয়ম্বদা।

—প্রেম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। না পাওয়ার বেদনাই মানুষকে সৃষ্টির পাগলামীতে উন্মত্ত করে তোলে কবি। সেই বেদনাকে ভাষায় প্রকাশ করবার জন্যেই শিল্পী পাগলের মতো ছটফট করে বেড়ায়। কিন্তু সেই বেদনাই যদি না থাকে ?

স্তম্ভিত ভারতচন্দ্র যেন কথা বলবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। নিজেকে এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি কোনদিন। প্রতিটি কথা যে কতখানি সত্যি, তা বাঈজী চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে হয়তো চিরদিন অগোচরে থেকে যেতো। বারবিলাসিনী রাজনর্তকী আজ আবার অন্য এক নবতম রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। এ রূপের সামনে আপনা থেকেই মাথা নীচু হয়ে যায় শ্রদ্ধায়।

—আর, সেইখানেই আমার ভয় কবি। মূলাজোড়ে নিজের বাড়িতে যাবে। স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার পাতবে। ছেলেপুলে, আনন্দ-কলরবে মুখরিত হয়ে উঠবে তোমার সংসার। সব পাওয়ার

ফলে, না পাওয়ার বেদনাও ভুলে যাবে একদিন। সেদিন যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তবে কি রূপে দেখবো? গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে নিশ্চিন্তে, অলসভাবে সংসার সুখভোগ করছে একজন সাধারণ মানুষ। সৃষ্টির আগুন নিভে গেছে তার হৃদয়ে।

কঠিন ভবিষ্যতকে যেন নির্বিকার মুখে বলে যাচ্ছে প্রিয়ম্বদা। রায়গুণাকর আর সহ্য করতে পারেন না। উত্তেজিতভাবে বাধা দেন—থামো। আমায় ভয় দেখাচ্ছো?

—না কবি, ভয় দেখাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি। হৃদয় শান্ত হতেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। নিভে যাবে অন্তরের সেই আগুন, যার জ্বালায় সারাক্ষণ ছটফট করে বেড়াতে। বেদনার দহনে যে আবেগ সৃষ্টির রূপ ধরে ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়তো, তা জড় পাথরের মতো হয়ে পড়বে হৃদয়ের মধ্যেই। তাই মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি, হৃদয়ের আগুন কোনদিন যেন না নেভে তোমার। কোনদিন কোন নারীর প্রেম না পাও।

এতক্ষণে সত্যিই একটা কঠিন ভয়ের স্রোত শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। হতভম্ব রায়গুণাকর আবার বসে পড়েন; তুমি—কিন্তু—

বাঈজী হেসে ফেলে;—সত্যিই ভয় পেলে? তবে থাক। যা হবার তা হবেই। মিছে ভেবে কি হবে। সব চাইতে বল, নতুন কিছু লিখছো, না বিষয়-সম্পত্তি পেতে না পেতেই আগুন নিভে গেল?

—সেই কথাই বলছি প্রিয়ম্বদা। ভারতচন্দ্রের হৃদয়ের আগুন কোনদিন নিভবে না, নেভবার নয়। নতুন কাব্য আরম্ভ করেছি। সেইটাই সব থেকে বড় প্রমাণ।

—সত্যি? কি কাব্য দেখি।

—অন্নদামঙ্গল।

—অন্নদামঙ্গল?

পুঁথিখানা আনবার জন্যে উঠেছিলেন রায়গুণাকর। কিন্তু

বাঈজীর প্রশ্নটায় থমকে যান ;—তুমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ কবি। সেই মঙ্গলকাব্য আবার! কতজন তো সেই একঘেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। রায়গুণাকরও অনুসরণ করলেন তাঁদের ? না কবি, কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। পুঁথিখানা দেখবারও না।

—আমি তাঁদের চাইতে অনেক ভালো করে লিখেছি।

—ভালো হলেও মূর্তি সেই একই থাকবে। তুমি পণ্ডিত। তাই বড়জোর খানিকটা পাণ্ডিত্য ছড়িয়ে দেবে তাতে। নানারকম অলংকার দিয়ে সাজাবে। কিন্তু যে নারী কুৎসিত, তাতে যতই অলংকার দিয়ে সাজাও না কেন, সৌন্দর্য সে পাবে কোথা থেকে।

হাসতে হাসতে উঠে পড়ে রাজনর্তকী ; এবার যাই। সন্ধ্যা হয়ে এলো। মূলাজোড় যাবার আগে দেখা করবে তো ? না চুপচাপ সরে পড়বে ?

রায়গুণাকর কিন্তু যেতে দেন না। পথ আগলে দাঁড়ান ;—থামো ; হাসলে কেন বলে যাও।

—শুনবেই ?

—হ্যাঁ।

—তবে শোন কবি রায়গুণাকর। দেব-দেবীর কথা অনেক হয়েছে। ওতে কোন প্রাণ নেই ; সাড়া নেই। একঘেয়ে সেই পাথরের মূর্তিতে সৌন্দর্যও নেই কোন। যদি পারো, মানুষের কথা লেখো। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার পাঁচালি। বুঝলে ?

পাশ কাটিয়ে স্বচ্ছন্দগতি মরালের মতো আঁধারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় রাজনর্তকী। স্থাণু-প্রায় রায়গুণাকর দাঁড়িয়ে দেখেন ; তারপর হতাশভাবে চত্বরটার ওপর বসে পড়েন।

কৃষ্ণনগর ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সেই কষ্টের আড়াল থেকেও উঁকি দিচ্ছিল একটা আনন্দ। মূলাজোড়ে যেয়েই শ্রীমতীকে

আনিয়ে নেবেন। ফিরিয়ে আনবেন অতীতের হারিয়ে যাওয়া মধুর দিনগুলোকে।

সে আশার ওপর এক পোঁচ কালি যেন লেপে দিয়ে গেল প্রিয়ম্বদা।

বার্ধক্যের বারাণসী মূলাজোড়।

উপমাটা আগে মনে হয় নি। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, ততদিন মূলাজোড়কে মনে হয়েছে যৌবনের বসন্ত নিকুঞ্জ বলে। আজ কিন্তু মনে হয় বার্ধক্যের বারাণসী। রায়গুণাকর বুঝতে পারেন, শরীর তাঁর ভেঙে গেছে। যে উদ্দামতা নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন একদিন, সে প্রাণ-চাঞ্চল্য ঝিমিয়ে পড়েছে। জীর্ণ শরীর সেই চাঞ্চল্যের স্মৃতিতেও শুধু কাতর আর্তনাদ করে ওঠে আজ। নড়তে পারে না।

মূলাজোড় সম্বন্ধে একটা ভয়াবহ চিত্র এঁকেছিল প্রিয়ম্বদা। তবু ভয় পান নি ভারতচন্দ্র। শুভক্ষণ দেখে একদিন নৌকায় উঠেছিলেন। সজলনয়নে বিদায় দিয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

যে আশা নিয়ে এসেছিলেন, তা সার্থক হয়েছিল। সত্যিই ফিরে পেয়েছিলেন অতীতের হারিয়ে যাওয়া মধুর দিনগুলোকে। সব কামনাই পূর্ণ হয়েছিলো। রাধাকে নিয়ে নতুন করে ভালো-বাসার নীড় বেঁধেছিলেন। সে প্রেমে স্বার্থের কোন স্থান ছিল না।

শ্রীমতীকে দেখে প্রায়ই একটা সন্দেহ জাগতো প্রথম দিকে। সারদাগ্রামে তার যে রূপ দেখে পালিয়ে এসেছিলেন, সেটা বুঝি ছিল একটা ছদ্মবেশ। নিবিড় মিলনের মাধ্যমে সে ছদ্মবেশ খসে পড়েছে। দেখা দিয়েছে প্রথম যৌবনের সেই প্রিয়ভাষিণী, চারু-হাসিনী প্রেয়সী।

বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি হ'ল মানুষ। ভেবে অবাক্ হন রায়গুণাকর। যত দেখছেন, ততই যেন চোখ খুলে যায়। পৃথিবীর

প্রতি আকর্ষণ আরো বাড়তে থাকে। যে পুত্রদের জন্মে রাজা নরেন্দ্র রায় এত কাণ্ড করেছিলেন; প্রশ্রয় দিয়েছিলেন জঘন্যতম অন্যায়ের, সেই পুত্রেরাই অবশেষে তাঁকে কঠিন আঘাত দিয়েছে। দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পারে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন ছোট ছেলের কাছে। যাকে নিজের পুত্র বলে অস্বীকার করেছিলেন একদিন।

বৃদ্ধ নরেন্দ্র রায়কে দেখলে দুঃখ হয় এখন। অপরাধের গ্লানিতে সব সময় বুঝি মর্মে মরে থাকেন। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। তবু মূলাজোড়ে এসে মনে হয় শান্তি পেয়েছেন খানিকটা।

আশা এবং আনন্দে ভরপুর সংসার। বুভুক্ষুর মত গোগ্রাসে উপভোগ করেন রায়গুণাকর। অশান্ত হৃদয় শ্রীমতীকে ঘিরে মাতালের মতো বুঁদ হয়ে থাকে। ঝিমিয়ে পড়ে। তারপর প্রচণ্ড ক্লান্তির শেষে যেন বিশ্রামে এলিয়ে পড়ে। ঢাকা পড়ে যায় পরম নিশ্চিন্ততার একটা কুয়াশার আড়ালে। তরঙ্গহীন, উদ্বেগহীন, মন্থর জীবন।

সে আনন্দকে পরিপূর্ণ করতেই বুঝি নতুন অতিথির আগমন হয় সংসারে। প্রথম সন্তান।

শ্রীমতীর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকেন ভারতচন্দ্র। নারীর এই নতুন রূপ দেখে অবাক্ হয়ে যান। শান্ত মাতৃমূর্তি। জীবনের চরম সাফল্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা ফোটে না কারো মুখে। সব চপলতা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

সবই হয়; হয় না কেবল দেবী ভারতীর আরাধনা। অসমাপ্ত অন্নদামঙ্গলের পুঁথি অবহেলা-ভরে পড়ে থাকে তাকের উপর। ধুলো জমে। আর একটু লিখলেই শেষ হয়। কিন্তু সেটুকু লেখার মতো সময়ও জোটে না। উৎসাহও জাগে না।

পুঁথিখানার ওপর কখনো-সখনো নজর পড়লেই স্ফুলিঙ্গের মতো মনে পড়তো প্রিয়ম্বদার সেই ভয়াবহ আশঙ্কার কথাটা। পরক্ষণেই

আগুনটুকু নিভে যেত। আত্মতৃপ্তির ভিজে বারুদে কোনরকম বিস্ফোরণ ঘটানোর পূর্বেই মৃত্যু ঘটতো তার। স্নেহভরে ধুলে ঝেড়ে আবার পুঁথিখানাকে সযত্নে তুলে রাখতেন তাকের ওপব।

মনটা যে খারাপ হয়ে পড়তো না, তা নয়। রাজনর্তকী ঠিক কথাই বলেছিল। গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে রসিয়ে জীবনকে উপভোগ করা। তিনিও একই কথা বলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। বিষয়-সম্পত্তির মোহে সৃজনী-প্রতিভা জাগে না।

জাগে না; কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপ করবারও অর্থ হয় না কোন। জীবনে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, পেয়েছেন। কামনা ছিল স্বার্থহীন প্রেমের। তাও দিয়েছে শ্রীরাধা। অলস দুপুরে চিন্তাগুলো প্রায়ই আক্রমণ করতো। শিশুপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়তেন ভারত।

ঘুম আসে না। সেদিনও অলসভাবে বসেছিলেন জানালার ধারে। বাইরে আগুন-ঝরানো দুপুর। আমের গাছগুলো ছেয়ে গেছে মুকুলে। গন্ধে মাতোয়ারা মৌমাছিরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। দূর আকাশের গায়ে চিলদের কালো কালো বিন্দু। ঘরের মধ্যে ছেলেকে স্তন দিচ্ছে রাধা। সেদিকে তাকাতেই ফিক করে হেসে ফেলে শ্রীমতী;—কি দেখছো?

স্মৃতির ওপার থেকে কি একটা যেন এগিয়ে আসছে। ঠিক বোঝা যায় না। আনমনা ভাবেই ভারতচন্দ্র জবাব দেন;—দেখছি, মানে—

—আবার কাব্য-রোগে ধরল নাকি?

রোগে অবশ্য ধরেছে। বহুমূত্র। সে কথা রাধাও জানে। চিকিৎসা করিয়েও ফল হচ্ছে না কিছু। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তোলেন না রায়গুণাকর। উদাস দিগন্তের দিক চোখ ফিবিয়ে জিজ্ঞাসা করেন;—তুমি খুশী হয়েছো রাধা?

—হুঁ। আবেশমুগ্ধ জবাব আসে।

—কি জন্যে?

—তোমাকে পেয়েছি বলে।

—শুধু কি তাই ?

—এখন অবশ্য শুধু তাই নয়। কিন্তু আসল কারণটা তাই।

—এখন আর কি ?

—নিজের সংসার পেলে মেয়েরা খুশী হয় না ? ছেলেকে শুইয়ে রেখে রাধা উঠে আসে। তারপর দু'হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে ;- -মেয়েরা যে নিজের জিনিসে কোন ভাগ-বাঁটোয়ারা সইতে পারে না গো। তুমি কবি ; এত বোঝো, এটা বোঝো না।

—বুঝি রাধা। তাই শুধালাম। পুরুষও সইতে পারে না।

--তবে আজ এমন উদাস কেন ?

কি জানি। মনে হচ্ছে তোমার ভালোবাসাটা ভাগ হয়ে গেছে।

· -ওমা ; এ কি ধরনের কথা হ'ল ?

প্রখর অনুভূতি-প্রবণ মনে কিছুদিন ধরে একটা কম্পন বুঝতে পারছিলেন। মা হবার পর থেকে যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে রাধার মধ্যে। দুর্লক্ষ্য ব্যবধান। হঠাৎ ধরতে পারা যায় না। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সে পরিবর্তনের গতি খুব ধীর, কিন্তু অনমণীয়, কঠোর। ধীরে ধীরে শ্রীমতী আবার দূরে সরে যাচ্ছে তাঁর জীবন থেকে। নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে সন্তান এবং সংসারের গণ্ডীর ভেতরে। ভারতচন্দ্র সেখানে অবাঞ্ছিত না হলেও, খুব একটা প্রয়োজনীয় নন। সেই ধারণাকে যাচাই করবার জন্যেই বলেন ; -মনে হয়, ছেলেকে তুমি আমার চাইতে বেশি ভালোবাসো।

রাধা সলজ্জে হাসে : —প্রত্যেক মা-ই বাসে।

--কিন্তু স্বামী ?

--তাকেও বাসে।

—অর্থাৎ একটা হৃদয় দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় ?

—উপায় কি ? হৃদয় যে একটাই।

—যাদের স্বামী মারা যায়?

রাধা শিউরে ওঠে; এসব কি অলুক্ষণে কথা বলতে শুরু করলে? আজ হয়েছে কি?

—কিছুই হয় নি। এমনি জিজ্ঞাসা করছি। বলোই না।

—কি আর করবে। স বেচারিরা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে।

—যাদের ছেলে না থাকে?

—তারা আর কি করবে? কাঁদবে কেবল।

—আচ্ছা রাধা; ছেলেপুলে যদি না হয়?

পারি না বাপু তোমার আজে-বাজে কথার উত্তর দিতে।

—জীবনের সবটাই তো আর কাজের কথার হিসাব-নিকাশ নয়। বাজে কথাও যে রয়েছে। সেগুলোও বলতে হয়।

কপট ক্রোধে উঠে দাঁড়ায় শ্রীমতী,—মানুষের মন নিয়ে কারবার তোমার। এও জানো না, মেয়েদের পরম সার্থকতা হ'ল মা হওয়াতে।

—শুনেছি রাধা, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। আজ বিশ্বাস করলাম

—তুমি ওই সমস্ত ভাবো, আমি চললাম। ঘরের কাজ পড়ে রয়েছে। পরীক্ষিত ঘুমিয়ে রইলো। একটু নজর রে'।।

শ্রীমতী চলে গেল। ভারতচন্দ্র আবার ডুবে যান চিন্তার মধ্যে। মূলাজোড়ে আসবার আগে পর্যন্ত জীবন ছিল অন্য ধরনের। অতৃপ্ত তৃষ্ণা অবরুদ্ধ আবেগে শুধু ফুলতে থাকতো হৃদয়ের মধ্যে। বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির মতো বহুদিন পর শ্রীমতীকে একান্তভাবে পেয়ে অকস্মাৎ খুলে গিয়েছিল সেই আগ্নেয়গিরির মুখ। ভারতচন্দ্র রুদ্ধশ্বাসে ভেসে গিয়েছিলেন। এসে পড়েছিলেন গতিহীনতার মধ্যে। কারণ, সে স্রোত তীব্র হলেও, লক্ষ্য ছিল তার সীমাবদ্ধ। তৃপ্তির বদ্ধ জলাশয় অবধি। কিন্তু রাধা আবার সরে যেতেই হুঁস হয়। আবর্তহীন বদ্ধ জলাশয়ে হাঁফ ধরে যায়। দিনের পর দিন একই সুখ সম্ভোগ এবং সাংসারিক হিসাব।

বুঁদ হয়ে ঝিমিয়ে থাকা মনটা যেন নেশা ভেঙে জেগে ওঠে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেউ নেই। আবার সেই নিঃসঙ্গ, রিক্ত, স্থবিরতার দাহ। বর্ণ-গন্ধহীন ধূসর মরুভূমিতে একটানা পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া। জীবন নেই, আবেগ নেই, রহস্য নেই। হৃদয়ের বারুদ তৃপ্তির রসে ভিজে গিয়েছিল। ক্রমশ শুকোতে থাকে অতৃপ্তির গরম বাতাসে। শ্রীমতীর দূরে সরে যাওয়াটা আরো ইন্ধন জোগায়।

আর ঠিক সেইমুহূর্তে এক অভাবনীয় দুর্যোগের স্ফুলিঙ্গ এসে আগুন ধরিয়ে দেয় সেই শুকনো বারুদের স্তূপে। বিস্ফোরণ ঘটে যায় হঠাৎ।

প্রতিদিনকার মতো সেদিনও সকালে বাইরের রোয়াকে পরীক্ষিতকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন রায়গুণাকর। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এটা। বৃদ্ধ বয়েসের সন্তান হলে বোধ হয় এই রকমই হয়ে থাকে। চোখের মণি। বৃথাই দোষ ধরেছিলেন বাধার। তাঁর নিজের হৃদয়ও যে দু'ভাগ হয়ে গেছে; স্ত্রী এবং পুত্রের মধ্যে।

প্রতিদিনকার আরো একটা কাজ আছে তাঁর। বাগানে বেড়ানো। পরীক্ষিতকে নিয়ে সকালে বেশ খানিকক্ষণ কাটান বাগানের মধ্যে। অনেক শখ করে তৈরি করিয়েছেন। কৃষ্ণনগরে মাধবী-মালঞ্চে থাকার সময়েই ভেবে রেখেছিলেন কখনো সুযোগ হলে মনের মতন করে বাগান করবেন। সে শখও মিটেছে।

রোয়াক থেকে নামতেই কিন্তু বাধা পড়ে। ভৃত্য দামোদর ব্যস্ত-সমস্তভাবে ছুটে আসে ;—সর্বনাশ হয়ে গেল কত্তা।

ভারতচন্দ্র আঁতকে ওঠেন ;—সর্বনাশ ?

—হ্যাঁ ; একপাল গরু ঢুকে বাগানটাকে তছনছ করে ফেলেছে।

পরীক্ষিতকে রোয়াকের ওপর বসিয়ে রেখে হন্তদন্ত হয়ে দামোদরের সঙ্গে ছোটেন ভারতচন্দ্র। বালক যে কাঁদছে, সেদিকেও খেয়াল থাকে না। জিজ্ঞাসা করেন ;—কাদের গরু খোঁজ নিয়েছো?

—কখন খোঁজ নেবো? সকালে উঠে কাণ্ড দেখেই ছুটে এসেছি। তবে শুনলাম রামদেব নাগের।

—কোন্ রামদেব?

—অতশত জানি না। নতুন এসেছে এখানে।

অত সাধের বাগানের অবস্থা দেখে সত্যিই কান্না পায়। এক-পাল মত্ত হাতী যেন দলে, চষে এক করে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে নির্বাক্ হয়ে থাকেন রায়গুণাকর। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়ান ;—রামদেব নাগকে তুমি চেনো দামোদর?

—চিনি না কত্তা. তবে খুঁজে বার করতে পারবো।

—তবে তাই করো। ডেকে নিয়ে এসো তাকে। আমি কথা বলতে চাই।

রামদেব নাগকে কিন্তু আর ডাকতে হয় না। বাগান থেকে বেরুতেই দেখা হয়ে যায়। নিজেই এগিয়ে এসে নমস্কার করে ; —একটা নিবেদন ছিল।

—আপনি কে?

—অধমের নাম শ্রীরামদেব নাগ। বর্ধমান সরকারের গোমস্তা।

—আপনিই নাগ মশাই? আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—অধম নিজেই হাজির আছে। রামদেব মুচকি হাসে ;— আপনার চাকর আমার কতগুলো গরুকে আটক করে রেখেছে। সেগুলোকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হোক। আর এ অপমানের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা হোক।

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হয় না। স্পর্ধা দেখে হতবাক্ হয়ে পড়েন ভারতচন্দ্র ;—ক্ষমা প্রার্থনা যে আপনারই করা উচিত। আপনার গরু আমার বাগানের কি অবস্থা করেছে দেখে যান নিজের চোখে।

—গরু হ'ল জানোয়ার। তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেছে।

—তাই বলে অন্যের এলাকায় ঢুকে ক্ষতি করবে?

রামদেব আবার বিশ্রীভাবে হাসে ;—ভুল হ'ল মুখয্যা মশাই। এলাকাটা অন্যের নয়। বর্ধমান সরকারের নিজের। আপনিই বরং অন্যের এলাকা থেকে গরু আটক করেছেন।

রায়গুণাকর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যান কথাটা শুনে। বলেন ;—ভুল আমার নয় ; হয়েছে আপনার। মূলাজোড় গ্রামখানা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে আমি ইজারা নিয়েছি।

—কতদিন আগে?

—অনেকদিন।

—তাহলে কাছারি-বাড়িতে এসে তার পরের দলিলটা দেখে যাবেন দয়া করে। মূলাজোড় গ্রামখানা বর্ধমান সরকারের তরফ থেকে আমি পত্তনি নিয়েছি। এই তো পাশেই গড়। যেতে কোন কষ্ট হবে না।

—তা'হলে আমার দলিল?

—সেটা নাকচ হয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে ;—আরো সেইজন্যেই এসেছিলাম। ব্রাহ্মণ মানুষ আপনি। কোন ক্ষতি হোক, তা মহারাণী চান না। তাই অনুরোধ করেছেন, মূলাজোড় ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। এখানে থাকলেই একটা না একটা খটাখটি বাধবে। কি দরকার ওসব ঝামেলা দিয়ে।

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না রামদেব নাগ। বিশ্রী একটা হাসির জ্বালা ছিটিয়ে দিয়ে চলে যায়।

অপমানে মুখ কালো করে ফিরে আসেন রায়গুণাকর। আবারও সেই বর্ধমান। দুষ্ট শনিগ্রহের মতো যেন বর্ধমানের প্রতিশোধে তাঁর পিছু নিয়েছে। নরেন্দ্র রায়কে পাণ্ডুয়ায় একবার সর্বস্বান্ত করেও তৃপ্তি পায় নি। ধেয়ে এসেছে মূলাজোড়ে। খবর যখন পেয়েছে একবার তখন উচ্ছেদ না করে ক্ষান্ত হবে না রামদেব।

কিন্তু পিতার মতো মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করবার মানুষ তিনি নন। প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠেন ভারতচন্দ্র। অগ্নিগর্ভ অন্তরে লেখনী তুলে নেন আবার। অনেকদিন পর। রাজা নরেন্দ্র রায়ের অস্ত্রধারী সৈন্যেরা যা করতে পারে নি, তাঁর লেখনী তাই করবে। প্রতিজ্ঞায় কঠোর হ'য়ে ওঠে মুখের প্রতিটি রেখা।

শুধু বর্ধমানই নয়; কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবহারেও মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ইজারা নাকচ করা হ'ল, অথচ তিনিই জানেন না। তা'ছাড়া মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকেই যদি পত্তনি দেবার ইচ্ছা ছিল, তবে তাঁকে দিলেন কেন মূলাজোড়।

দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে শেষ করে ফেলেন লেখাটা। 'নাগাষ্টকম্' কাব্যে সুললিত ছন্দে গাঁথা হয়ে যায় এ অত্যাচারের জ্বলন্ত বিবরণ। দামোদরের মারফত কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে যেন একটু স্বস্তি পান।

রাধা কিন্তু খেয়াল করে না অতশত। বৃদ্ধ শ্বশুর, শিশুপুত্র এবং সংসার নিয়ে মেতে থাকে। আর কোনদিকে চোখ ফেরাবার অবসরও পায় না। তবু তারই মধ্যে কখনো-সখনো রহস্য করে;—আজকাল অমন গোমড়া মুখ করে থাকো কেন বলতো?

ভালো লাগে না রসিকতা। হৃদয়ে অহরহ জ্বলে অপমানের আগুন। দামোদর ফিরে না আসা অবধি শান্তি নেই। কৃষ্ণচন্দ্র কি জবাব দেন তাই দেখে ভবিষ্যত কর্তব্য স্থির করতে হবে। দায়সারা-গোছের জবাব দেন;- মন ভালো নেই রাধা।

—মনের আবার কি হ'ল? এত পেয়েও আশ মেটে না?

—যা পেয়েছি, সব হারাতে বসেছি আবার।

প্রশ্নের আসল অর্থটাকে যেমন এড়িয়ে যান ভারতচন্দ্র, জবাবের প্রকৃত তাৎপর্যটাকেও তেমনি ধরতে পারে না শ্রীমতী। বলে;—রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ যে তা বুঝি না। মাথা নীচু করে থাকলেই হয়। হাজার হোক, তাঁদের চাইতে আমরা অনেক ছোট।

এই মনোবৃত্তির জন্যেই রাধাকে মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। অনেক চেষ্টা করেও কোন পরিবর্তন আনতে পারেন নি ভারতচন্দ্র। চেষ্টাও করেন না আর। নিঃশব্দে উঠে যান সেখান থেকে।

অশান্ত হৃদয় ছটফট করতে থাকে। দীর্ঘ নিদ্রার পর যেন চোখ খুলে গেছে। ভুল করেছিলেন এতদিন। দেবী ভারতীর সেবক হয়ে ডুবে গিয়েছিলেন ভোগসুখে। হাতে-নাতে ফল পেয়েছেন।

মোহনিদ্রা একবার যখন ভেঙেছে, তখন আর নয়। দুর্বার তাগিদে আবার তুলে নেন লেখনী। দুরন্ত জলস্রোতের মতো ছন্দোবদ্ধ পংক্তির পর পংক্তি বেরিয়ে আসতে থাকে। তারপর একদিন সম্পূর্ণ হয় অন্নদামঙ্গল কাব্য।

কাব্য শেষ হয়; কিন্তু শেষ হয় না অন্তরের আবেগ। পথের ডাকে আবার হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির ইশারা অনুভব করেন নতুন করে। অনেকদিন আগে এ ইশারা বুঝতেন। মধ্যে ভুলে গিয়েছিলেন। সে চাবিকাঠি আবার হাতে আসতেই, অতৃপ্তির ক্ষীণ ধারাটা সজোরে আছড়ে পড়ে মনের তটভূমিতে। বালি দিয়ে গড়েছিলেন তৃপ্তির প্রাসাদ। সে প্রাসাদ ভেঙে-গুঁড়িয়ে যায়।

অনেকদিন হয়ে গেল দামোদর গেছে কৃষ্ণনগরে। আজো দেখা নেই। এদিকে দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই চলেছে রামদেবের। নানা অজুহাত। ভারতচন্দ্র বোঝেন। এ সমস্ত হ'ল তাঁকে উৎখাত করবার জন্যে।

বর্ধমানের ব্যাপারটারও খোঁজ নিয়েছিলেন গোপনে। বর্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই মহারাণী পালিয়ে এসেছেন গঙ্গার এপারে। কিন্তু এত জায়গা পড়ে থাকতে মূলাজোড়ে কেন সেইটাই দুর্বোধ্য লাগে।

দুর্বোধ্য লাগলেও, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কোন-

ক্রমে হয়তো তাঁর খোঁজ পেয়েছেন মহারাণী। নরেন্দ্র রায় এখানে না থাকলে বোধ হয় এতটা হ'ত না। কিন্তু খোঁজ পাবার পর আর স্থির থাকতে পারেন নি। ছলে বলে যে কোনরকমে নরেন্দ্র রায়ের সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। উপায়টাও বার করেছেন ভালো। সরাসরি নিজে নয়; মধ্যে রেখেছেন রামদেব নাগকে। পত্তনি নিয়েছেন তারই নামে।

এর কারণটা বোঝাও খুব কঠিন নয়। যে কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে উঠেছেন মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, তাঁরই সভাকবি হলেন ভারতচন্দ্র। তাই এ কৌশলটুকুর দরকার ছিল। শিয়রে যখন শমনের মতন বর্গী দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অসন্তুষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

নানা দুর্ভাবনায় অস্থির লাগে। দামোদর আজো ফিরলো না। ভগবান জানেন কি হচ্ছে কৃষ্ণনগরে। মহারাজা যদি কোন বিহিত না করেন? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে। বুক কেঁপে ওঠে।

সেদিন ভোরবেলা পরীক্ষিতকে কোলে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ান। পাল উড়িয়ে চলেছে নৌকার সারি। ঢেউয়ের মাথায় দুলছে জেলে নৌকাগুলো। মনটা উদাস হয়ে যায়। বসন্তের উজ্জ্বল আকাশে ঝলমল করছে সোনালা রোদ। বার্ধক্যের বারাণসী তাঁর মূলাজোড়। সেই বারাণসাই বুঝি ছেড়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

একটা বিরাট মহাজনী নৌকা কখন ঘাটে এসে লেগেছিল খেয়াল করেন নি। হুঁস হয় দামোদর একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে। মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে দুরুদুরু করতে থাকে ভারতচন্দ্রের;—এত দেরি হ'ল যে দামোদর? খবর শুভ তো?

—মঙ্গল সংবাদ একেবারে সঙ্গে করে আনবো বলেই দেরি হ'ল কত্তা। কৃষ্ণনগর কাছারীর মোহর-আঁকা একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় দামোদর;—রামদেব নাগের নামেও চিঠি গেছে। ব্যাটা পেয়েছে নিশ্চয়ই এতদিনে।

এ সমস্ত কথা কানে যায় না রায়গুণাকরের। কোনরকমে

চিঠিখানা খুলেই রুদ্ধশ্বাসে পড়তে থাকেন। মহারাজার আপন হাতের লেখা। অনেক দুঃখ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। রামদেব যে এমন কাণ্ড করবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। যাই হোক, তাকে যথাযথ সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। সব শেষে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন, কবি যেন একবার কৃষ্ণনগরে এসে দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।

এতদিনকার দুর্ভাবনা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে ওঠে। মহারাজাকে ভুল বুঝেছিলেন তিনি। সত্যিই তাঁকে ভালোবাসেন কৃষ্ণচন্দ্র। চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে ফুটে রয়েছে আন্তরিকতা। আবার পড়েন।

রামদেব অপমানিত হয়েছে। এ অপমান বর্ধমানের। তবু যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে না। চরম কোন প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত শান্তি হবে না তাঁর। কঠিন শপথ করেন রায়গুণাকর। এমন প্রতিশোধ, যা চিরদিন দেশবাসীর মনে গাঁথা হয়ে রইবে। মর্মান্তিক অপমানে তুষের আগুনের মতো দগ্ধ হবে বর্ধমান।

অনেকদিন পর মনটা বেশ হাল্কা লাগে। অদ্ভুত একটা চাপল্য যেন শিশুর মতো করে দেয়। পরীক্ষিতের সামনেই শ্রীমতীকে চুম্বন করেন ভারতচন্দ্র।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রাধা;—বুড়ো বয়েসে তোমার কি ভীমরতি ধরলো? ছেলে এখনো জেগে রয়েছে না।

—থাকুক রাধা। বাইরে দেখছো চাঁদের বন্যা। কবির ছেলে যদি এ বন্যা দেখেও চোখ বুজে থাকে, তবে জানবো সে বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে।

—আজ কি হয়েছে? উদ্যত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে শ্রীমতী।

রায়গুণাকর বুকে টেনে নেন। তারপর আর একটা চুম্বন এঁকে

দিয়ে জবাব দেন ;—হয়েছে অনেক কিছু। রামদেব নাগ শায়েস্তা হয়েছে। তার চাইতে বড় খবর মহারাজা কৃষ্ণনগরে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—রাজদর্শনে যাচ্ছো ; আমার জন্যে কি আনবে ?

একটা ধাক্কা লাগে যেন। বিদেশে যাচ্ছেন ভারতচন্দ্র। ভেবেছিলেন খবরটা শুনে বাধা দেবে শ্রীমতী ; কাঁদবে। কাব্যের নায়িকাদের মতো।

কিন্তু সে সব কিছুই হল না। তবু আজকের রাতে কোন ক্ষোভই রাখতে চান না তিনি। আলিঙ্গনটাকে আরো গাঢ় করে বলেন ;—কি চাও বলো।

—তুমিই বলো কি আনবে ?

—রাজকণ্ঠের ফুলের মালা যদি আনি রাধা।

—ছাই হবে ফুলের মালা দিয়ে। রত্নহার হলেও না হয় একটা কথা ছিল।

—রত্নহারই চাও ?

—হ্যাঁ।

—তাই হবে। একটা কথা বলো। কৃষ্ণনগর থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। কিন্তু আমি যে যাবোই সেটা জানলে কি করে ?

—ওমা, এ আবার এমন শক্ত কি। রাজসভার মাইনে-করা কবি তুমি। রাজা হুকুম করলে যেতেই হবে। হাজার হোক চাকরি।

আবার একটা ধাক্কা খান রায়গুণাকর। আহত স্বরে বলেন ;—হুকুম নয় রাধা, আমন্ত্রণ।

—ওই একই হ'ল। রাজার আমন্ত্রণই হুকুম।

আর কথা বাড়াতে ভালো লাগে না। বিশেষ করে এ ধরনের। দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য বড় বেশি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে

এর মধ্যে। তাই ঘুরিয়ে নেন ভারতচন্দ্র ;—দূর দেশে চলে যাবো। মন তোমার খারাপ হচ্ছে না রাধা ?

—হলেই বা কি করা যাবে বল। আগে কাজ, তবে তো মন। কবে যাবে ঠিক করলে ?

—তুমিই বলো কবে রওনা হব।

—যেতেই যখন হবে, তখন তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।

—তা'হলে কাল।

—ফিরবে কবে ?

—সেটাও তুমি বলে দাও।

—ওমা, সে আবার আমি বলবো কি করে। কাজে যাচ্ছো, শেষ হলেই চলে আসবে।

অসহ্য। শত চেষ্টাতেও মনের ফুল ফোটাতে পারেন না রায়গুণাকর। রাধা চিনেছে কেবল একটা জিনিস। প্রয়োজন। প্রয়োজনের কাছে সব কিছুকেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত সে। চরম বাস্তবতার নমুনা।

কিন্তু অন্তর বলে কি কোন জিনিসই নেই তার ? বহুদিন পর চিন্তাটা আবার জাগে। হৃদয়ে কি কোন দুর্বলতা, কোন কান্নাই নেই ? ক্ষণেকের জন্যেও কি মনটা উদাস হয় না ?

কথাটা বলতেই শ্রীমতী হেসে ফেলে ;—তোমার মতো তো আর কবি নই। কবিদের কাছে আজে-বাজে জিনিসগুলোরও হয়তো দাম আছে। আমি সাধারণ মেয়েমানুষ। বুঝি শুধু দরকার। আর—

একটু থেমে বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজে দেয় ;—স্বামীর সোহাগ।

—সেটাও কি দরকারেই ?

—তা জানি না।

—যদি না করি।

শ্রীমতী মুখ তোলে ;—মানে ? বিয়ে করেছো। কর্তব্য করবে না ?

প্রয়োজন এবং কর্তব্য ; এই নিয়েই জগৎ আর জীবন রাধার। মূলাজোড়ে এসে বিরাট একটা মোহের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতচন্দ্র। সে জাল ছিঁড়ে যায়। কবির বনিতা না হয়ে কোন বেনের স্ত্রী হলেই মানাত ভালো। প্রতিটি পদক্ষেপ চলতো হিসেব করে, পাই-পয়সা গুণে।

—আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে।

আলিঙ্গনটা কখন শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেই কর্তব্যচ্যুতি-টুকুকেই ধরিয়ে দিলো শ্রীমতী। অত দুঃখের ভেতরেও হাসি চাপতে পারেন না ভারতচন্দ্র ;—আমার কিন্তু জেগে কাটাতে ইচ্ছে করছে আজকের রাতটাকে।

—আমি তা পারবো না বাপু। একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে। ভোরবেলা উঠেই লেগে পড়তে হবে।

তারপর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে ;—সত্যিই কি কাল যাবে ?

—ভাবছি তো তাই।

—তা'হলে তো ভোরবেলা রওনা হতে হবে। গোছগাছও করা হ'ল না কিছু।

—তবে না হয় কাল যাবো না।

—সেই ভালো। শ্রীমতী একটু চুপ করে। তারপর অধীর প্রত্যাশায় মুখখানা তুলে ধরে ;—এই ভাবেই কি রাত শেষ হবে ?

—না রাধা ; ঘনিষ্ঠতর আলিঙ্গনে বেঁধে নেন ভারতচন্দ্র ;—প্রেমিকার কর্তব্য তুমি না করলেও, স্বামীর কর্তব্য আমায় করতে হবেই। সমাজের দাবী। উপায় আছে না করে।

কথাটা বলেছিলেন অনেক দুঃখে। সেই দুঃখ হৃদয়ে নিয়েই নৌকায় ওঠেন কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে। হাতে সদ্য সমাপ্ত অন্নদা-মঙ্গলের পুঁথি। এতদিনকার বদ্ধ জলাশয়ে যেন দক্ষিণা বাতাস

লেগেছে। মনপ্রাণ আর ধৈর্য মানতে চায় না। বহুদিন বিদেশ বাসের পর বুঝি ফিরে চলেছেন নিজের দেশে। সে দেশ কৃষ্ণনগর।

আরেক বসন্তের এক উজ্জ্বল প্রভাতে মূলাজোড়ের ঘাট হ'তে বজরা ভাসিয়ে দেন কবি রায়গুণাকর। কৃষ্ণনগর তখন ছেয়ে আছে তাঁর সম্পূর্ণ চেতনায়।

"নিবেদন অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস-বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥"

অপূর্ব কণ্ঠে দরদ ঢেলে গাইছে নীলমণি সমাদ্দার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে রাজসভা। অন্নদামঙ্গল পালাগান আরম্ভ হ'তেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অন্য সমস্ত আমোদ-প্রমোদ। এমন কি নাচ-গান পর্যন্ত।

সুরের তালে বিশ্রাম খাঁর মাথাটা দুলতে থাকে। চোখ বুজে বসে রয়েছেন ওস্তাদ। গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট, তন্ময় কৃষ্ণচন্দ্র যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছেন। রায়গুণাকরের নিন্দায় পঞ্চমুখ সভাসদেরাও স্তম্ভিত। নীলমণি গেয়ে যায়ঃ

"পদ্মিনী মুদয়ে আখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥"

কৃষ্ণচন্দ্র একটু নড়ে বসেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে রসিকতা আরো একজন করে। গোপাল ভাঁড়। কিন্তু সে শুধুই ভাঁড়ামি। বড় জোর হাসি পায়। সেই সাথে খোঁচার জ্বালাও।

কিন্তু মহারাণী পদ্মিনী সম্বন্ধে রায়গুণাকরের এই ইঙ্গিতে হাসি আসে না। জ্বালাও ধরে না। বরং সূক্ষ্ম একটা আনন্দ-ধূপের গন্ধের মতো মনকে মাতিয়ে তোলে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন মহারাজ।

গানের সুর ক্রমশ উচ্চগ্রামে ওঠে :

"চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্র দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥"

নিস্তব্ধ সভাগৃহে আলোড়ন জাগে। মৃদু একটা প্রশংসার ধ্বনি শোনা যায়। কানে যেতেই সম্বিত ফিরে পান রায়গুণাকর। স্বপ্নিল চোখে চারিদিকে তাকিয়ে সে সাধুবাদ গ্রহণ করেন। এতদিন মনে একটা সন্দেহ ছিল। না জানি কিভাবে অন্নদামঙ্গলকে গ্রহণ করবে রাজসভা। আজ সে সন্দেহ ঘুচে গেল।

দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে রাজনর্তকীর মুখের ওপর যেয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। চাঞ্চল্য, হতাশা, ক্রোধ সব মিলিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে রয়েছে সেখানে। চট করে মনে পড়ে যায় ভাবতচন্দ্রের। মূলাজোড় যাবার আগের ঘটনা। অন্নদামঙ্গলের কথা শুনেই মুখ বিকৃত করেছিল বাঈজী। কাব্য না পড়েই। আজ সেখানে ফুটে রয়েছে সেই ভাবেরই চরমতম অভিব্যক্তি। রাজ-সভার আর সকলের ভালো লাগাকে স্পষ্ট উপেক্ষা করছে।

একটু আগের আনন্দটুকু মিইয়ে পড়ে। মুখ ., করে নেন অন্নদামঙ্গলের কবি। পদের পর পদ পার হয়ে যেতে থাকে নীলমণি সমাদ্দার। বিভিন্ন রাগে, বিচিত্র তালে। বিশ্রাম খাঁর সুযোগ্য শিষ্য নিজের সম্পূর্ণ শিক্ষাব যেন পরিচয় দিতে বসেছে গুণী সমাজের সামনে। অকৃপণ প্রশংসা ধ্বনি ওঠে। কখনো কাব্যের, কখনো বা সুরের।

রায়গুণাকর কিন্তু বসে থাকেন নির্বিকার হয়ে। 'সভাবর্ণন' অংশের শেষ কয়েক ছত্রে পৌঁছায় নীলমণি :

অন্নদা কহিল বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥

গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

সভাকে নমস্কার জানিয়ে চুপ করে নীলমণি সমাদ্দার। আজকের মতো পালাগান শেষ হ'ল। মহারাজা উঠে দাঁড়ান। সেই সঙ্গে অন্য সবাই। সভা ভঙ্গ হয়।

সব আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যায় ভারতচন্দ্রের। এত লোকের প্রশংসা, মহারাজার অভিনন্দন, সমস্ত কিছু তিক্ত হয়ে গিয়েছিল একটিমাত্র মানুষের ভাব-ভঙ্গীতে। তবু তো কোন কথাই বলে নি সে। ভালোও নয়, মন্দও নয়।

সেই কথা চিন্তা করেই বিরসমুখে বেরিয়ে আসছিলেন। অমনি বাধা পড়ে;—কবি রায়গুণাকর!

—আদেশ করুন মহারাজ।

—কাজ রয়েছে কোন।

ভারতচন্দ্র হেসে ফেলেন;—আমার আবার কি কাজ থাকবে।

—তবে একটু অপেক্ষা করো। কথা আছে।

সবাই চলে যায়। প্রিয় বয়স্য গোপাল ভাঁড়ও। নির্জন সভাগৃহে বসে থাকেন দুজনে। তারপর কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম কথা বলেন;—রামদেব নাগের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে?

—হ্যাঁ মহারাজ। অশেষ দয়া আপনার।

—আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম, কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তিতভাবে বলেন;—তোমাদের ওপর একটা রাগ রয়ে গেছে বর্ধমানের মহারাণীর।

—আমারো সেই সন্দেহ হয়।

—এ অবস্থায় তোমার পক্ষে ওখানে থাকা কি ঠিক হবে?

ভারতচন্দ্র চমকিত হন;—আপনি কি আমায় অন্য কোথাও যেতে বলছেন?

—হ্যাঁ রায়গুণাকর। কাছাকাছি থাকলেই একটা গণ্ডগোল বাঁধবে।

—কিছু মনে করবেন না মহারাজ। এ অবস্থার জন্য কিন্তু দায়ী আপনি নিজেই।

—আমি?

—হ্যাঁ। যে মূলাজোড় আমায় ইজারা দিয়েছেন, সেই মূলাজোড়ই আবার পত্তনি দিলেন মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে। এতে আমায় শুধু অপমানই করা হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকেন। তারপর বিব্রতভাবে হাসেন;—অভিযোগ তোমার যথার্থ রায়গুণাকর। কিন্তু বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা আমি আদৌ বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম, তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

—বলতে চান আপনি জানতেন না?

—ঠিক তাই রায়গুণাকর। বর্গীর উৎপাতে অস্থির হয়ে গঙ্গার এপারে আমার এলাকায় আসতে চাইলেন মহারাণী বিষ্ণুকুমারী। সত্যিই আমি খুশী হয়েছিলাম এতে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু মূলাজোড় গ্রামখানাকেই যে পত্তনি দেওয়া হবে সে কথাটা আমিও জানতাম না, দেওয়ানজীও নয়।

—তবে?

—সে অনেক কথা কবি। শুনবেই?

—যদি আপত্তি না থাকে মহারাজ।

—আপত্তি নেই। তবে নিজের অদূরদৃষ্টির জন্যে বড়ই লজ্জিত হয়েছি।

—তবে থাক।

—না; বলাই উচিত তোমায়। কৃষ্ণচন্দ্র একটা ভারী নিশ্বাস ফেলেন;—রাজসভায় তোমার অনেক গুণমুগ্ধ সুহৃদ রয়েছে কবি। তারাই এ ব্যবস্থাটা করেছে। জব্দ করবার জন্যে।

—এ কথা আপনাকে আগেই বলেছিলাম মহারাজ।

—বলেছিলে, কিন্তু তখন অতটা গুরুত্ব দিই নি। রাজসভায় ওটুকু ঈর্ষা-দ্বেষ থাকেই। তাই বলে সেটা যে এতদূর গড়াবে তা ভাবি নি। যখন খেয়াল হ'ল, তখন আর করবার কিছু ছিল না। রামদেবের পত্তনি নাকচ করলে মহারাণী অপমানিত বোধ করতেন। তুমি আমার নিজের লোক। অসুবিধাটুকু বুঝবে। তিনি তো আর তা নন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন;—তাই আমার অনুরোধ, পাশের গ্রাম গুস্তেতে চলে যাও। একশো পাঁচ বিঘা জমি তোমায় আমি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করে দিচ্ছি।

আপত্তি করবার কোন পথই থাকে না। তা'ছাড়া মহারাজার যুক্তির সারবত্তাটুকুও অস্বীকার করা যায় না। মনের মেঘও কেটে গেছে সব ঘটনা শোনবার পর। ভারতচন্দ্র খুশী হন;—আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই হবে মহারাজ। তবে একটা অনুরোধ। মূলাজোড়ের বাড়ি আমায় ছাড়তে বলবেন না আমার পরিবারবর্গ থাকুক ওখানে। আমি আপনার কাছে কৃষ্ণনগরে থাকবো।

—কেন কবি?

—মূলাজোড় আমার ভালো লেগেছে।

—বাড়ি না হয় রইল। কিন্তু তুমি ওখানে থাকবে না কেন?

—আমি থাকলেই বিষ্ণুকুমারী গণ্ডগোল বাধাবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। তারপর বলেন;—কিছু একটা তুমি লুকোবার চেষ্টা করছো রায়গুণাকর।

—না মহারাজ। ভারতচন্দ্র থতমত খেয়ে যান।

—আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না কবি। মহারাণীর ক্রোধ শুধু তোমার ওপর নয়। তার চাইতেও বেশি রাজা নরেন্দ্র রায়ের ওপর। গণ্ডগোল যদি একান্তই বাধাতে চান, তবে নরেন্দ্র রায় ওখানে রয়েছেন ওই অজুহাতেই বাধাবেন। আসল কথাটা কি বলতো? তুমি কি ওখানে সুখী নও?

এ প্রসঙ্গ তুলবেন না ঠিক করেছিলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু সে ইচ্ছা টেঁকে না। ঠিক ধরে ফেলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

—চুপ করে রইলে যে ?

—সুখী কিনা জানি না মহারাজ। ঠিক বুঝতে পারি না। তবে মাতাল হওয়া যদি সুখের লক্ষণ হয়, তবে আমি সুখী হয়েছি। সংসারের ভোগসুখে মাতালের মতো বঁদ হয়ে গেছি। কিন্তু আমি তা চাই না।

কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত হন ;—স্ত্রীকে নিয়ে এসেছো তো ?

—হ্যাঁ ? একটা পুত্র সন্তানও হয়েছে।

—সত্যি ? এত বড় সুখবরটা এতদিন চেপে ছিলে ?

ভারতচন্দ্র বিমর্ষভাবে হাসেন ;—সুখবর নিশ্চয়ই মহারাজ। তবে পুত্র পেয়েছি, কিন্তু তার বিনিময়ে প্রেমিকাকে হারিয়েছি।

—তার মানে ? আশঙ্কায় কেঁপে ওঠেন কৃষ্ণচন্দ্র।

—না মহারাজ ; যা আশঙ্কা করছেন তা নয়। স্ত্রী আমার বহাল-তবিয়তেই রয়েছেন। তবে, পুত্র এবং সংসার নিয়ে রাধা নিজের চারিধারে পাঁচিল তুলে দিয়েছে। আমি আবার যে একলা সেই একলাই। তার জীবনে আমি আজ অনাহুত বৈ নই।

—সন্তান হলেই নারীর প্রেম ভাগ হয়ে যায় কবি এ নতুন কিছু নয়।

—হয়তো হয় ; কিন্তু আমি যে তাতে তৃপ্তি পাই না। আমার সঙ্গীহীন হৃদয় যে হাহাকার করে।

—সেইজন্যেই পুরুষের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে বাইরে।

—আমিও সেই কারণেই মূলাজোড়ে থাকতে চাই না।

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে ফেলেন ;—কিন্তু বাইরে মানে তো আর দেশ ছাড়া হওয়া নয়।

—তা নয় মানি মহারাজ। কিন্তু আরো ভয়ানক একটা কারণ রয়েছে। ওখানে থাকলে আমি মরে যাবো। আফিমের নেশার মতো সংসারের নেশা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

রাধা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটা অন্তত মহৎ উপকার করেছে আমার। সে নেশা ভেঙে দিয়েছে। নইলে কোন্‌দিন হয়তো অকর্মণ্য, জড়পদার্থ হয়ে পড়তাম। তাই আর ওখানে থাকতে চাই না। এখানে থেকে দেবী ভারতীর চরণে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।

—দিলাম কবি। আমার জমিদারীতে যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারো। কোথায় থাকতে চাও?

—মাধবী-মালঞ্চে।

—কিন্তু ওখানে কষ্ট হবে না?

—বিদ্যার দেবী লক্ষ্মী নন মহারাজ।

—বেশ। তুমি যদি খুশী হও, আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার সুখই আমার একমাত্র কাম্য। তবে স্ত্রীর প্রতি অবহেলা কিন্তু করতে পারবে না।

—আপনার দয়ায় গুস্তের ব্রহ্মোত্তর জমিই সে কাজ করবে।

—তা করবে; তবে তোমাকেও করতে হবে। মাঝে মাঝে ওখানে যেতে হবে।

—যাবো।

—তবে আজ এসো। রাত হ'ল। কাল সন্ধ্যাতেও আসতে হবে। নিজের কানে শুনবে কেমন হ'ল তোমার রচনা।

ভারতচন্দ্র উঠে পড়েন;—আপনার কেমন লাগছে মহারাজ?

—ভালো লাগছে। অলংকরণের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখিয়েছো।

রাজনর্তকী কিন্তু অন্য কথা বলে। দেখা হতেই আক্রমণ করে; —এ তুমি কি করেছো কবি?

অত রাত অবধি রাজউদ্যানে অপেক্ষা করছিল প্রিয়ম্বদা। রাজবাড়ি থেকে ফিরতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। রায়গুণাকর তটস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন;—কি করলাম আবার?

—তাই তো শুধাচ্ছি। এতদিন ধরে মূলাজোড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে শেষে এই কাণ্ড করলে?

—কাণ্ডটা কি তাই বলো না। অপরাধটা আগে জেনে নিই। হুজুরে হাজির তো রয়েইছি। যা ইচ্ছে শাস্তি দিও।

পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে চারিদিক। কিন্তু রাজনর্তকীর সেদিকে কোন খেয়াল থাকে না। রসিকতাটাকেও উপেক্ষা করে রুষ্টস্বরে বলে;—ওই অপদার্থ রাজা আর তার মোসাহেব সভার গুণকীর্তন করবার জন্যেই কি কলম ধরেছিলে?

এতক্ষণে বুঝতে পারেন ভারতচন্দ্র। রাজসভায় যে চাপা ঝড়ের লক্ষণ দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই ঝড়ই আছড়ে পড়ল। তবু এতদিন পর প্রথম সাক্ষাতেই এই সম্ভাষণ। দুঃখিত হন। কুটিরের দরজা খুলতে খুলতে জবাব দেন;—কি করবো বলো। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এ কাজ করতেই হবে।

তারপর ভেতরে প্রবেশ করে প্রদীপটা জ্বেলে আহ্বান জানান; ভেতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ঝগড়া করবে?

—রাগ করলে? দরজা পেরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ায় বাঈজী।

আসনখানা এগিয়ে দিয়ে ভারতচন্দ্র দুঃখিতভাবে হাসেন;—না, রাগ করবো কেন। সত্যি কথা বলেছো। সেইজন্যেই তো বলি হীরার সঙ্গে তোমার একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। ভালো কথাগুলোকেও এমন জ্বালা ধরিয়ে বলো।

—হ্যাঁ তুমি রাগ করেছো। কিন্তু আমার বক্তব্যটাকে একবার বুঝতে চেষ্টা করো।

—বুঝেছি প্রিয়ম্বদা; অনেক আগেই। এবং সেই থেকেই একটা ব্যাপার বোধগম্য হয় নি। রাজসভার খোসামোদ তো তুমিও করো। আমার বেলায় তবে এত আপত্তি কেন?

—আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করছো? রাজনর্তকী হতাশভাবে বসে পড়ে আসনখানার ওপর।

—কেন করবো না? দুজনেই মহারাজার চাকরি করি।

—আমি একজন বাঈজী। যে টাকা ফেলবে, তারই মনোরঞ্জন করা আমার পেশা। কিন্তু তুমি একজন কবি।

উচ্চহাস্যে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেন রায়গুণাকর;—হে মালিনী হীরা, তোমার বাক্যবাণ আপাতত সংযত কর। এতদিন পর দেখা হ'ল।

প্রিয়ম্বদা ফুঁসে ওঠে;—যখন-তখন তুমি আমায় অপমান করবে?

—সে সাহস নেই দেবী।

—তবে হীরা মালিনী বলে সম্বোধন করলে কেন?

ভারতচন্দ্র হাতজোড় করেন;—ঘাট হয়েছে দেবী। মাপ করো। এবার প্রসন্ন হও। বলো, কেমন আছো?

—খোসামোদটা রপ্ত করেছো ভালো। প্রিয়ম্বদা মুচকি হাসে।

—সেইটাই তো একমাত্র অস্ত্র আমার। এবার জবাব দাও। কেমন আছো?

—ভালো।

—ব্যস ওইটুকুই?

—আর কি জানতে চাও?

—আমার কথা মনে পড়তো?

রাজনর্তকী আড়ষ্ট হ'য়ে যায়;—তা জেনে তোমার লাভ?

—মেয়েরা কি সবাই কেবল লাভ ক্ষতির হিসাব নিয়েই দিন কাটায়? রায়গুণাকর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

—কত মেয়ে দেখেছো কবি?

—দুজন; স্ত্রী এবং প্রিয়সখি প্রিয়ম্বদা।

—আজ কি হয়েছে তোমার বলো তো? এত চপলতা তো আগে ছিল না।

—এখন হয়েছে প্রিয়ম্বদা। কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে মনে হচ্ছে নিজেকে ফিরে পেয়েছি। সে কথা বাদ দাও। বলো, আমায় মনে পড়ত কিনা?

—যদি বলি পড়ত না।

—দুঃখিত হব।

—তবে তাই হতে হবে কবি। একবারের জন্যেও মনে পড়ে নি তোমায়। সময় কোথায় যে মনে করবো?

কথাটা পরিহাস কিনা ধরতে পারেন না রায়গুণাকর। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ;—সত্যি বলছো?

—মিথ্যে বলবো কেন?

ভারতচন্দ্র থমকে যান। রসিকতাই করছিলেন এতক্ষণ। যে চপলতার জন্যে একটু আগে বাঈজী কটাক্ষ করলো, সেটাও ছিল নিছক পরিহাস। কিন্তু সেই পরিহাসই যে কখন্ গাম্ভীর্যের রূপ নিয়েছে বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলেন জবাবটা শোনবার পর। আঘাত পেয়ে।

রাজনর্তকী এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে ;—খালি আমার কথাই তো জানতে চাইছো। তোমার কথা এবার বলো। আমায় মনে পড়তো কি?

মনে সত্যিই পড়ে নি তেমন করে। যাও বা কখনো-সখনো ঝিলিক দিয়ে গেছে, তা বাঈজীর সাবধান বাণীর কথা স্মরণ করেই। তাও শেষের দিকে। প্রথম কিছুদিন হৃদয়- .নর সবটুকু স্থান জুড়ে ছিল শ্রীমতী। তারপর ক্ষুব্ধ অভিমান। অকপটে স্বীকার করেন ;—না প্রিয়ম্বদা। সেইটাই আশ্চর্য লাগছে। অথচ তোমায় দেখে ভাবছি, মনে পড়া উচিত ছিল।

—পড়ে নি সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু পড়া উচিত ছিল মানে?

—তা বলতে পারি না।

—আমি কিন্তু পারি।

—পারো? সত্যিই অবাক্ হন রায়গুণাকর।

রাজনর্তকী আবার মুখ টিপে হাসে ;—ভালোবাসা কবি, ভালোবাসা।

ভারতচন্দ্র চমকে উঠেন ;—সব জিনিস নিয়ে রহস্য করো না প্রিয়ম্বদা।

—রহস্য করলাম ?

—নয় তো কি ?

—আমার কাছে একদিন প্রেম ভিক্ষা করো নি ?

—মিথ্যা কথা ; গম্ভীর হয়ে যান রায়গুণাকর ;—আরেক দিনও এই কথাই বলেছিলে। মিথ্যা হাজারবার বললেও সত্য হয় না। আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার বিচিত্র ব্যবহারের আসল কারণটা কি ?

—ওই একই হ'ল। প্রেমেরই আরেক রূপ।

—তোমার ব্যবহার দেখে আমারও ওই সন্দেহই হয়েছিল প্রিয়ম্বদা।

রাজনর্তকী সজোরে হেসে ওঠে ; স্বীকার করলে তা'হলে ?

—কি ?

—আমায় ভালোবাসো।

অনির্বচনীয় একটা হাসি ফুটে ওঠে রায়গুণাকরের মুখে। বলেন ;—ভালো শুধু তোমাকেই বাসি না প্রিয়ম্বদা ; ভালোবাসি এই পৃথিবীর প্রত্যেককে, বিধাতার প্রতিটি সৃষ্টিকে। ওটা যে আমার ধর্ম।

—কিন্তু সকলের নয়।

—ঠিক কথা বলেছো। সকলে যদি সকলকে ভালোবাসতো, তবে বিরোধ থাকতো না কোন। সেটা হয় না বলেই তো দুঃখ পাই।

—কি করবো বলো। ভালোবাসা বিলোনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগেই বলেছি তোমায়। রাজনর্তকী আবার মুচকি হাসে ;—তবে একটা কথা বলছি। যতই স্বীকার না করো, আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসো।

—অস্বীকার তো করি নি !

—প্রতিদান চাও না ?

—চাই। শুধু ভালোবাসা। কোন হীনতা নয় ; নীচতা নয়।

—স্বীকার যে করলে, এইটাই যথেষ্ট। তবে কেন একটু আগে আমায় মিথ্যাবাদী বললে ?

—ভিক্ষা শব্দটার মধ্যে একটা দীনতার অপমান লুকিয়ে রয়েছে প্রিয়ম্বদা। ভিক্ষা আমি তোমার কাছে কিছুই চাই নি ; এখনো চাই না।

—কি জানি ; কবিদের কথা বোঝাও শক্ত। রাজনর্তকী ছেদ টানে আলোচনাটার ;—স্ত্রীর সঙ্গে মিল হয়ে গেছে ?

—মিল ? না প্রিয়ম্বদা। মিল বলতে যদি প্রেম বোঝায়, তবে তা হয় নি।

—ওটা হ'ল অভিমানের কথা।

একটু হেসে আবার বলে ;—মূলাজোড়ে যেয়ে একটা জিনিস দেখতে বড় ইচ্ছে করে আমার।

—কি ?

—কেমন করে জীবনটাকে উপভোগ করছো তুমি। সকাল-সন্ধ্যা চণ্ডীমণ্ডপে কুৎসার আড্ডা ; নিশ্চিন্ত মনে গড়গড়া টানা ; রাতের আঁধারে পশুদের মতো সুখভোগ ; একপাল ছেলে- -ল—

—চুপ করো প্রিয়ম্বদা। কি ভেবেছো আমায় ?

—কেন ? আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মতো।

—আমি কি তাই ?

বাঈজী এবার গম্ভীর হয়ে পড়ে ;—তোমার নিজের কি মনে হয় ?

—আমি তা নই।

—তাই কি ?

ভারতচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ;—বিশ্বাস করো, আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। ওই জীবন যেন গলা টিপে মেরে ফেলছিল আমায়। সত্যিই হয়তো মেরে ফেলতো। বাঁচিয়েছে রাধা। যে মুখোস

পরে সারদাগ্রাম থেকে মূলাজোড়ে এসেছিল, সে মুখোস খসে পড়ল মা হতেই। আবার সেই প্রেম এবং প্রয়োজনে লড়াই। কিন্তু জীবনের সবটাই তো শুধু প্রয়োজন দিয়ে ভরা নয় প্রিয়ম্বদা। বিনা দরকারেই যে চাঁদের দিকে আমরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। থাকে না কেবল পশুরা। কিন্তু আমরা পশু নই; মানুষ। তাই আবার পালিয়ে এলাম এখানে।

—ভালো করেছো কবি; প্রিয়ম্বদা ফিসফিস করে বলে;—তোমাকে আর সাধারণ দশজন মানুষের মতো ভাবতে পারি না। সেইটাই তো হয়েছে যন্ত্রণা। তেলে-জলে, দুধে-ভাতে কোনরকমে জীবনটাকে কাটিয়ে যখন শেষ নিশ্বাস ফেলবে, তখন থাকবে একপাল ছেলেমেয়ে এবং একটা বিধবা স্ত্রী। আর কিছুই নয়। মন বলেও যে একটা বস্তু ছিল, তার কোন চিহ্নই থাকবে না পৃথিবীতে। না রায়গুণাকর, ওরকম একটা অবস্থায় তোমায় কল্পনাই করতে পারি না। সে কথা যাক। আর কিছু লিখলে ?

—না।

—কেন ?

—লেখবার জন্মেই মূলাজোড় ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। এইবার লিখবো।

রাজনর্তকী খুশী হয় কথাটা শুনে। একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে;—তোমার ওপর আমার অনেক আশা কবি। অনেক গর্ব তোমায় নিয়ে। তাই তো ওরকম করে বলি। বলো, মনে কিছু করো নি।

এ যেন আরেক রূপ। অন্নদামঙ্গল গান শুনে রাজসভায় যে বাঈজীর মুখে ধিক্কারের নীরব ভাষা ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। অপূর্ব একটা আনন্দে মন ভরে ওঠে ভারতচন্দ্রের।

রাজনর্তকী উঠে পড়ে ;—বল কবি।

—না প্রিয়ম্বদা।

—নিশ্চিন্ত হলাম। এবার যাই ?

—যাবে ?

—থাকতে বলছো ? এই এক ঘরে ?

—পারবে থাকতে ? ভারতচন্দ্রও রহস্য করেন।

—খুব পারবো। আমি যে বাঈজী।

—ও কথা বলো না প্রিয়ম্বদা। আমি দুঃখ পাই।

দরজার মধ্যে থমকে দাঁড়ায় রাজনর্তকী ;—সত্যি ?

—হ্যাঁ। তোমায় আমি কোনদিন ওভাবে ভাবি না।

—বেশ, আর কখনো বলবো না। এবার খুশী হলে ?

রায়গুণাকর হাসেন ;—হ্যাঁ। কাল রাজ সভায় যাচ্ছো তো ?

—কেন বলো তো ? বাইরে নেমে পড়েছিল রাজনর্তকী। ফিরে দাঁড়ায়।

—অন্নদামঙ্গল শুনতে।

—ওর আর কি শুনবো বল। হয় দেব-দেবীর, নয়তো রাজার গুণগান। সেই একঘেয়ে গৎ। ও শুনে কি হবে ? শুনবো, যেদিন মানুষের কথা লিখবে।

উন্মত্ত চাঁদের বন্যার মধ্যে ক্রমশ প্রিয়ম্বদার শরীরটা অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যেন পাগলের মতো ডেকে যাচ্ছে একটা কোকিল। বাতাসে কেমন একটা মাতাল-করা গন্ধ। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন রায়গুণাকর।

শ্রীমতী এবং প্রিয়ম্বদা ; বোধ-শক্তির দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন নারী। একজনের কোন রহস্য নেই ; কোন দুর্বোধ্যতা নেই। একনজরেই অন্তরের সবটুকু পড়ে নেওয়া যায়।

আর একজন অধঃপতিত সমাজের জীব। কিন্তু দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। বর্ষার আকাশের মতো। এই মেঘ, এই পরিষ্কার। অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে মতামত যা দিয়ে গেল তাতে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবু অদ্ভুত একটা আকর্ষণে রাজনর্তকীর চিন্তাকে

কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেন না। কাব্য সম্বন্ধে নিন্দা করেছে; তবু কেমন একটা মাধুর্য ছেয়ে রয়েছে সারা মন জুড়ে।

কাব্য। প্রিয়ম্বদার শেষ কথাটা ঝিলিক দিয়ে যায়। মানুষের কাহিনী। অকস্মাৎ খেয়াল হয়, সত্যিই মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে কেউ তো আজ অবধি কোন কাব্য লিখলো না। অন্নদামঙ্গলে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা মানুষের হয় নি। হয়েছে দেবতার কথা। নিজের অজ্ঞাতেই দেবতাকে মানুষ করে ফেলেছেন। মানুষকে দেবতা করতে পারেন নি।

রাজনর্তকীর অভিমতেরই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে;—হতাশ হলাম রায়গুণাকর। সবই রয়েছে অন্নদামঙ্গলে। আমার বংশের ইতিহাস, সভার বিবরণ, স্তুতি, অলংকারের ছড়াছড়ি, মুনসিয়ানা। কিন্তু রস কই? রসমঞ্জরীতে তবু কিছুটা ছিল। এতে যে কিছুই নেই।

পালাগানের শেষ দিনে রাজসভায় বির্তকের তুফান বয়ে যায়। পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন তর্কবাগীশ এবং বিদ্যালঙ্কার। রাজসভায় ভারতচন্দ্রের সবচেয়ে বড় দুজন শত্রু। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মতো মানুষও মনের ভাবটা চেপে রাখতে পারেন না। মুখে স্পষ্ট হতাশার চিহ্ন জেগে ওঠে;—রসহীন কতগুলো বিদ্যার কচকচি। একি কাব্য হয়েছে রায়গুণাকর? বড় আশা করে-ছিলাম, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই প্রতিভার উৎস তোমার খুলে যাবে। এখন দেখছি—

কথাটা আর শেষ হয় না। তার আগেই বাধা আসে। সভার রীতি ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ান বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার;—যাই বলুন মহারাজ, শাস্ত্রোক্ত সব ক'টা উৎকৃষ্ট অলংকার দিয়ে রায়গুণাকর অপূর্ব করে সাজিয়েছেন অন্নদামঙ্গলকে। রসশাস্ত্র অনুযায়ী এ কাব্য অনবদ্য হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্তভাবে তাকান ;—শাস্ত্রের ছাঁচে ফেলে দিলেই সব লেখায় রস হয় না বিদ্যালঙ্কার মশাই। তাতে রস দিতে হয়।

বাণেশ্বর তবু তর্ক করেন ;—কিন্তু শাস্ত্র—

—আপনাদের শাস্ত্র আমি জানি না ; জানবার দরকারও করে না। ভালো লাগছে না, এই সাদামাটা সত্যটাই আমার কাছে বড়।

—কিন্তু মহারাজ, তর্কবাগীশ মশাইও আমার সঙ্গে একমত।

—শুধু তর্কবাগীশ মশাই কেন, স্বয়ং রসশাস্ত্রকার বললেও আমি মানবো না। আমার ভালো লাগা না-লাগার ওপর তো কারো হাত নেই।

হতাশভাবে বসে পড়েন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। এবারেও ভুল হ'ল তাঁর। রসমঞ্জরী কাব্যের কথা মনে করেই অন্নদা-মঙ্গলের প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলেন মহারাজার ভালো লাগবেই। রসমঞ্জরীর সময়েও একই অবস্থা হয়েছিল। প্রথমে বুঝতেই পারে নি কেউ যে তাঁর ভালো লেগেছে। ভেবেছিলেন পছন্দ হয় নি। মত প্রকাশ করেছিলেন সেই আন্দাজে। সেই অভিজ্ঞতায় উলটো পথ ধরেছিলেন এবার।

কৃষ্ণচন্দ্র আবার বলেন ;—আশ্চর্য, গিল্টি এবং আসল সোনার পার্থক্য নজরে পড়ল না আপনাদের ?

লজ্জায়, ক্ষোভে মাথা হেঁট করে বসে থাকেন রাজসভাকবি। কৃষ্ণনগরে ফিরে আসার সমস্ত আনন্দ মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে যায়। কত আশা ছিল, নতুন রীতিতে ছন্দোবদ্ধ অন্নদামঙ্গল একটা অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে তাঁর। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গুঞ্জন করে ফিরবে ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। কিন্তু সে আশা চূর্ণ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। পরিপূর্ণ সভার মধ্যে জুটলো অভাবনীয় অপমান। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে।

মনের কথাটা এমন নগ্নভাবে প্রকাশ করে ফেলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেটাকে সামলাবার জন্যেই অন্য প্রসঙ্গ

উত্থাপন করেন। গলার স্বরও বদলে যায় ;—চোরপঞ্চাশৎ পড়েছো রায়গুণাকর ?

—পড়েছি মহারাজ। মুখ নীচু করেই উঠে দাঁড়ান ভারতচন্দ্র।

—আর একবার ভালো করে পড়ে দেখো। হয়তো কোন ইঙ্গিত পেতে পারো।

নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকেন রায়গুণাকর। মহারাজা আবার জিজ্ঞাসা করেন ;—কিছু বলবে ?

—হ্যাঁ মহারাজ। আমি মর্মান্তিক দুঃখিত ; আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না।

—আমিও কম দুঃখিত হই নি কবি। এতদিন ধরে লিখলে। অথচ ভালো হ'ল না। তবু নিরাশ হবার কিছু নেই। আবার নতুন কাব্য রচনা কর। পারবে না ?

পূর্বেকার সেই শক্তি আর যেন খুঁজে পান না ভারতচন্দ্র। যে শক্তিতে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রাজসভার বিকৃত রুচির স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দেবেন বলে। চোখ দুটো তুলে বিমর্ষস্বরে উত্তর দেন ;—চেষ্টা করবো ; তবে নিজের ওপর আর ভরসা করতে পারছি না। অনেক পরিশ্রম করে অন্নদামঙ্গল লিখেছিলাম।

—দেব-দেবী নিয়ে লেখা অনেক হয়েছে কবি।

—কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম দেবতাকে পাথরের নিষ্প্রাণ না করে, মানুষের রক্ত-মাংসের করতে।

—তা অবশ্য হয়েছে। গতানুগতিকের রাস্তা ছেড়ে কিছুটা নতুনত্ব নিশ্চয়ই এসেছে অন্নদামঙ্গলে। কিন্তু কবি রায়গুণাকরের কাছে আমাদের দাবী আরো অনেক বেশি। যা লিখেছো, তা তো যে কেউ লিখতে পারে। পারে নাকি গোপাল ?

—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ। গোপাল ভাঁড় অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায় ;—ও আমিও পারি। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে—এ প্রার্থনা তো আমরা রোজই হুজুরে পেশ করি।

আবহাওয়া অনেকটা হালকা হয়ে আসে। কৃষ্ণচন্দ্র স্মিত হাসি হাসেন ;—তা'হলে সেই চেষ্টাই করো গোপাল। না হয় দুজন সভাকবি থাকবে আমার। ক্ষতি কি।

কথাটা বলে সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। সোজা রায়গুণাকরের কাছে। পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে সস্নেহে বলেন ;—তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি কবি। সেইসঙ্গে এ বিশ্বাসও রয়েছে, যে তুমি পারবেই। মনের এই অবস্থাই তোমাকে দিয়ে জোর করে সার্থক কাব্য লেখাবে।

উত্তাল ঝড়ে হৃদয় যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে কি একটা বলতে যান ভারতচন্দ্র। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বাধা দেন :—আজ থাক রায়গুণাকর। তুমি যাও , বিশ্রাম নাও যেয়ে। তারপর নতুন উদ্দীপনায় কলম তুলে নিও আবার।

সভাকক্ষের দ্বার অবধি এসে বিদায় দেন মহারাজ ;—হতাশ হয়ো না। মানুষের জীবনে যদি এতো সহজে সার্থকতা আসতো, তবে তার মূল্য কেউ বুঝতো না। সার্থকতা তোমার আসবেই। সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেবী ভারতীর আরাধনা কর। সদয় হবেনই।

সত্যিই আরাধনা করেন রায়গুণাকর। অন্তর লুটিয়ে দিয়ে কাতর প্রার্থনা জানান : শক্তি দাও, ভাব দাও, ভাষা দাও! কিন্তু সে প্রার্থনা বুঝি পৌঁছায় না বাগ্‌দেবীর চরণে। একটার পর একটা মর্মন্তুদ, হতাশাময় দিন চলে যেতে থাকে : ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে ব্যর্থতার অন্ধকার। নতুন কোন ভাব দেখা দেয় না। লেখনী পড়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। ভাষার উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে।

যত দিন যায়, সন্দেহ ততই দৃঢ় হতে থাকে। সত্যিই শুকিয়ে গেছে সৃষ্টির উৎস। নইলে এতদিনের চেষ্টায় একটা পদও অন্তত রচনা করতে পারতেন। নিদেনপক্ষে উৎসাহও হ'ত লেখবার। অথচ উৎসাহ দূরের কথা, চিন্তাই যেন করতে পারেন না কিছু।

শেষ পর্যন্ত কেমন একটা বিবশ ক্লান্তি নেমে আসে দেহ-মনের ওপর। প্রচণ্ড উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে চিন্তার শিরাগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়ে। মানসিক মৃত্যু বুঝি একেই বলে। এর পর শুধু জড়পদার্থের মতো জীবনটাকে টেনে-হিঁচড়ে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে চলা।

সন্দেহটা মনে হতেই আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। এ মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর। চিন্তা থাকবে না, চিন্তা করবার শক্তি থাকবে না। অবোধ পশুর মতো বিস্ফারিত নয়নে শুধু চেয়ে দেখবেন। অসহ্য সে বেঁচে থাকা।

হৃদয়কে মেলে ধরবার মতো একজন সঙ্গীও নেই। এক রয়েছে হীরা মালিনী। তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে আনন্দের চাইতে বিরক্তিই বেশি হয়। আর রয়েছে রাজসভা। কিন্তু সেও অসহ্য। তাই যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন ইদানিং। প্রতিজ্ঞা করেছেন নতুন কাব্য হাতে না নিয়ে আর রাজপ্রাসাদের দেউড়ী পার হবেন না।

কথা বলবার মতো রয়েছে অবশ্য শুধু একজন। রাজনর্তকী। কিন্তু তারও দেখা নেই অনেকদিন। হয়তো অসুস্থ। তাঁরই একবার খবর নেওয়া উচিত। অথচ যাবার কথাতেই মনটা বেঁকে বসে। অন্নদামঙ্গল নিয়ে সেও কম কথা শোনায় নি। তা'ছাড়া কৃষ্ণনগরে সে আছে কিনা, তাও জানা নেই। মাঝে মাঝেই এরকম উধাও হয়ে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না। জানলেও বলতে চায় না।

পাগলের মতো বাগানের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ান রায়গুণাকর। পৃথিবীর ওপর রাগে, বিদ্বেষে শরীর জ্বলে যেতে থাকে। এই পৃথিবীকেই কত ভালোবেসেছিলেন। সকলেই তাঁকে দিল কেবল আঘাত।

একমাত্র সুহৃদ বলে ভেবেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কিন্তু সেদিনকার ব্যবহারে সে ভুলও ভেঙে গেছে। এই বিরাট বিশ্বে কেউ সুহৃদ

নয় তাঁর। কৃষ্ণনগরে তো নয়ই। স্থির করেন, মূলাজোড়েই ফিরে যাবেন।

মাথায় আগুন জ্বলছিল। তাই খেয়াল ছিল না কোনদিকে। হঠাৎ রাজনর্তকীকে একেবারে সামনে দেখে আতকে উঠেন;—কে?

পাল্টা প্রশ্ন করে বাঈজী;—কি হয়েছে কবি? কোন দুঃসংবাদ পাও নি তো? না শরীর খারাপ?

নিরুত্তরে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন ভারতচন্দ্র। ভুবন-মোহিনী সাজে সেজেছে রাজনর্তকী। এতদিন ধরে দেখছেন; কিন্তু এমন অপরূপ সৌন্দর্য কোনদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে আলতো স্পর্শ করে দেখতে থাকেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা সমস্ত গন্ধর্ব-কন্যাদের রূপ থেকে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যটুকু নিয়ে যেন সৃষ্টি হয়েছে তিলোত্তমার।

সে দৃষ্টির সামনে রাজনর্তকী কেমন জড়োসড়ো হয়ে পড়ে;—কি হয়েছে? অমন করে দেখছো কেন?

মনে পড়ে যায় ভারতচন্দ্রের। সৌন্দর্যমুগ্ধ মন মুহূর্তে ফিরে আসে কঠিন বাস্তবে। চাপা আর্তনাদ করে উঠেন;—তোমার কথাই বোধ হয় শেষ অবধি ফলে গেল প্রিয়ম্বদা। আমি মরে গেছি।

—মরে গেছো?

—হ্যাঁ। আজ পক্ষকালের বেশি হয়ে গেল, আপ্রাণ চেষ্টা করে একটা পদও লিখতে পারি নি। পারছি না। বাগ্‌দেবীর কৃপা থেকে সত্যিই বোধ হয় চিরদিনের মতো বঞ্চিত হলাম। আর এখানে থেকে কি হবে? ভাবছি মূলাজোড়েই ফিরে যাবো।

বাঈজী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে;—তাই বলো। আমি ভাবলাম কি না কি হয়েছে।

—তুমি হাসছো প্রিয়ম্বদা? কিন্তু এর চেয়ে যদি চরম কোন বিপদ হ'ত, তা'হলেও যে ভালো ছিল। এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে যে মৃত্যুও ভালো। তুমিই বলো, আমি কি করবো? আত্মহত্যা করবো?

রাজনর্তকী স্তম্ভিত হয়ে যায় কথাটা শুনে। ক্ষণকাল মৌন থেকে কিছু একটা স্থির করে নিয়ে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে ;—কে বললো তুমি মরে গেছো ?

—কেউ বলে নি। নিজেই বুঝতে পারছি সবকিছু।

—হৃদয়ের আগুন তোমার নিভে গেছে ?

ভারতচন্দ্র থমকে যান ;—আগুন? না প্রিয়ম্বদা, ও আগুন নেভবার নয়।

—কেন ? এখন তো আর কোন ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন পর মিলন হয়েছে ; সন্তান লাভ করেছো ; যে প্রেমের জন্যে হাহাকার করে ফিরতে, তা পেয়েছো।

অতি দুঃখে হাসেন রায়গুণাকর ;—সবই ঠিক প্রিয়ম্বদা। কিন্তু গলদটা রয়ে গেছে গোড়াতেই।

—গলদ ?

—হ্যা। যে জিনিসের জন্যে আমার হৃদয় কেঁদে মরছে, তা রাধা কেন, কোন নারীই বোধ হয় দিতে পারবে না।

—স্ত্রীর প্রেম পাও নি বলতে চাও ?

ভারতচন্দ্র এবার বিরক্ত হন। মনের এই অবস্থায় এ সমস্ত আলোচনা ভালো লাগে না। বিশেষ করে প্রেমের কথা। যে প্রেম পৃথিবীর কোন নারীর হৃদয়ে নেই। একটু চুপ করে থেকে বলেন ;—এ আলোচনা থাক। আঘাতে আঘাতে আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি। তার উপর সেদিন রাজসভায় যেভাবে অপদস্থ হয়েছি, তা বলবার নয়। মহারাজ পর্যন্ত—। ক্ষোভে স্বরটা আটকে যায়।

—সবই শুনেছি কবি। কিন্তু ওটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।

—বল কি? এত বড় অপমানকেও তুমি কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে চাও ?

—হ্যাঁ চাই ; কারণ বড়র রীতিই হ'ল এই। বালির বাঁধের

মতো। ক্ষণে হাতে চাঁদ তুলে দেবে। ক্ষণিকে আবার দড়ি পরিয়ে দেবে সেই হাতেই।

কথাগুলো মনে দাগ কাটে রায়গুণাকরের। মহারাজার ব্যবহারে যে অবরুদ্ধ ক্ষোভ বুকের মধ্যে ফুঁসছিল, বেরুবার পথ পাচ্ছিল না, সেইটাকেই যেন উন্মুক্ত করে দিল রাজনর্তকী। উপমাটা ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আবর্তিত হতে থাকে মাথার ভেতর। তারপর এক সময় একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। আপনা হতেই বেরিয়ে আসে—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ; ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।

বলেই চমকে ওঠেন ;—প্রিয়ম্বদা!

আলতো একটা হাসি জেগে ওঠে বাঈজীর ঠোঁটের কোণে। উজ্জ্বল চোখ দুটো চোখের ওপর রেখে জবাব দেয় :—বড় সুন্দর হয়েছে কবি। আবার বলো।

আবার আবৃত্তি করেন ভারতচন্দ্র। তারপর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ; —এক পক্ষকাল ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। একটা পদও তো মনে আসে নি।

বাঈজী অদ্ভুতভাবে হাসে। মুক্তা ঝরে পড়ে সে হাসিতে ; —আসবে কবি।

—বিশ্বাস যে হারিয়ে ফেলেছি প্রিয়ম্বদা।

—ভুল করেছো। পরখ করে দেখলাম। পারবে তুমি নিশ্চয়ই।

ভারতচন্দ্রের মুখখানা কেমন করুণ হয়ে যায়। চাপা বেদনায় হৃদয় যেন কাঁদছে। একনজর দেখেই ধরে ফেলে প্রিয়ম্বদা। কোমল স্বরে বলে ;—হৃদয়ে যতদিন আগুন জ্বলছে ততদিন শিল্পীর মৃত্যু নেই রায়গুণাকর।

—কিন্তু আমি যে বড় নিঃসঙ্গ, বড় রিক্ত হয়ে পড়েছি প্রিয়ম্বদা। বড় একলা।

—ওটা মনের ভুল।

—না, না, ভুল নয়। ব্যথায় যেন ককিয়ে ওঠেন ভারতচন্দ্র :—

সুহৃদের স্নেহ, পিতামাতার ভালোবাসা, প্রেয়সীর প্রেম, কিছুই যে পেলাম না। প্রথম দুটোর অভাবকে না হয় সহ্য করতে পারি। কিন্তু শেষেরটা ?

—প্রথম দুটোকে যদি সইতে পারো, শেষেরটাকেও পারবে।

বেদনার্ত একটা হাসি দেখা দেয় ভারতচন্দ্রের মুখে ;—মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে মানুষের হৃদয় রয়েছে। পুরুষের জীবনে প্রেম যে কতখানি, তা জানো না বলেই ও কথা বললে।

—জানি না কি ? প্রিয়ম্বদা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। প্রশ্নটা যেন করে নিজেকেই।

—জানো যদি, তা'হলে একথাটাও বোধ হয় জানো, নারীর জীবনে রয়েছে তার সংসার এবং সন্তান। তাই নিয়েই সে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পুরুষের জীবনে প্রেম ছাড়া যে আর কিছুই নেই। সেই প্রেম যে পুরুষ পায় নি, সে যে কত একলা, কত অসহায়, তা তুমি জানো না।

শুনতে শুনতে মুখের রেখাগুলো দৃঢ় হয়ে ওঠে বাঈজীর। হৃদয়ের মধ্যে অশান্ত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে। সে দ্বন্দ্বের কথা কাউকে বলবার নয়। কেউ জানে না।

শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পই জয়লাভ করে। দৃঢ়স্বরে বলে ;—তাই যদি হয়, তবে আমিই রয়েছি তোমার নিঃসঙ্গতাকে ভরাট করে দিতে।

স্থবির চিন্তার আকাশে বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যায়। উত্তেজিত-ভাবে রাজনর্তকীর মৃণালের মতো বাহুখানা চেপে ধরেন ভারতচন্দ্র ; —এখনো রসিকতা করছো ?

—না কবি, রসিকতা নয়।

—তবে ? হতভম্বভাবে দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে চত্বরের উপর বসে পড়েন রায়গুণাকর ;—সত্যি বলছো ?

—হ্যাঁ। একবিন্দুও মিথ্যা নয়।

—কিন্তু তুমিই না বলেছিলে, প্রেম দিতে পারো না কাউকে !

—বলেছিলাম; সেদিন তোমার প্রয়োজন ছিল না। আজ ফিরিয়ে নিচ্ছি সে কথা।

—কেন?

—আজ তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বলো—নেবে?

যে প্রেমের জন্যে আকুল হয়ে ফিরেছেন এতদিন, সেই প্রেম দিতে চাইছে একজন নারী। বারবনিতা হলেও সে নারী; চিরন্তন নারীত্ব রয়েছে তার হৃদয়ে। দ্বিধায় মন দুলতে থাকে। জিজ্ঞাসা করেন,—এতে তোমার স্বার্থ কি?

রাজনর্তকী ব্যথিতভাবে হাসে;—সব জিনিসকে স্বার্থ দিয়ে যাচাই করা চলে না কবি। তবে খুঁটিয়ে দেখলে কিছু না কিছু আছেই।

—সেটা কি?

—শুনবেই?

—হ্যাঁ। না শুনে তোমার কথার জবাব দিতে পারবো না।

—সে কথা কি এতদিনেও বোঝ নি?

বিস্ফারিত চোখে তাকান ভারতচন্দ্র। মুহূর্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বাঈজীর এতদিনের যে বিচিত্র ব্যবহার একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছিল, জট খুলে যায় সে রহস্যের। তবু মুখ ফুটে শুনতে চান;—বুঝলেও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

সলজ্জ চোখ দুটো নামিয়ে নেয় রাজনর্তকী;—ক্ষমা করো কবি। মুখ ফুটে বলতে পারবো না। শুধু একটা প্রার্থনা। চিরদিন যেন তোমার প্রিয়বান্ধবী হয়ে থাকতে পারি।

থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। অভিভূত ভারতচন্দ্রের হাতখানা শিথিল হয়ে যায়। খসে পড়ে রাজনর্তকীর বাহু থেকে। কম্পিত স্বরে বলেন;—তোমার দান আমি মাথায় তুলে নিলাম প্রিয়ম্বদা। তবে একটা সর্তে। কোনদিন যেন কোন কালিমা স্পর্শ না করে এতে।

—করবে না কবি।

—একদিন কথা দিয়েছিলাম, মানুষের মর্যাদা নিয়ে যদি কখনো আসতে পারো, ফেরাবো না তোমায়। মনে আছে?

—হুঁ। প্রিয়ম্বদা বুঝি স্বপ্নের ঘোরে জবাব দেয়।

—সে মর্যাদা যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমার নষ্ট হয়ে যাবে।

আঁখি-পল্লব দুটো কাঁপতে থাকে রাজনর্তকীর। মুক্তার মতো কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। স্তম্ভিতভাবে রায়গুণাকর চেয়ে থাকেন সে নয়নের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে।

আঁচলের কোণ দিয়ে জলটুকু মুছে রাজনর্তকী হাসে;—শুধু চেয়ে থাকলেই চলবে? কাব্য লিখতে হবে না?

আবিষ্ট ভাবটুকু কেটে যায় ভারতচন্দ্রের;—অদ্ভুত আনন্দ লাগছে প্রিয়ম্বদা। তুমি ঠিকই বলেছো। কাব্য; কিন্তু লিখতে পারবো কি?

—পারবে কবি। কাব্য রচনা তাঁতীর তাঁত বোনা নয়, যে মাকু চালালেই কাপড় বেরিয়ে আসবে।

বলেই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেয়;—রাজসভায় যাবে না?

—রাজসভায়? কেন?

—আমার যে বিশেষ মুজরা রয়েছে আজ।

—কোন উপলক্ষ্যে?

—উপলক্ষ্য কিছুই নয়। এতদিন অন্নদামঙ্গলের জন্যে অন্য সব কিছু বন্ধ ছিল। তাই আজ একটু বিশেষ অনুষ্ঠানের আদেশ দিয়েছেন মহারাজা।

—তাই বলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান ভারতচন্দ্র। দেখে বুঝি আশ মেটে না।

সলজ্জে মুখ নামিয়ে নেয় রাজনর্তকী। একঝলক রক্ত আছড়ে পড়ে গাল দুটোতে। সেদিকে তাকিয়ে আবেশমুগ্ধ অন্তর হতে আপনা থেকেই উৎসারিত হয় কবিতার পদ—

'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনু রাখে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥

—এসব কি আরম্ভ করলে? বিব্রত রাজনর্তকী বাধা দেয়।

—সৌন্দর্যের আরতি করছি প্রিয়ম্বদা। বাধা দিও না।

একটু থেমে ভাবগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে আবার আবৃত্তি করেন—

কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥

রাজনর্তকী উস্‌খুস্ করে ওঠে,—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—হোক দেরি। মূর্খ রাজসভা এ দেরির মর্ম বুঝবে না। তাতে কি আসে-যায়। আমার আরতি আগে শেষ হোক।

মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আবার শুরু করেন—

কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥

আর সহ্য করতে পারে না প্রিয়ম্বদা। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে কবির মুখখানা চেপে ধরে;—দোহাই তোমার, এবার চুপ কর।

আলগোছে হাতখানা সরিয়ে দেন রায়গুণাকর;—যদি না চুপ করি?

আবীরের মতো রাঙা হয়ে যায় প্রিয়ম্বদার গাল দুটো। জোড়হাতে অনুনয় করে;—মুখে বোলো না কবি। লেখ; যা

মন চায় লিখে যাও। বোঝো না, কথাগুলো শুনলে লজ্জা হয় আমার।

অদ্ভুত ভালো লাগে এই লজ্জাটুকু। অহেতুক কোন জড়তা নেই ; নেই কোন তথাকথিত পাপ-পুণ্যের বাহ্য সংস্কার। নারীত্বের যে রূপ যুগ-যুগান্ত ধরে কবিদের মানসে পুষ্টি লাভ করেছে, ব্রীড়ারক্ত কোমল সৌন্দর্যময় সেই রূপই চোখের সামনে দেখতে পান ভারতচন্দ্র। অপূর্ব একটা আনন্দের শিহরণে হৃদয় কাঁপতে থাকে। আবেগভরে বলেন ;—সেদিন তোমায় হীরা মালিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলাম মনে আছে ?

—খুব আছে। কথায় তোমার জুড়ি পাওয়া যাবে নাকি !

—তোমার কাছেই শিখেছি প্রিয়ম্বদা।

—বলেছি তো, কথায় তোমার সঙ্গে পারবো না।

রায়গুণাকর হাসেন ;—আজ কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে।

—বলে ফেলো। বাধা দিলেও তো শুনবে না।

—মালিনী তুমি ঠিকই ; তবে রাজউদ্যানের মুখরা হীরা নও। আমার কাব্যকাননের চারুভাষিণী মালিনী প্রিয়ম্বদা।

—আবার খোসামোদ শুরু হ'ল।

—না প্রিয়ম্বদা ; খোসামোদ নয়। এ আমার অন্তরের কথা।

—একটু ইতস্তত করে আবার বলেন ;—তখন কি সত্যিই মনের কথা বলেছিলে ?

—কোন্ কথা ?

—প্রেম।

রাজনর্তকী বিব্রত বোধ করে ;—রাজসভায় যেতে দেরি হয়ে গেল।

—আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

—কি জবাব দেবো ?

—সত্যি কিনা।

—সন্দেহ হচ্ছে ?

—হ্যাঁ প্রিয়ম্বদা।

—কেন জানতে পারি কি ?

—এত হিসেব করে যে প্রেমের জন্ম, তার ভিত সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার প্রয়োজন ছিল না বলে এতদিন দাও নি। আজ আবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে অঞ্জলি ভরে দান করতে চাইছো।

বিচিত্র দৃষ্টিতে রাজনর্তকী তাকায় ;—নিশ্চিত হবার এত দরকারটাই বা কি পড়ল ? যদি মিথ্যেই হয়, তবু তো শুনতে ভালো লেগেছে তোমার। আনন্দ পেয়েছো। এইটাই বা কম কি ?

একটু মুচকি হেসে আবার বলে ;—তুমি সত্যিই বোকা। জানো, আমার ব্যবসাই হ'ল প্রেমের। তাই তো এত হিসেব করি বিলোবার আগে।

কথাগুলো প্রায় ছুঁড়ে দিয়েই দ্রুতপায়ে নেমে যায় রাজপথে।

প্রিয়ম্বদা চলে গেল। যতদূর দেখা যায় অপলক তাকিয়ে থাকেন ভারতচন্দ্র। শেষ কথাটা মনের মধ্যে বাজছে। কিন্তু অর্থটা বোধগম্য হয় না। অস্বস্তি লাগে।

তবু একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ ঘুরে-ফিরে গুঞ্জন করতে থাকে অন্তরে। যত ভাবেন, ততই যেন নিস্তরঙ্গ, বদ্ধ হৃদয় পুষ্করে লাগে বসন্তের বাতাস। জীবন-চাঞ্চল্য ক্রমশ অস্থির করে তোলে। প্রকাশের বেদনায় বাণী এতকাল মূক হয়ে ছিল। রুদ্ধ হয়ে ছিল আবেগ। সেই আবেগে ঢেউ তুলে দিল প্রিয়ম্বদা।

হয়তো অলীক ছলনায় ভুলিয়ে গেল তাঁকে। তবু যেটুকু পেয়েছেন, সেইটুকুকেই মনে হয় অনেক, অপূর্ব। ছলনা হলেও এ মাধুর্যের স্বাদ যে কখনো পান নি। কামনা-বাসনার কলুষতাহীন, চির সৌন্দর্যময় অম্লান মাধুর্য। দৈহিক সৌন্দর্যের আধার থেকে এই যে দেহাতীত সৌন্দর্যের আনন্দ এইটাই তো সব।

পুঞ্জীভূত প্রকাশের বেদনা কেবলি পাক খেতে থাকে সেই আনন্দকে ঘিরে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো মনের তটে আছড়ে পড়তে থাকে শব্দলহরী। "রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥"

মুগ্ধ, বিহ্বল অন্তরে উঠে দাঁড়ান। আর সময় নষ্ট নয়। বিক্ষিপ্ত ভাবগুলোকে সাজিয়ে রাখতে হবে। অক্ষরের বন্ধনে বেঁধে রাখতে হবে এ আনন্দকে।

প্রদীপ জ্বেলে লেখনী নিয়ে বসে পড়েন। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নির্ঝরের মতো বেরিয়ে আসে পদের পর পদ ঃ

'বসন-ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতিসহ কত কোটি কাম ঝুবে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইয়ে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥'

আত্মহারা শিশু যেমন আপন আনন্দে পুতুল সাজায়, তেমনি করে নানা ভাবে, বিচিত্র রূপে, ভাষার অলংকারে আপন দয়িতাকে সাজান রায়গুণাকর। তবু মন ভরে না ; আশা মেটে না। আরো ভালো করে সাজালে বুঝি উপযুক্ত হ'ত। যে বিশ্ব-বিমোহিনী রূপ আজ দেখেছেন তাঁর কাব্য-কাননের মালিনীর, সে রূপকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা তাঁর নেই।

গভীর রাত অবধি লিখে ক্লান্ত হয়ে লেখনী সরিয়ে রাখেন। অনেকটা শান্ত হয়েছে হৃদয়। দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ান।

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। রহস্যময় সঙ্কেতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে বিশ্ব-চরাচর। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো গাছগুলো কি এক অবোধ্য ভাষায় কানাকানি করছে নিজেদের ভিতরে। ঠিক বুঝতে পারেন না। তবু যেন পরমাত্মীয়ের মতো অনুভব করেন তাদের মনোভাব। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নতুন করে

অন্তরের এক যোগসূত্র দেখতে পান। সবকিছু আনন্দময়, রূপময়, গন্ধময়। এবং তারই একত্রীভূত মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়ম্বদার অসীম সৌন্দর্যময় হৃদয়।

পরক্ষণেই অন্যদিকে পাক খায়-চিন্তাটা। এতক্ষণ হয়তো রাজসভাও আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই রাজনর্তকীকে দেখেই। কিন্তু সে আনন্দ নির্মল সৌন্দর্যের স্তুতি নয়; বিকৃত লালসার অশ্লীল প্রকাশ। আজ যদি প্রিয়ম্বদা তার সৌন্দর্য হারায়, অমনি রাজসভা থেকে বিদায় নিতে হবে তাকে। অন্তরের সৌন্দর্যের দিকে ফিরেও তাকাবে না কেউ। তাই রাজসভায় সে শুধুই নর্তকী, বাঈজী। দেহটা তার একটা পণ্য মাত্র। তার বেশি নয়। অন্তত রাজসভা তাই মনে করে। ঠিকই বলেছিল প্রিয়ম্বদা। বড়র রীতি সর্বদাই চঞ্চল।

পদটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আত্মহারা অন্তর কেবলি গুঞ্জন করে ফিরছিল সৌন্দর্যের চারিধারে। কিন্তু রাজসভার প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আবার। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ: ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ হাসি পায়। বাস্তব-জগতের একটা কঠিন সত্য দেখিয়ে দিয়েছে প্রিয়ম্বদা। বর্ধমান থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণনগর অবধি সেই একই সত্য সোচ্চারে নিজেকে জাহির করছে। পাণ্ডুয়াগড় ধ্বংস করবার পরও নরেন্দ্র রায়কে আবার জমিদারী দিয়েছিলেন মহারাণী বিষ্ণুকুমারী। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ। ভূসম্পত্তি দান করে সম্মান এবং সম্বর্ধনা জানাবার পরই রায়গুণাকরকে কঠিন আঘাত দিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র। মহারাজার ব্যবহারটাকে তবু সহ্য করা যায়। আঘাত দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। প্রকারান্তরে ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু বর্ধমানের দুর্ব্যবহার ভোলা শক্ত।

হঠাৎ প্রতিজ্ঞার কথাটা স্মরণ হয়। মূলাজোড়ে থাকতে শপথ নিয়েছিলেন, উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন বর্ধমানের ওপর। এমন প্রতিশোধ, যা চিরদিন অপমানে জর্জরিত করে

রাখবে অপর পক্ষকে। কিছু বলতে পারবে না। কেবলি জ্বলে-পুড়ে খাক হবে নিজের মধ্যে। তারই একটা ইঙ্গিত যেন নজরে পড়ে পদটার প্রসঙ্গে।

ঘুম আসে না। প্রহরের পর প্রহর চলে যায় চিন্তার ভেতর দিয়ে। মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। রাজবাড়ির ঘণ্টায় যথারীতি বিগত সময়ের ঘোষণা হয়। পাথরের মূর্তির মতো চত্বরটার ওপর বসে থাকেন রায়গুণাকর। আবার সেই অস্থিরতা উদ্বেল করে তুলছে। সৃষ্টিব উন্মাদনা। রচনা করতে হবে। এবার আর খণ্ড কবিতা নয়; অখণ্ড কাব্য। গল্পের আড়ালে বর্ধমানের ওপর কঠিন প্রতিশোধ। সেইসঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টি। একই সাথে হবে তুটো কাজ।

চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক কখন ঝিমিয়ে পড়েছিল। ভোরের ঝিরঝিরে বাতাসে চোখ তুটো জড়িয়ে আসে। চত্বরের ওপরেই শরীরটাকে এলিয়ে দেন।

ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। কবি শিহলন দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সামনে। হাতে খোলা রয়েছে নিজের লেখা চৌর-পঞ্চাশিকার পুঁথি। মধুর কণ্ঠে পড়তে আরম্ভ করেন;—

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং,
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

ধড়মড় করে উঠে বসেন রায়গুণাকর। মালিনী হীরা তাঁকে ওখানে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝি কবি শিহলনকেই খোঁজেন ভারতচন্দ্র। প্রভাত সূর্যের সোনালী আলোয় স্বর্ণাভ হয়ে উঠেছে বনানী-শীর্ষে। কেমন মায়াময়। পাতাগুলো কাঁপছে ভোরের বাতাসে। কিছু একটা বলতে চাইছে। সে ভাষা হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। রসিক কবি শিহলন যেন আত্মগোপন করে রয়েছেন ওই সোনালী আলোর আড়ালেই। এ বাণী তাঁরই।

অকস্মাৎ সে ইঙ্গিতময় ভাষার অর্থ যেন ধরতে পারেন রায়গুণাকর। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্রও বলেছিলেন চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের কথা। সর্বরসের শ্রেষ্ঠ আদিরসের সমুদ্র বিশেষ। কিন্তু পদগুলোর অন্য অর্থও রয়েছে। দেবী মহামায়ার স্তুতি। যোগতন্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব। যে যে-রকম অর্থ বোঝে, তার কাছে সেই রসই বিতরণ করে চৌরপঞ্চাশিকা।

ইঙ্গিতের রহস্যটুকু স্পষ্ট হয়ে যেতেই, নিজের পথও যেন দিনের আলোর মতো চোখের সামনে জেগে ওঠে। এই পথের সন্ধানেই ঘুরে মরছিলেন এতদিন। অধীর চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। চৌরপঞ্চাশিকাই সেই পথ। এত কাছে রয়েছে, তবু দেখতে পান নি: আদিরস বর্ণনার আড়ালে দেবী মহামায়ার স্তুতি। 'বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি।' এ কাব্য হবে মানুষের কাব্য, প্রেমের কাব্য। সেইসঙ্গে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষাও হবে। পরিবেশটাকে কেবল বর্ধমানে স্থাপন করলেই হ'ল।

চিন্তা করতে করতে মুখপাতটাও আপনা থেকেই এসে পড়ে। বর্ধমান থেকেই আরম্ভ করবেন,—

> পূর্বে ছিল এই স্থানে, বীরসিংহ নামে নরপতি।
> বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা, আছিল পরম ধন্যা,
> রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

আর, বিদ্যার রূপ বর্ণনা? রাতের লেখা পদগুলো মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি করতে থাকে। রূপ-বর্ণনার কাজটা আগেই সারা হয়ে গেছে।

> "যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
> সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥
> জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
> অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥"

বাকী রইলেন নিজে। আরাধ্যা দেবী প্রিয়ম্বদার নায়কের আসনে আর কাউকে বসাতে পারবেন না। নিজেই হবেন সেই নায়ক।

"একা যাব বর্ধমানে করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরী প্রবাস-সাগরে॥"

আনন্দে যেন পাগলের মতো লগেতে থাকে। শুভক্ষণে গত সন্ধ্যায় এসেছিল প্রিয়ম্বদা। প্রেমের স্পর্শে মৃতপ্রায় হৃদয়কে তাঁর বাঁচিয়ে দিয়েছে। এ কৃতজ্ঞতা চিরদিন মনে থাকবে। অক্ষয় করে রাখবেন এ দানকে। কাব্য-কাননের মালিনীকে অমর করে রেখে যাবেন কাব্যের মধ্যে। যেমন চিরস্থায়ী হয়ে রইবে তাঁর প্রতিশোধ, তেমনি অমর হয়ে থাকবে তাঁর প্রেমের অর্ঘ্য।

আনন্দে আত্মহারা কবি ছুটে যান হীরার কুটিরে;—হীরা, তুমি বিদ্যার কথা জানো?

—ওমা, তা আর জানবো না? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলাম, আমায় শুধচ্ছো একথা?

কথায় যেন হীরার ধার। নামের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে ভালো করে। ভারতচন্দ্র একটু মিইয়ে যান;—না, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। জানো কিনা, তাই—

—কথা শোনো মিনষের; হীরা একহাত গালে আরেক হাত কোমরে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়;—ওই সোঁদর নাপতের বউ বিদ্যেধরী তো? তা অত ছল করে বলচো কেন? পষ্টাপষ্টি বললেই হয়।

খানিকটা এগিয়ে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করে;—তা আবার ওদিকে নজর পড়ল কেন গো? বেশ তো বাঈজী নিয়ে পড়ে রয়েচো। বলিহারি বামনের। জাত-অজাত বাছ-বিচার নেই।

পালাবার পথ পান না ভারতচন্দ্র। তাড়াতাড়ি সরে আসেন হীরার সামনে থেকে। কথার এ ধারের সামনে গোপাল ভাঁড়ের মতো লোকও হার মানে। তিনি তো কোন্ ছার!

রাজউদ্যানের হীরা মালিনী।

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত-ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম॥
গাল-ভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি করে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥"

চোখের সামনে যা আসে তারই ভিতরে যেন রসের সন্ধান মেলে। সবকিছু কবিতাময়। সবকিছু ভালো লাগে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তুকেও ইচ্ছা করে ছন্দের নিগড়ে বেঁধে রাখতে।

আবার চমক দিয়ে যায় কবি শিহলনের স্বপ্ন। সেইসঙ্গে চৌরপঞ্চাশিকার পদ ঃ

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ততে মে,
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ,
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

* * *

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বহবাড়বাগ্নি—
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

গল্পের আখ্যানভাগ ক্রমশ একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো সুসংহত হয়। বর্দ্ধমানের নৃপতি বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা এবং কাঞ্চীপুরের অধিপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর। বিদ্যার অনুপম রূপের খ্যাতি শুনে রাজপুত্র সুন্দর এলেন বর্ধমানে। দর্শন, প্রণয়সঞ্চার, মিলন। এরই মধ্যে মেটাতে হবে প্রতিশোধের স্পৃহা।

চৌরপঞ্চাশিকার তিনটে শ্লোক ক্রমাগত আলোড়ন তুলছে মনের মধ্যে। চিন্তামগ্ন ভারতচন্দ্র ফিরে আসেন নিজের কুটিরে, মাধবী-মালঞ্চে। আবার কলম তুলে নেন ঃ

এখনো সে কনকচম্পক সুবরণী।
তনুলোমাবলি ফুল্ল কমলবদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বল লালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার॥

লেখা শেষ করে পড়েন একবার। তৃপ্তির একটা হাসি ফুটে ওঠে। কন্যার ব্যভিচারের কথা নিজের কাছে শুনছেন বীরসিংহ। অপরাধী রাজপুত্রের মুখেই। আবার ঝুঁকে পড়েন:

"এখনো যে মোর মনে আছয়ে সর্বথা।
এক রাত্রি মোর দোষে না কহিল কথা॥

* * *

ভূপতি বুঝিল মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এবা কোন জন॥"

অনেকদিন 'পর ক্লান্ত চরণে আবার রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে এসে দাঁড়ান রায়গুণাকর। বিদ্যাসুন্দর কাব্য যেদিন আরম্ভ করেছিলেন, সেদিন ছিল বসন্ত-পূর্ণিমা। পরিষ্কার মনে আছে। সেই রাতেই দেখেছিলেন অদ্ভুত স্বপ্ন। চৌরপঞ্চাশিকার পুঁথি হাতে কবি শিহলনকে। জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে সে রাত।

আর, আজ বোধ হয় জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। ঠিক খেয়াল হয় না। মাঝের দিনগুলো যে কিভাবে কেটে গেছে বুঝতে পারেন নি নিজেই। সব ভুলে গিয়েছিলেন। এমন কি নিজেকেও। আবিষ্ট

ভাবের ঘোরে পার হয়ে এসেছেন মাসগুলো। সামনে ছিল একটিমাত্র লক্ষ্য—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন।

সমাপ্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পুঁথিখানাকে সস্নেহে বুকে চেপে ধরেন রায়গুণাকর। মন্ত্রের সাধন হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে ঘুণ ধরে গেছে শরীরে। পেটের বেদনাটা এতদিন ছিল না। আবার অনুভব করতে থাকেন।

তা হোক; তবু আজকের দিন তাঁর কাছে বিজয় উৎসবের। শরীরের জন্যে আর কোন দুর্ভাবনা নেই। যেজন্যে শরীরের প্রয়োজন ছিল, তা' ফুরিয়েছে।

দ্বারী সসম্মানে অভিবাদন করে পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু কোন খেয়াল করেন না রায়গুণাকর। ভাবের ঘোর যেন তখনো সম্পুর্ণ-ভাবে কাটে নি। স্খলিতচরণে এসে দাঁড়ান সভাগৃহে। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। গমগম করছে রাজসভা। কি এক গুরুতর কাজে ভয়ানক ব্যস্ত দেখায় কৃষ্ণচন্দ্রকে।

কেউই প্রথমটা লক্ষ্য করে নি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে সোজা যেয়ে দাঁড়ান সিংহাসনের সামনে। হাত তুলে নমস্কার জানাতেই কৃষ্ণচন্দ্র মুখ ফেরান। স্মিতহাস্যে স্বাগত জানান—বসো ভারত, সব কুশল তো?

—হ্যাঁ মহারাজ। পুঁথিখানা দু'হাতে ধরে সামনে এগিয়ে দেন রায়গুণাকর।

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের সঙ্গে আবার আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেই অবস্থাতেই পুঁথিখানা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন। তারপর পাশে রেখে বলেন;—একটু অপেক্ষা করো কবি। জরুরী একটা কাজে আটকা পড়ে গেছি।

এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ে সভার। নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করেন পঞ্চরত্ন সভার সভ্যেরা। নীচুস্বরে পরামর্শ শুরু হয়ে যায়। অনেকদিন পর কবিকে আবার রাজসভায় দেখে সকলেই বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

কিন্তু নির্বিকার ভারতচন্দ্র কস্তুরী-মৃগের মতো নিজের গন্ধে নিজেই যেন বিভোর হয়ে বসে থাকেন। গোপাল ভাঁড় কি একটা রসিকতা করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অপূর্ব একটা আনন্দের পাখায় ভর করে মন উড়ে চলেছে অসীম মহাশূন্যের পানে। পারিপার্শ্বিক হীনতা, এমন কি নিজের শারীরিক যন্ত্রণাও সে আনন্দের তুলনায় তুচ্ছ।

বেশ কিছুক্ষণ পর খানিকটা অবসর পান কৃষ্ণচন্দ্র। সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন ;—এবার বল কবি।

রায়গুণাকর উঠে দাঁড়ান ;—আদেশ করুন মহারাজ।

—কেমন আছো ?

—শারীরিক ভালো নয়।

—কেন ?

—পেটে একটা ব্যথা হচ্ছে কিছুদিন থেকে।

—সে কি ? কৃষ্ণচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন ;—চিকিৎসা করাও নি ? রাজবৈদ্য রয়েছেন—

মৃদু হেসে বাধা দেন রায়গুণাকর ;—সে হবে মহারাজ, তার পূর্বে একটা নিবেদন ছিল।

—বল।

—পুঁথিখানা ওভাবে কাত করে রাখবেন না। রস গড়িয়ে পড়ছে।

উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলো শুনছিল সবাই। রসিকতার আভাসে উসখুস করে ওঠে। গোপাল ভাঁড় মুচকি হেসে টিপ্পনী কাটে ;—মুখটা তো এঁটে দিলেই হয় মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র জবাব দেন না। পুঁথিখানা হাতে নিয়ে খুলে ধরেন। ইতস্তত চোখ বুলিয়েই চমকে ওঠেন ;—এ কি করেছো রায়-গুণাকর ? রস যে সত্যি গড়িয়ে পড়েছে। ছি ছি, ওরকম কাত করে রাখা আমার উচিত হয় নি।

আবার পুঁথিতে চোখ রাখেন মহারাজা। অসুস্থ কবি যে

তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন খেয়াল করেন না সেটা। তন্ময় হয়ে যান একেবারে।

অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে সভাসদেরা। শেষ পর্যন্ত গোপাল ভাঁড় আর থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ায় ;—সব রস কি মহারাজ একাই পান করবেন ?

এবার হুঁশ হয় কৃষ্ণচন্দ্রের। মুখ না তুলেই হেসে বলেন ;—ইচ্ছে অবশ্য তাই করছে গোপাল।

—কিন্তু এই অভাজনেরা যে হা-পিত্যেশ করে রয়েছে।

—একটু ছিটেফোঁটা আপাতত চোখে দেখতে পাবো।

কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্‌টে 'বিদ্যার রূপবর্ণন' অধ্যায় থেকে আবৃত্তি করেন ঃ

কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁদিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

একটু থেমে অন্য স্থান থেকে পাঠ করেন :

রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥

সভাকক্ষ যেন উল্লাসে উত্তাল হয়ে ওঠে। একটু শান্ত হতেই গোপাল আবার করজোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ;—এ রস পোড়ামাটির পাত্রে পরিবেশন করলে মানায় না মহারাজ।

—মানে ?

—নীলমণির সোনার বাটি হ'ল এ রসের উপযুক্ত পাত্র।

রসিকতাটা উপভোগ করে সবাই। একমাত্র রায়গুণাকর ছাড়া। মুখ টিপে হাসে।

কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু গম্ভীর হয়ে যান ;—তা না হয় হবে গোপাল। নীলমণিকেই বলবো গাইতে। আমার মুখে সত্যিই মানায় না। ঠিকই বলেছো, পোড়ামাটির পাত্র।

আক্ষেপটা অকৃত্রিম বলেই মনে হয়েছিল। এমন কি ভারত-চন্দ্রেরও। গোপাল ভাঁড় কিন্তু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ;—তবে আজ সন্ধ্যা থেকেই আরম্ভ হোক মহারাজ।

—তাই হোক। অনেকদিন কাব্য পাঠ হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্র সায় দেন।

—এবং রাজনটীকেও হাজির থাকতে বলা হোক। সে না থাকলে, এ রসের স্বাদ ঠিক খুলবে না।

কথাটা কানে যেতেই ঘৃণায় গা গুলিয়ে ওঠে ভারতচন্দ্রের। এই সভার রুচি বদলাবার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন একদিন। আজ নিঃসন্দেহ হন। তা অসম্ভব। গলিত শবদেহে চন্দন লেপে দিলেও দুর্গন্ধ যায় না। যেতে পাবে না।

তিক্ত, বিরক্ত মনে কি একটা বলতে যান। কিন্তু বাধা পড়ে। কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসেন ;—সব ব্যবস্থাই না হয় করা যাবে গোপাল। কিন্তু সোনার বাটিতে রস পরিবেশন করা হবে কাদের এবং কোথায় ?

সেইভাবেই হাতজোড় করে থাকে গোপাল ;—একটু স্পষ্ট করতে আজ্ঞা হোক মহারাজ।

—বলছি, আবর্জনায়-ভরা মাঠে যারা বিচরণ করে তাদের সামনে সোনার বাটিতে রস পরিবেশন করে কি হবে ?

অপমানে কালো হয়ে যায় অন্যান্য সভাসদদের মুখ। ভারতচন্দ্র কিন্তু আনন্দে উঠে দাঁড়ান ;—মহারাজ !

দাঁড়াও ভারত ; তোমার কথা পরে শুনছি।

তারপর গোপাল ভাঁড়ের দিকে ফিরে আবার বলেন ;—চুপ করে রইলে যে গোপাল ?

নির্লজ্জের হাসি হাসে শঙ্কর তরঙ্গ ;—মহারাজ খাঁটি কথা বলেছেন। রাজসভাটাই তো কেবল মুখপোড়া এবং আবর্জনায় বিচরণরত গর্ধভে ভরা। রস পান করবে কে ?

—গর্ধভে পান করতে পারে না গোপাল। শুষে খায়। মুখপোড়া হনুমান কিন্তু পান করতে পারে।

বলেই অন্য কথায় চলে যান কৃষ্ণচন্দ্র ;—রায়গুণাকর ! কি বলে তোমায় সম্বর্ধনা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

ভারতচন্দ্রের আজ যেন কি হয়েছে। হেসে বলেন ;—আমি ভাষা জোগাচ্ছি মহারাজ। আদেশ করুন, কি বলতে চান।

—কবিতার ছন্দে তোমায় উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাতে চাই।

রায়গুণাকর সামান্য চিন্তা করেন। তারপর সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে যান :

ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র-প্রায় তাহারই বর্ণনে॥

—ভারত ! আবেগে কৃষ্ণচন্দ্রের গলাটা বন্ধ হয়ে যায়। একটু থেমে সামলে নিয়ে বলেন ;—সামান্য সাধুবাদ দেবো না ভারত। তার থেকে অনেক বেশি দিতে চাই। এদিকে এসো। বলো, কি পেলে তুমি খুশী হবে।

কম্পিতপদে সিংহাসনের সামনে যেয়ে দাঁড়ান রায়গুণাকর। প্রথমে মুখে কোন কথা ফোটে না। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করেন ;—পারিশ্রমিক দিতে চান কি মহারাজ ?

—না কবি। পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেকে খাটো করতে চাই না। চাই তোমায় সম্মান দিয়ে নিজে সম্মানিত হতে। যা চাও তুমি বলো। কিছুই অদেয় আমার নেই।

রায়গুণাকর স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে। সব যেন ঝাপসা হয়ে যায়। শ্মশানের মতো স্তব্ধ রাজসভার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চারিপাশ হতে তাঁকে ঘিরে রয়েছে। অন্তরে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, কি চান কবি ? যদি জমিদারী চেয়ে বসেন ? তর্কবাগীশের কানে প্রশ্নটাকে সন্তর্পণে রাখে গোপাল ভাঁড়।

কবির অস্পষ্ট দৃষ্টির সামনে ক্রমশ পরিষ্কার ফুটে কতগুলো ফুল। শঙ্খ শুভ্র মল্লিকার মালা। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকণ্ঠ পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। মল্লিকা ফুল বড্ড ভালোবাসেন মহারাজা।

মধুর হাসেন রায়গুণাকর ;—তা'হলে মহারাজ, রাজকণ্ঠের ওই মল্লিকার মালা দিন।

সামান্য ফুলের মালা। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রাজসভাও ক্ষণতরে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিশ্বাসই করতে পারে না। পরক্ষণেই উচ্চাঙ্গের একটা রসিকতা মনে করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু হাসেন না। নিজের কণ্ঠ থেকে মল্লিকার মালাটা খুলে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর কবির কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে রুদ্ধস্বরে বলেন ;—তোমার উপযুক্ত জিনিসই চেয়েছো রায়গুণাকর। এই কারণেই কবির সম্মান রাজার চাইতে সহস্র গুণে বেশি।

মাথা পেতে মালাটাকে গ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র ;—এ সম্মান কোনদিন ভুলবো না মহারাজ।

—কবির উপযুক্ত কথাই বলেছো রায়গুণাকর। আমিও আজ ধন্য হলাম। কিন্তু এতে যে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আরো কিছু চাও। বাস্তবে যা কাজে আসবে তোমার।

বাস্তব! ভারতচন্দ্র থমকে যান ;—আপনার অনুগ্রহে কোন কিছুরই অভাব আমার নেই মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে ফেলেন এবার ;—তুমি চাইবে না জানি। চাইতেই জানো না। নইলে কবি হবে কেন!

নিজের কণ্ঠ হতে মণিহারটা খুলে রায়গুণাকরের গলায় পরিয়ে দিতে দিতে আবার বলেন ;—এ মণিহার আমার গলায় শোভা পায় না কবি। বিশেষ করে তোমার সামনে। তোমার গলায় দিয়ে সত্যিকারের রাজেন্দ্রের মতো আচরণ করতে চাই।

ভারতচন্দ্র কেমন বিব্রত বোধ করেন ;—এ হার দিয়ে আমি কি করবো মহারাজ ?

—ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করো কবি। কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসেন ;— তোমার বুদ্ধিতে কুলোবে না এসব। বলো, আর কি চাও ?

রাধার প্রসঙ্গেই ভাবের ঘোরটুকু কেটে গিয়েছিল ভারতচন্দ্রের।

নিজেকে সংযত করে নেন। মণিহার চেয়েছিল বাস্তববাদী রাধা। মহারাজা ঠিকই অনুমান করেছেন। সামান্য ফুলের মালায় সন্তুষ্ট হবে না সে।

আর কি চাইবেন তিনি ?

হঠাৎ মনে পড়ে যায়। আর একটা জিনিস চাইতে হবে। এই কৃষ্ণচন্দ্রই অন্নদামঙ্গল শুনে তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। মর্মান্তিক হলেও, কঠিন সত্য বলেছিল প্রিয়ম্বদা। 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' হয়তো আগামীকাল এই হাতেই দড়ি পরিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

তার চাইতে এই সম্মান নিয়েই হৃষ্টচিত্তে এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। জীবনের সাধনা সফল হয়েছে। কালজয়ী কাব্য রচনা করেছেন, রাজার অকুণ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন। আর কিছু কাম্য তাঁর নেই।

—চুপ করে রয়েছো কেন কবি ?

—এবার মূলাজোড়ে ফিরে যেতে চাই মহারাজ।

—সে কি ? কৃষ্ণনগরে থাকবে বলে এসেছিলে।

ম্লান, বিমর্ষভাবে হাসেন ভারতচন্দ্র। আসল কথাটা চেপে রেখে জবাব দেন ;—থাকবো বলেই এসেছিলাম মহারাজ। কিন্তু এখন দেখছি থাকা সম্ভব নয়। বাড়ির জন্যে মন উতলা হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু বিশ্বাস করেন না ;—অন্যকোন কারণ নেই তো ? লুকিয়ো না।

মিথ্যা বলতে বাধে। অথচ সত্যি কথাটা বললেও মহারাজা অসন্তুষ্ট হবেন। বিশ্রী একটা সমস্যার ভেতরে পড়ে যান রায়গুণাকর।

অনুমান করেন কৃষ্ণচন্দ্র। মৃদুস্বরে বলেন ;—আপত্তি থাকে, বোলো না। তবে, এখন তোমার যাওয়া হতে পারে না। রাজবৈদ্য আগে চিকিৎসা করে তোমায় সারিয়ে তুলুন। তারপর যেয়ো। কোন আপত্তি করবো না।

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজ-রজস্য দধ্যৌ।
মেঘলোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিংপুনর্দূরসংস্থে॥

দেবাদিদেবের ডমরু নিনাদে যেন দিগ্বিদিক কাঁপতে থাকে। মাধবী-নিকুঞ্জে বসেছিলেন রায়গুণাকর। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটাও শিউরে ওঠে: দলবদ্ধ কালো মেঘ ধেয়ে আসছে মত্ত হস্তীযূথের মতো। দেখে মনে পড়ে যায় বিরহী যক্ষের কথা। আবার বর্ষা এসে গেল।

মূলাজোড়ে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'ল না। শরীরটাই বাদ সাধলো। রাজবৈদ্যও বলেছেন বহুমূত্র রোগ। এখন থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, পরে বিপজ্জনক হতে পারে।

শরীরের জন্যে অবশ্য চিন্তা করেন না কোন। যে জিনিসের শেষ পরিণতি হ'ল চিতার লেলিহান শিখায়, তার প্রতি আসক্ত হয় মূর্খেরা। তবু কষ্টটা অসহ্য লাগে। চিকিৎসা করাতেই হয়। মন আরো খারাপ হয় সেই কারণেই। শেকড় উঠে গেছে কৃষ্ণনগরের মাটি থেকে। তীব্র আকর্ষণে হাতছানি দিচ্ছে মূলাজোড়। বার্ধক্যের বারাণসী তাঁর। শ্রীমতীর জন্যে হৃদয়ের এক কোণে অলক্ষ্যে জমে উঠেছিল মৃদু বেদনার রাশি। বর্ষার ওই মেঘের মতোই। সেই গর্জনই যেন শুনতে পেলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় বিদ্যাসুন্দর গান হয় রাজসভায়। সব সংবাদই কানে আসে। বড় ইচ্ছে ছিল নিজের রচনা নীলমণির কণ্ঠে শুনবেন। কিন্তু সে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। অসুস্থতা তো আছেই। তার ওপর রয়েছে অস্বস্তি। মহারাজার সান্নিধ্যে কেন যেন আর আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন না। রাজসভাতেও যান না সেই কারণেই। ডেকে পাঠালে অবশ্য উপায় থাকে না, না যেয়ে।

দু-এক দিন যেয়ে দেখেছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি। প্রিয়ম্বদাকে সামনে বসিয়ে রেখে বিদ্যাসুন্দর গান শোনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। রাজনর্তকী নিজের থেকে গেলে অবশ্য কোন কথা ছিল না। কিন্তু তাকে জোর করে নিয়ে যাবার পেছনে যে বিকৃত লালসার ইঙ্গিত রয়েছে, সেটা অনুভব করেই ঘৃণায় গা শিউরে ওঠে। তারপর থেকে রাজসভায় যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। ঘরের ভেতর উঠে যান ভারতচন্দ্র।

সময় কাটতে চায় না আর। রাজবৈদ্য গোবিন্দরাম রায় অনেকটা সারিয়ে তুলেছেন তাঁকে। হাতযশ আছে গোবিন্দরামের। কিন্তু শারীরিক সুস্থ হওয়াটাই তো সব নয়।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে। শিল্পীর পক্ষে এর পর বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। সৃষ্টির উন্মাদনা নেই : অধীর প্রত্যাশা নেই। রহস্যহীন জীবনে জাবরকাটা শুধু।

নেহাত অভ্যাসবশেই তবু কলম ধরতে হয়। মানসিংহ কাব্যও প্রায় শেষ হয়ে এলো। ইচ্ছে ছিল, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহ এই তিনটি কাব্যকে একই মালায় গেঁথে রা::বেন তিন খণ্ডে। কিন্তু মর্মে মর্মে অনুভব করেন, লেখাই হচ্ছে শুধু; কাব্য হচ্ছে না মানসিংহ। যে রাজসভাকে এত অপছন্দ করেন, সেই রাজসভাই রাহুর মতো গ্রাস করে নিয়েছে তাঁকে। আর উদ্ধারের কোন উপায় নেই।

অবসর পেলেই প্রিয়ম্বদা আসে। তবু কিছুটা সময় কাটে কথা বলে। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে। কিন্তু কিছুই বলে না সে। ভালোও না, মন্দও না। কেবলই আরক্তমুখে প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

অবশ্য চাপা থাকে না কিছু। এই না-বলাটুকুই ধরিয়ে দেয়

সব। সার্থকতার আনন্দে মাতিয়ে তোলে। লজ্জারুণ স্মিতহাসি এবং তির্যক কটাক্ষের তিরস্কার যেন সব পাওয়ার চাইতে বড় হয়ে ওঠে। একঘেয়ে দিনগুলো সেই রোমন্থনেই কেটে যায়।

সেটাও অসহ্য লাগে একসময়। মানসিংহ কাব্যের শেষটুকু কিছুতেই যেন লিখতে পারেন না আর। কলম হাতে নিলেই বিরক্তি ধরে। মনটা ক্রমশ জড়পদার্থের মতো হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাও করতে চায় না।

বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। কোথা থেকে একটা ময়ূর আকুলকণ্ঠে ডেকে উঠলো। সে আহ্বানের সাড়া আসে অন্যদিক থেকে। গুরুগর্জনে মেদিনী কাঁপতে থাকে। মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসকে—

'ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক॥'

'ভারত না গেল দেশ'। বহুদিন পূর্বে নিজের লেখা কবিতার পদটা বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে যায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শ্রীরাধার অন্তরের বেদনা বহু যোজনের দূরত্ব অতিক্রম করে হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারে এসে আকুল আঘাত করছে। মূলাজোড়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে তাঁরও শ্রীমতী। এই বর্ষা কি তাকেও কাঁদাচ্ছে না? সব কান্নাই কি দেখা যায়; না, সব বলাই শোনা যায়?

এতদিন কেবল নিজের হৃদয়ের দিকেই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। রাধার অন্তরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন নি। আজ সেজন্যে আফসোস হয়। কর্তব্য অবশ্য করেছেন যথাসাধ্য। কিন্তু সেটাও যে লেন-দেনের হিসাবের মধ্যেই পড়ে। তার বাইরেও পড়ে রয়েছে অনেক কিছু; যা তিনি নিজে আশা করেছেন রাধার কাছে। মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারে না শ্রীমতী; কিন্তু অনুরূপ আশা কি সেও অন্তরে পুষে রাখে নি?

স্থির করেন, আর নয়। এবার সত্যিই ফিরে যাবেন মূলাজোড়ে।

সন্ধ্যার মুখে জলটা একটু ধরে এসেছিল। আবার বাইরে এসে বসেন রায়গুণাকর। মূলাজোড় এবং শ্রীমতী, দুজনে মিলে মনকে অধিকার করে বসেছে। একদণ্ডও আর ভালো লাগছে না এখানে। ভাবেন, আজই একবার যাবেন রাজসভায়। মহারাজার অনুমতি নেওয়া দরকার। তারপরই রওনা হবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। রাজবাড়ির নহবৎখানায় এখুনি শুরু হবে শানাইয়ের ঐকতান। মহারাজার কাছে যেতে হলে আর দেরি করা চলবে না। কখন আবার বৃষ্টি নামবে ঠিক নেই।

ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু ওঠা হয় না। হীরার কর্কশ গলা শোনা যাচ্ছে। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই।

ঠিকই অনুমান করেছিলেন। একটু বাদেই খোজা পীরবক্সকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দেয় রাজনর্তকী।

বিস্মিত হন রায়গুণাকর। সন্ধ্যাবেলা রাজসভা ছেড়ে এখানে এসেছে প্রিয়ম্বদা। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক লাগে। বিশেষ করে যখন বিদ্যাসুন্দর গান হচ্ছে। রাজার আদেশে তাকে সভায় হাজিরা দিতে হচ্ছে প্রতিদিন।

হন্তদন্ত হয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় রাজনর্তকী ;—কেমন আছো আজ ?

—ভালো ; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা রাজসভা ছেড়ে এখানে ?

—জরুরী কথা রয়েছে। ভেতরে চলো।

গলাটা কেমন বেসুরো ঠেকে। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন ভারতচন্দ্র। এতখানি বিচলিত হতে রাজনর্তকীকে দেখেন নি কোনদিন। জিজ্ঞাসা করেন ;—কি হয়েছে বলো তো ?

—অনেক কথা আছে। ভেতরে চলো।

—তবে একটু দাঁড়াও। আলো জ্বালি।

—আমি জ্বেলে দিচ্ছি। পীরবক্সকে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে বাঈজী। প্রদীপ ধরিয়ে একটা আসন টেনে নিয়ে বসে পড়ে;—মহারাজা নেই। তাই আসর কয়েকদিন থেকে বন্ধ রয়েছে।

—নেই? কোথায় গেছেন?

—মুর্শিদাবাদ। কেন, তুমি জানো না?

—কি করে জানবো বলো। ওদিকে যাই না বহুদিন।

—তবু খবর পাও নি?

—না। মৃদু হাসেন রায়গুণাকর;—বোধ করি ভুলেই গেছে যে পঞ্চরত্নসভার এক অভাজন সদস্য এই জঙ্গলের ভেতর পড়ে রয়েছে। অতএব খবরও দেয় নি।

কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান;—তবে, আজ একবার যাবো ভাবছি।

প্রিয়ম্বদা কিন্তু লক্ষ্য করে না ভাবান্তরটুকু। কথাটাকেও নয়। ক্ষণেক চুপ করে থেকে বলে;—বড় দুশ্চিন্তার ভেতরে পড়েছি কবি। উপায় না দেখে তোমার কাছে এলাম।

—আমার কাছে এসেছো উপায়ের জন্যে? অনেকদিন পর রায়গুণাকর প্রাণ খুলে হাসেন।

—তামাসা নয়; ঠিকই বলছি, যদি কেউ এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, সে তুমি।

রসিকতার মতো সত্যিই শোনায় না। মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিটাকে চেপে যান ভারতচন্দ্র;—আমি যে কারো উপকারে লাগতে পারি তা জানতাম না। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি আমি একটা অকর্মণ্য, অপদার্থ, কত কিছু।

—যে একথা বলেছে, সে তোমায় চেনে নি। ওসব বাদ দাও। আপাতত যে বিপদে পড়েছি, তাতে একমাত্র তুমিই কিছু সুরাহা করতে পারো। বলো, করবে?

—ব্যাপারটা শুনি আগে ?

—সবই বলবো ; নইলে উপায় বার করবে কি ভাবে। তা ছাড়া বলতেও কোন বাধা নেই তোমায়।

শেষ শব্দটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বলে রাজনর্তকী। রায়-গুণাকরের চোখ দুটো আবার ঝিকমিক করে ওঠে ;—এত বিশ্বাস ?

—হ্যাঁ। জানি, দ্বিতীয় কোন লোকের কানে উঠবে না। সে ভরসা না থাকলে ছুটে আসতাম না এখানে।

—নিজেকে যথার্থই একজন কাজের লোক বলে মনে হচ্ছে এখন। গর্বও হচ্ছে।

—আবার রসিকতা শুরু করলে ?

—না ; এই চুপ করলাম। এবার বলো।

—ব্যাপারটা রাজনৈতিক।

—রাজনৈতিক ? চমকে ওঠেন রায়গুণাকর। ঝিকমিক চোখ দুটো কঠিন হয়ে যায়। স্থিরকণ্ঠে বলেন :—ক্ষমা কোরো আমায়। সেদিনই তো বলেছি, ও সমস্ত হীন ব্যাপারের ভেতর আমি নেই। সইতে পারি না।

—কিন্তু অন্যায় হচ্ছে যেখানে ?

—রাজনীতি মানেই হ'ল অন্যায়, স্বার্থপরতা, কু´ লতা এবং চক্রান্ত।

—তা ঠিক ; প্রিয়ম্বদাও সায় দেয় ;—কিন্তু অন্যায় হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকবে ? সে যে আরো খারাপ ; পাপ।

—তার আমি কি করতে পারি ? অন্যায়ের বিচার করতে রাজা রয়েছেন। আমি সামান্য কবি। শক্তিই বা কতটুকু, সামর্থ্যই বা কি। আমার হাতের মধ্যে হলে তবু না হয় দেখা যেত।

—তোমার হাতের মধ্যেই হচ্ছে কবি। ঘোরতর অন্যায়। বিনা প্রতিবাদে এ জঘন্য অন্যায় মেনে নিলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলার কলঙ্ক কখনো মুছবে না। সেইসঙ্গে তোমারও।

—উত্তেজিত করতে বৃথা চেষ্টা করছো। ওসব শুনে এবং সয়ে চামড়া আমার মোটা হয়ে গেছে। আর দাগ কাটে না।

—সব শুনেও যদি দাগ না কাটে, তবে বুঝবো সত্যিই চামড়া তোমার মোটা হয়ে গেছে। শুধু চামড়াই নয়, বুদ্ধিও। ওই রাজসভার সঙ্গে সত্যিই তুমি মিশে গেছো। হারিয়ে ফেলেছো নিজেকে।

গভীর উত্তেজনায় মুখখানা লাল হয়ে ওঠে রাজনর্তকীর। চাপা স্বর বলে ;—জানো, বাংলার আকাশে দুর্যোগের মেঘ দেখা দিয়েছে ?

—না প্রিয়ম্বদা ; ও সমস্ত খবর রাখি না। রাখতেও চাই না। পিতার রাজ্যনাশের সাথে যে অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেছে, তার পাতা খুলতে চাই না আর।

—না চাইলে চলবে কি করে ? তুমি কবি ; দেশের সঙ্গে তোমার নাড়ির যোগ। ইচ্ছে থাকলেও, অস্বীকার করতে পারো না যে।

যুক্তিটাকে আর ঠেলে ফেলতে পারেন না রায়গুণাকর। চিন্তিতভাবে মাথা নাড়েন ;—মানলাম। এবার আগে কহ আর।

—কলকাতায় ফিরিঙ্গী বেনেদের একটা আড্ডা গড়ে উঠেছে শুনেছো ?

—কানে এসেছে বটে।

—তারাই রয়েছে এসব কিছুর মূলে।

—কি রকম ?

—নবাব আলিবর্দী খাঁ অসুস্থ। বোধ হয় আর বাঁচবেন না। তাঁর পরে নবাব হবেন সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু তিনি যাতে মসনদ না পান, সেই ষড়যন্ত্র চলছে।

—তাতে তোমার-আমার কি আসে-যায় ? শুনেছি, সিরাজ একটা অমানুষ। তা'ছাড়া, বাংলার গদিতে সিরাজই বসুক, কি অন্য

কেউ বসুক, আমাদের পক্ষে সব সমান। কোন বাঙালী বসছে না, এইটাই দুঃখ।

—বাঙালী মরে গেছে কবি।

কথাটা সামান্য। নেহাত তর্কের খাতিরেই বলেছিল বাঈজী। কিন্তু আহত সাপের মতো গর্জে ওঠেন রায়গুণাকর;—মিথ্যা কথা। বাঙালী মরে নি; মরতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ঘুম ভাঙাতে হবে।

রাজনর্তকী শান্তভাবে শোনে। তারপর বলে;—বেশ, স্বীকার করলাম।

—তুমি অস্বীকার করলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না কোন। নিজের মধ্যেই ফুঁসতে থাকেন রায়গুণাকর;—কতগুলো স্বার্থলোলুপ বিদেশী বাঙলার বুকের ওপর বসে এই সমস্ত কুৎসা রটাচ্ছে। তাই বিশ্বাস করো তোমরা।

প্রিয়ম্বদা অপ্রস্তুতভাবে হাসে;—এই সামান্য কথায় এত চটে গেলে?

—কথা সামান্যই; কিন্তু অর্থ বড ভয়ঙ্কর।

—ঘাট মানছি কবি। ভুল হয়েছে আমার।

ভারতচন্দ্র অনেকটা শান্ত হন;—এ ধরনের ইঙ্গিতে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে আমার। যাই হোক; তারপর ব[illegible]না।

—বাঙালী ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু যতদিন ঘুম না ভাঙে, ততদিন অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু যেন পাই, যে এই দেশের লোকই রাজত্ব করছে।

—কিন্তু ওরা এদেশের লোক কোন কালেই ছিল না।

—ছিল না; কিন্তু এখন হয়েছে। এই দেশই তাদের ঘর-বাড়ি; এই দেশের মাটিতেই তাদের শেকড়; শেষ আশ্রয়। এটা তো অস্বীকার করতে পারো না।

—তা অবশ্য পারি না।

রাজনর্তকী উৎসাহিত হয়ে ওঠে;—আজ ষড়যন্ত্র চলছে, ওই

বিদেশী ইংরেজদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে। যারা এখানে এসেছে শুধু লুট করতে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। এবং সবচাইতে বেশি আফসোস, আমাদের মহারাজা রয়েছেন এর গোড়ায়। আর রয়েছেন জগৎশেঠ এবং মীরজাফর আলী খাঁ।

বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন রায়গুণাকর ;—কেন ?

—নাটোরের মহারাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে সিরাজ হীরাঝিলে নিয়ে যাবার কুৎসিত প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেই অপরাধে। তা'ছাড়া, সেদিন নাকি দরবারের মধ্যে জগৎশেঠকে চড় মেরেছে।

—সিরাজের মতো জানোয়ারের মৃত্যুই ভালো প্রিয়ম্বদা। নইলে, নবাব হয়ে আরো কি অত্যাচার করবে, ভগবানই জানেন।

—ওকথা বলো না কবি।

—কেন ?

প্রশ্ন করেই হতবাক্ হয়ে যান ভারতচন্দ্র। বাঈজীর অনিন্দ্য-সুন্দর ছ'চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে। সবিস্ময়ে আবার জিজ্ঞাসা করেন ;—তুমি কাঁদছো ?

প্রিয়ম্বদা হাসে। হাসি-কান্না মিশে অপূর্ব সুন্দর লাগে দেখতে। অবরুদ্ধ স্বরে জবাব দেয় ;—সব শুনলে তুমিও স্থির থাকতে পারবে না কবি।

আঁচল দিয়ে চোখ ছুটো মুছে নেয় ;—সবই বলবো তোমায়। কিন্তু কথা দাও, মহারাজকে বুঝিয়ে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। শুনলে একমাত্র তোমার কথাই শুনতে পারেন।

একটু দম নিয়ে আবার বলে ;—একজনের দোষে সারা দেশটার সর্বনাশ করবে ? অনেক দোষ রয়েছে সিরাজের। সে পশু, নীচ, লম্পট। কিন্তু, তবুও এই দেশেরই লোক। বিদেশের দেবতার চেয়ে নিজের দেশের দানবও যে অনেক ভালো কবি।

ভারতচন্দ্র স্পষ্টতই চমকে ওঠেন কথাটা শুনে। বড় ভালো লাগে। বড় নতুন।

রাজনর্তকীর গলাটা ধরে আসে ;—তার আগে আমার একটা অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেবো তোমার কাছে।

—অপরাধ ?

—হ্যাঁ কবি ; তোমায় আমি প্রতারণা করেছিলাম।

—প্রতারণা ? আমাকে ?

—হ্যাঁ ; প্রেমের অভিনয় করেছিলাম তোমার সঙ্গে। আমার প্রথম দিনের কথাটাই সত্যি ছিল। প্রেম আমি কাউকে দিতে পারবো না।

—অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের দানটা মিথ্যে ছিল, এই তো ? স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন রায়গুণাকর।

প্রিয়ম্বদা অবাক্ চোখে তাকায় ;—সেই অপরাধেরই ক্ষমা চাইছি আজ। সেদিন ওভাবে ছলনা না করলে, বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখতে পারতে না। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম তোমার হৃদয়ে। বলো, ক্ষমা করলে ?

—যদি তাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, তা'হলে ক্ষমা করলাম। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না তার।

—কেন ?

—আগেই সন্দেহ হয়েছিল। স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। আজ নিশ্চিন্ত হলাম।

রাজনর্তকীর আয়ত চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে ;—প্রতারণা করেছি জেনেও নিশ্চিন্ত হলে ?

ব্যথিত একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় ভারতচন্দ্রের মুখে। ম্লান স্বরে জবাব দেন ;—হ্যাঁ. আমার ধারণার সঙ্গে তোমার প্রেম নিবেদনকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। জানতাম তুমি অভিনয় করেছিলে, তবুও কেন জানি না বিশ্বাস করতে পারি নি।

—ধারণাটা কি কবি ?

—মেয়েরা প্রেম দিতে পারে না। বিশেষ করে বাঈজীরা। পুরো জীবনটাই যে তাদের অভিনয়।

এতক্ষণ আকাশ থমকে ছিল। মেঘের দল কখন ছেয়ে ফেলেছে নিশ্ছিদ্ররূপে। চাপা গম্ভীর শব্দে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

ক্ষণতরে নির্বাক্ হয়ে গিয়েছিল প্রিয়ম্বদা। পরক্ষণেই যেন আর্তনাদ করে ওঠে ;—না কবি, না। তোমার ও ধারণা ভুল।

—আর অভিনয় করো না। যা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাকে ঢাকবার চেষ্টা করে কি হবে ?

দু'হাতে মুখ ঢেকে থরথর কেঁপে ওঠে বাঈজী। কাঁদছে ; নিঃশব্দে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে হৃদয়-বেদনা। ভাষাহীন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন রায়গুণাকর। অনেকক্ষণ। তারপর মৃদু হেসে ব্যথিতস্বরে বলেন ;—কেঁদো না প্রিয়ম্বদা। অভিনয় হলেও, যে মাধুর্যে আমার হৃদয় ভরে দিয়েছিলে, তা কোনদিন ভুলবো না। মাধুর্যটুকু তো আর অভিনয় ছিল না।

আর নিজেকে সামলাতে পারে না রাজনর্তকী। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে ;—আমার দোষে সারা মেয়ে জাতটাকে দোষ দিও না কবি। মেয়েরা পারে ভালোবাসতে। নিজেদের বিলিয়ে দিতে। এমন কি বাঈজীরাও।

একটু থেমে কান্নার বেগটা সংযত করে নেয় ;—কিন্তু আমি বড় অসহায় কবি। তুমি জানো না কেন প্রেম দিতে পারি না। কাউকেই নয়। কারণ এই হৃদয়, এ হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি সেই লম্পট, পশুর পায়ে। দেবার মতো যে আর কিছুই বাকী নেই।

—সিরাজ ? বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন রায়গুণাকর।

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় প্রিয়ম্বদা ;—আস্তে কবি, অত জোরে বলো না। কেউ শুনে ফেলবে। জানতে পারলে আমায় খুন করে

ফেলবে সিরাজ। এতো ভালোবাসি, তবু দয়া করবে না। ফয়জান বাঈয়ের ব্যাপারটা তো তোমায় সেদিন বলেছি।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন বোবা হয়ে যান রায়গুণাকর। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না কোন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন ;—সেদিনের গল্পটা তা'হলে বানানো ছিল না।

—একটা বর্ণও নয় কবি।

—কিন্তু, তুমি হীরাঝিলে গেলে কি করে ?

—কপালের লেখা। বাধা দেবো কি করে। নইলে মায়ের পেটের ভাই, নিজে হাতে করে আমায় তুলে দিয়ে আসে হীরাঝিলে।

—নিজের ভাই ? ঘৃণায় যেন ককিয়ে ওঠেন ভারতচন্দ্র।

—হ্যাঁ কবি। সেদিন আমিও লজ্জায়, দুঃখে মরে গিয়েছিলাম। সারারাত ধরে অভিশাপ দিয়েছিলাম ভাইকে। নিজের ভাই হয়ে যা করলো, তার চাইতে গর্হিত আর কিছু হতে পাবে না। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল পৃথিবীর ওপর। স্বার্থের জন্যে মানুষ কি না করতে পারে। সামান্য অনুকম্পা লাভের জন্যে বোনকে তুলে দিল একজন লম্পট. পশুর হাতে !

—আশ্চর্য !

প্রিয়ম্বদা হাসে ;—জীবনের অনেকগুলো উঁচু-নিচু পথ পার হয়ে এসে আজ কিন্তু অন্যরকম মনে হয়। আমার ভালোর জন্যেই অমন কাজ করেছিল বেচারি। অভাগিনী বোনের দুঃখ সইতে পারে নি। তাই সত্যিকারের চেয়েছিল সুখী করতে। সেই আন্তরিক উদ্দেশ্যেই সোজা আমায় নিয়ে তুলেছিল হীরাঝিলে। ইংরেজ-কুঠির মেলা দেখাবার নাম করে।

—কিন্তু সিরাজ তো তোমায় আটক করেছিল। বাঁচলে কি করে ?

—পালিয়ে বাঁচলাম। ফয়জান বাঈয়ের অমন নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। যতই ভালোবাসুক সিরাজ, আমার

কপালেও ওইরকম মৃত্যু লেখা আছে। সিরাজকে ভালোবাসি আমি। কিন্তু তার বিনিময়ে জীবনকে নষ্ট করতে পারবো না। মনে হয়, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি এই পৃথিবীকে, উষ্ণ জীবনকে। তাই মরতে পারি নি সেদিন।

—পালালে কি ভাবে?

—পালালাম; কারণ পাহারা বসালেও, একটা কথা সিরাজ বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল। প্রাসাদের গুপ্ত পথ-ঘাটগুলো বড়াই করে নিজেই দেখিয়েছিল আমায়। কাজে লেগে গেল তাই। তা'ছাড়া মোহনলালের বোন আমি। সিরাজের সৈন্যবিভাগে মোহনলালের প্রতিপত্তি তখন উঠতির মুখে।

—মোহনলাল তোমার ভাই? রায়গুণাকর আবার চেঁচিয়ে ওঠেন।

অতি দুঃখে হাসে প্রিয়ম্বদা। করুণ অসহায় লাগে সে হাসি। বলে;—হ্যাঁ; সিরাজের সবচেয়ে বড় বন্ধু, যাকে সে সবচাইতে বেশি বিশ্বাস করে, সেই মোহনলালের বোন আমি।

—আর তোমারই সর্বনাশ করলো সিরাজ!

—না কবি; সর্বনাশ করে নি। বরং জীবনের আলো নতুন করে তুলে ধরেছিল চোখের সামনে। তুমি হয়তো মুখ বাঁকাবে। ভুল করেছি। জঘন্য অন্যায় করেছি ওই ঘৃণ্য পশুকে ভালোবেসে। কিন্তু হৃদয়ের ওপর যে কোন হাতই নেই আমার।

নিজের অন্তরের হাহাকারটাকেই যেন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন ভারতচন্দ্র। মহারাজার কাছে একদিন তিনিও হৃদয় উন্মুক্ত করে ধরেছিলেন। বলেছিলেন এই একই কথা। হৃদয়ের ওপর তাঁর কোন কর্তৃত্বই নেই। সেখানে তিনি বড় অসহায়।

—তা'ছাড়া, নিজের লোকদের স্বরূপ যে আরো ভালো করে দেখেছি কবি। সে আরো ভয়ঙ্কর।

বীভৎস ঘটনাগুলো মনে করে এতদিন পরেও শিউরে ওঠে বাঈজী;—মারাঠা দস্যুরা বাংলাদেশের কত অসহায় নারীর জীবন

নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সে কথা তো বলে না কেউ। সিরাজ তো তাদের তুলনায় অনেক ভালো।

রূপকথার কোন গল্পের সামনে যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রায়গুণাকর। প্রিয়ম্বদা বলে যায় ;—ভাস্কর পণ্ডিতের অনুচরেরা একদিন চরম সর্বনাশ করেছিল এমনি একজন অসহায় হিন্দু মেয়ের। আজ যে লোক সিরাজউদ্দৌলার প্রাণের বন্ধু, সেই মোহনলালের বোন ছিল বেচারি মঞ্জুশ্রী। হিন্দু বলে এতটুকুও দয়া করে নি মারাঠারা। তাদেরই বা শুধু দোষ দেব কেন? হিন্দু-সমাজও কোন দয়ামায়া করে নি তার ওপর। বলতে পারো কবি, সেই অভাগী যদি তারপরও হিন্দুত্বের বড়াই না করে, তবে তার অপরাধ কোথায়?

স্তম্ভিত ভারতচন্দ্রের মুখে এতক্ষণে কথা ফোটে ;—তোমাকে?

—হ্যাঁ কবি, আমাকে। এই জীবনে কতকিছু দেখলাম। কত নীচতা, কত পশুত্ব, কত মহত্ত্ব। দেখলাম, এ সমস্ত দোষগুণ ধর্মের বাছ-বিচার করে না। হিন্দু আমার সর্বনাশ করলো, হিন্দু-সমাজ আমাদের ত্যাগ করলো। হিন্দুর অত্যাচারেরই ফলভোগ করলো আর একটা হিন্দু-পরিবার। বলতে পারো কবি, কেন?

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে গাল দুটো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাঈজী। হৃদয়ের অবরুদ্ধ প্রশ্নগুলোকে তদিন পর উন্মুক্ত করে দেয়—কেন?

আবার সেই অচলায়তন সমাজের অত্যাচার। ঘুণধরা নিবীর্যের আস্ফালন। নিজের বিগত জীবনের পৃষ্ঠাগুলো যেন ছড়িয়ে পড়ে চোখের সামনে। একই প্রশ্ন সেখানেও উদ্যত হয়ে রয়েছে—কেন?

অসহায় কান্নায় লুটিয়ে পড়েছে রাজনর্তকী। চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে ভারতচন্দ্রের। পরক্ষণেই আগুনের শিখা দেখা দেয় ;—কেঁদো না প্রিয়ম্বদা। যে সমাজ ধ্বসে পড়ছে, তার কথা ভেবে লাভ নেই।

—ভাবতে যে হয় কবি? সেদিন যদি আমায় ঠেলে ফেলে না

দিত, তবে জীবন আমার অন্যরকম হ'ত আজ। ছোট্ট একটা সুখের সংসার গড়ে তাইতে ডুবে থাকতাম। কার কি ক্ষতি হ'ত তাতে?

একটু বাদে আবার বলে ;—মুসলমান সিরাজও আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করলো আমায় মাথায় তুলে নিয়ে। মাথায় তুলে নেওয়াই বলবো। তার কাছে অন্তত নারীত্বের যে সম্মানটুকু পেয়েছি, কোন হিন্দুর কাছে তা পাই নি। বলতে পারো, কে মহৎ, আর কে নীচ? তবু ভালো-মন্দের সংজ্ঞাগুলোকে মানুষ বদলায় না কেন?

আবার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় সব ;—সেইজন্যেই সিরাজের প্রাণভিক্ষা করছি কবি। বলো, তুমি সাহায্য করবে? বলো, কিছু অন্যায় করেছি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসেন রায়গুণাকর ;—অন্যায় অবশ্য দেখছি না কিছু। শুধু আশ্চর্য হচ্ছি তোমার ভুল দেখে।

—ভুল?

—হ্যাঁ। সমাজকে সমর্থন আমি করছি না। কিন্তু সিরাজকেও যে সমর্থন করতে পারছি না। প্রেম হ'ল স্বর্গীয় জিনিস। তাই কিনা বিলিয়ে দিলে একটা পশুকে। সুযোগ পেলে তোমার প্রাণ নিতেও কুণ্ঠিত না যে জানোয়ার, তাকে এখনো ভালোবাসো? না প্রিয়ম্বদা ; এ যুক্তি ঢুকছে না আমার মাথায়।

—তবে কি করতে বল আমায়? প্রতিশোধ নিতে?

—তা বলতে পারি না। সব ঘটনা না শুনে রায় দেওয়া মুস্কিল। তা'ছাড়া তুমি মেয়েছেলে।

—নিজের কলঙ্কের কথা নিজের মুখে বলতে পারবো না কবি। আর, জেনেই বা তুমি কি করবে? মোটামুটি তো শুনলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনে বলে ;—আশ্চর্য ; কবি হয়েও একটা জিনিস আজো বোঝো নি। প্রেমের পথ হিংসার নয় ; লাভ-লোকসানের নয় ; লেন-দেনের নয়। কী পেলাম সেটা বড় কথা নয় ; বড় কথা হ'ল কী দিলাম।

রায়গুণাকর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ;—যে আমাকে ভালোবাসে না, তাকে ভালোবাসতে হবে ?

চোখ দুটো মুছে নিয়ে রাজনর্তকী হাসে ;—তোমার কথা অবশ্য জানি না। তবে সত্যিকারের প্রেম যদি তোমার হৃদয়ে থাকে, তবে অপর পক্ষ ভালোবাসলো কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর। আসল কথা হ'ল, তুমি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছো কিনা ?

—কিন্তু—

প্রিয়ম্বদা বাধা দেয় ;—মনে আছে, বউয়ের কথা একদিন বলেছিলে আমায়। তার নাকি হৃদয় নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন। তার না হয় নেই। তোমার আছে কিনা কখনো ভেবে দেখেছো ?

—মানে ? ভারতচন্দ্র চমকে ওঠেন।

—কিছু মনে করো না কবি ; তুমি একজন স্বার্থপর। সারা জীবন শুধু নিজের কথাই চিন্তা করেছো। কি পেলে, কি পেলে না, কেবল সেই হিসাব। কিন্তু, সে কি পেয়েছে, তা ভাবো নি।

—সে তো সবকিছুই পেয়েছে। ঘর, সংসার, সন্তান—

—এসব তো এই সেদিন। তার আগে সে পেয়েছিল স্বামী। নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো তো, স্বামী হিসাবে কি দিয়েছো তাকে ?

ভারতচন্দ্র বিমূঢ় হয়ে যান। নিজেকে সত্যিই কোনদিন বিচার করেন নি এভাবে ; এইদিক থেকে। সেই ভুলটাকেই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রিয়ম্বদা।

—ভেবে দেখো, বিয়ের পরদিনই সে বেচারিকে ফেলে চলে গিয়েছিলে। বহু বছর পর, একদিনের জন্যে দেখা দিয়েই আবার উধাও। তোমাকে চেনবারই তো সুযোগ পেল না ভালো করে। বলবে, ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে। কিন্তু শুধু ভালোবাসাটাই তো শেষ নয় ; সবথেকে বড় হ'ল ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখা।

নির্বাক্ হয়ে বসে থাকেন রায়গুণাকর। বাঈজী লক্ষ্য করে। আবার বলে ;—কি কথা থেকে কি কথায় এসে গেলাম। আমার ইতিহাস তো শুনলে। বলো, অনুরোধ রাখবে ?

—কোন্ অনুরোধ ?

—এর মধ্যেই ভুলে গেলে ?

বলতে বলতে হাত দুটো চেপে ধরে ;—ভুল যদি করেও থাকি কবি, আর উপায় নেই। তাকে ভালোবেসে আমি নিজেকে শেষ করে দিয়েছি। শেষদিন পর্যন্ত এইভাবেই দিয়ে যাবো। অন্তরের দিক থেকে বেশ্যা হতে পারবো না। আমার জীবনে এইটাই সবচাইতে বড় স্বার্থকতা ; একমাত্র আনন্দ।

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। জীবন সত্যের একটা নতুন জানালা খুলে দিয়েছে রাজনর্তকী। রাধার জন্যে অন্তরে একটা বেদনা অনুভব করেন রায়গুণাকর। সেইসঙ্গে আনন্দ। অভিভূত স্বরে জবাব দেন ;—বলবো প্রিয়ম্বদা ; কথা দিলাম।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন কবি। আর কি বলতে পারি।

—আর কিছু বলবার দরকারও নেই মঞ্জু।

প্রিয়ম্বদা আঁতকে ওঠে,—ও নামে ডেকো না কবি।

—কেন ?

—মঞ্জু পৃথিবীর কাছে মরে গেছে। বেঁচে রয়েছে শুধু একজনের হৃদয়ে। তাকেই ডাকতে দাও ও নাম ধরে।

—আর, আমি ?

অপূর্ব সুন্দর করে হাসে রাজনর্তকী ;—একটা নাম তো দিয়েছো।

—ওটা পোষাকী ; সকলের জন্যে। নিজের জন্যে একটা দিতে ইচ্ছে করছে। যা শুধু আমিই ডাকবো।

—যা ইচ্ছে হয় দাও।

—প্রিয়া। আপত্তি নেই তো ?

রাজনর্তকী আরক্ত হয়ে ওঠে ;—খুশী যদি হও, তাই বলো।

রাজপ্রাসাদের পেটা ঘণ্টায় ঘা পড়ে। দশটা বাজলো। বৃষ্টিটাও ধরেছে। প্রিয়ম্বদা উঠে পড়ে ;—এবার যাই ?

—এসো প্রিয়া। নিশ্চিন্ত থেকো, মহারাজা ফিরলেই বলবো তাঁকে।

যেতে গিয়েও ফিরে তাকায় প্রিয়ম্বদা। চোখ দুটো আবার জলে ভরে আসে। ধরা-গলায় বলে ;—আমায় ক্ষমা কোরো কবি।

বলেই আর দাঁড়ায় না। উদ্যত কান্নাটাকে চেপে স্খলিতচরণে নেমে যায় বাগানের মধ্যে।

উদ্বেলিত অশ্রুর মেঘ বুকে নিয়ে ফিরে আসে প্রিয়ম্বদা। এ অশ্রু আজকের নয় ; বহুদিনের। এতদিন বাইরে প্রকাশ পায় নি। চাপা ছিল শুধু। বাঈজীর কঠিন আবরণের নীচে সারাজীবন ধরে কেঁদেছে মঞ্জুশ্রী। বেদনার কান্না এবং আনন্দের কান্না দুই-ই। বাইরে যখন ফুটে উঠেছে হাসির রোদ, অন্তর তখন ঝাপসা হয়ে গেছে অবিরল অশ্রুধারায়। জের তার মিটল না আজো।

বরং গভীরতর হয়েছে। কান্নার সঙ্গে এসে জট পাকিয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। নিদ্রাহীন কত রাত কেটে গেছে সেই গোলক-ধাঁধায়। জবাব মেলে নি। যে প্রশ্নের সামনে ভারতচন্দ্র আজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, সেই একই প্রশ্ন করেছিল অনেককে। উত্তর দিতে পারে নি কেউ। ভয়ে কেবল নিঃশব্দে সরে গেছে সামনে থেকে। সমাজের অনুশাসন বড় ভয়ানক। নিষ্ঠুর সে হাতের থাবা থেকে আত্মরক্ষা করাই হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ। সমাজ-চ্যুত অভিশপ্ত পরিবারটির সংস্পর্শ এড়িয়ে তাই বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই। একমাত্র মোহনলালই সাহস করে প্রকাশ করেছিল মনের কথাটা—জানোয়ারের জাতও নেই, ধর্মও নেই।

মেঘে ঢাকা গভীর অন্ধকার রাত। ঘুম আসে না চোখে। জানালার ধারে বসে নিবিষ্টমনে চিন্তা করে যায় প্রিয়ম্বদা। সব কথা খুলে বলতে পারল না রায়গুণাকরকে। অথচ বলবে বলেই গিয়েছিল।

পারল না, কারণ এতদিন পৃথিবীর চোখে মঞ্জুশ্রী ছিল মৃত।

কবির সঙ্গে দেখা হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও। কিন্তু অবুঝ ভারতচন্দ্র একটিমাত্র সম্বোধনে আবার জাগিয়ে দিলেন তাকে। মঞ্জুশ্রী। কত মধুর অথচ কত রক্তাক্ত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এ ডাকের সঙ্গে। নতুন প্রাণের স্পর্শে আবার চঞ্চল করে দিয়েছে তাকে।

ঘুম আসে না, কারণ জীবন এমন এক চৌমাথায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে পথ স্থির করা কঠিন। সিরাজের মাথার ওপর নেমে এসেছে কঠিনতম দুর্যোগ। ঘৃণা করে তাকে মঞ্জুশ্রী। সমস্ত অন্তর দিয়ে। কিন্তু সেইসঙ্গে আর একটা জিনিসও অনুভব করে। ভালোবাসে তাকে। ঘৃণার মতোই অপ্রতিরোধ্য সে ভালোবাসার আবেগ। সেই কথাটুকুই শুধু বলতে পারল রায়গুণাকরকে। তার বেশি নয়।

পথের নিশানার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে প্রিয়ম্বদা। ফেলে আসা দিনগুলোকে বারংবার হাতড়াতে থাকে তন্নতন্ন করে। যদি কোন হদিস মেলে। সিরাজের জন্যে নিশ্চিন্ত জীবনকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে তাকে। অতীতের পাতাগুলো সারবন্দীভাবে মেলে ধরে খুঁজতে থাকে সেই প্রশ্নের জবাব।

একমাত্র ভাইয়ের জন্যেই আশ্রয়হারা হতে হয় নি তাকে। চিরকালই একরোখা প্রকৃতির লোক ছিল মোহনলাল। সমাজের বিধানের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিল। রোখের মাথাতেই চাকরি নিয়েছিল নবাবের সৈন্যবিভাগে। প্রতিজ্ঞা করেছিল উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে মারাঠাদের ওপর। না নিয়ে সংসারী হবে না কোনদিন।

হয়ও নি। আজো বোধ হয় তেমনি দুর্দান্ত, বাউণ্ডুলে রয়ে গেছে ভাইটি। মনে হতেই চোখে জল এসে যায়। ক'বছরেরই বা বড় হবে তার চেয়ে। পিঠোপিঠি দুই ভাইবোন ছিল বন্ধুর মতো।

সেই ঘটনার পর হতে মোহনলালের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে

ছিল প্রতিশোধ। নবাব আলিবর্দী উঠে-পড়ে লেগেছিলেন বাংলাদেশ থেকে মারাঠাদের সমূলে উচ্ছেদ করতে। একই চিন্তা তারও হৃদয়ে অহরহ জ্বলছিল। সেই মতলবেই ক্রমশ অন্তর জয় করে ফেলেছিল ভবিষ্যত নবাব সিরাজউদ্দৌলার। সিরাজ নবাব হলে, তার সেনাপতিত্ব কেউ আটকাতে পারবে না।

আটকাতে যে পারবে না, সেটাও বুঝে নিয়েছিল সবাই। দরবারের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত। সমীহ করেও চলতো সেই কারণেই। উদ্ধত ভবিষ্যত নবাবের একমাত্র বন্ধু যে সর্বক্ষণ ছায়ার মতো পাশে থাকতো; এখনো থাকে, সে হিন্দু মোহনলাল; কোন মুসলমান নয়। তবু লোকে নিন্দা করে সিরাজের। বদনাম দেয়।

এত চেষ্টা করেও মোহনলাল কিন্তু নিজের বোনের দুর্ভাগ্যকে রোধ করতে পারল না। পারলে আজ এইভাবে নাম ভাঁড়িয়ে বাঈজীর ছদ্মবেশে কৃষ্ণনগরে এসে বসতে হ'ত না। হ'ত অন্যরকম। কৃষ্ণনগরের পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ। চেহেলস্তুন প্রাসাদে লুৎফউন্নিসা বেগমের বদলে থাকতো অন্য নারী। অসম্ভব দুরাশা কিছু ছিল না। দিল্লীর শাহী-প্রাসাদে এমন অনেক হিন্দু রমণীর নাম আজো শোনা যায়। তাদের প্রতাপে হিন্দুস্তান এক সময়ে কেঁপে উঠেছে।

চিন্তার কোন খেই পেত না মঞ্জুশ্রী। হিন্দুসমাজ তাদের ত্যাগ করেছিল। আঘাতটা সবথেকে বেশি লেগেছিল বাবার। একে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তায় অত বড় আঘাতটা এসেছিল স্বধর্মী মারাঠাদের কাছ থেকে। ভাস্কর পণ্ডিতের ওপর বড় আস্থা ছিল তাঁর। প্রায়ই বলতেন, হিন্দু-শক্তিকে আবার দাঁড় করাচ্ছেন। ইসলামের বদলে গৈরিক পতাকা উড়বে ভারতবর্ষে।

সে আশার মূলে কুঠারাঘাত হ'ল। শুধু যে আশার প্রদীপটাই নিভলো, তাই নয়। বিশ্বাসঘাতকতার মর্মবেদনাও দিয়ে গেল সেইসঙ্গে। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একদিন সর্বস্বপণ করেছিলেন শিবাজী। তিনি ছিলেন মহাপুরুষ। নারীর সম্মান

তাঁর কাছে ছিল দেবী ভগবতীর সমান। আজ সেই দেশেরই মানুষের কাছে নারীর মূল্য দাঁড়িয়েছে ভোগ্য পণ্যরূপে।

বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে যেত। বৃদ্ধ পিতার সেই অসহায় মূর্তি যেন স্পষ্ট দেখতে পায় প্রিয়ম্বদা। শোকে, দুঃখে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। আর ধিক্কার দিচ্ছেন নিজের ভাগ্যকে।

মঞ্জুশ্রী কিন্তু নিজের ভাগ্যকে সেরকম করে ধিক্কার দিতে পারে নি। আসলে সেই মর্মান্তিক ঘটনাটা তার বোধশক্তিকেই কিছুদিনের জন্যে নষ্ট করে দিয়েছিল। একটিমাত্র ঘটনা যে জীবনকে কিভাবে চুরমার করে দিতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাও আসে নি প্রথমটা।

এলো মোহনলালের জন্যে। সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষা করে জানিয়ে দিল ক্ষতির পরিমাণ কতখানি হয়েছে। কোন হিন্দু যুবককে এ জীবনে স্বামী হিসাবে পাবে না মঞ্জুশ্রী। কারণ তারা সমাজচ্যুত। নিষ্ফল, অফুরন্ত যৌবন তার শুকিয়ে যাবে।

কঠোর সত্য। মন তবু মানতে চাইতো না। প্রথম যৌবন সবে ফুলে, গন্ধে জীবনকে ভরে দিয়েছে। অকারণেই কল্পনার পাখায় ভর করে মন উধাও হয়ে যেতে চায় রঙীন প্রজাপতির মতো। অনেক দুরাশার জাল বোনে। সবল দুটো বাহুর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন কল্পনা করে শিহরিত হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখে। জাগতেই কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ায় নিষ্ঠুর বাস্তব। সে পুরুষ কোনদিন আসবে না। আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে স্বধর্মী মারাঠারা।

আসবে না তবু তপস্যা করত মঞ্জুশ্রী। শিবপূজো। মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছতেন বাবা। মোহনলালের নজরে পড়ে গেলে কিন্তু অনর্থ বেধে উঠতো। দুর্দান্ত মোহন সহ্য পর্যন্ত করতে পারতো না হিন্দুদের।

অবাক্ লাগত মঞ্জুশ্রীর। রক্তের প্রতিটি কণায় জড়িয়ে রয়েছে যে সংস্কার তাকে নিঃশেষে মুছে ফলা যায় কি করে? এ সংস্কার তো আজকের নয়। [illegible] যুগের।

কথাটা বলতেই মোহন ক্ষেপে উঠত ;—কুসংস্কার যখন ভাঙে, তখন এমনি করেই ভাঙে মঞ্জু। বন্ধ ঘরে যখন আলো ঢোকে, তখন অন্ধকারের প্রতি কোন মায়া-দয়া করে না।

ভাইয়ের কথাবার্তার ধরনে ইদানীং আশ্চর্য হ'ত মঞ্জুশ্রী। বদলে যাচ্ছে। উদ্ধত, যুক্তিহীনতার পরিবর্তে শান্ত, যুক্তিপূর্ণ অথচ কঠোর। হয়তো ভবিষ্যত নবাবের সংস্পর্শেই এই সমস্ত আদব-কায়দা এসেছে। রপ্ত করছে এখন থেকেই।

—কিন্তু তবু আমরা হিন্দু মোহন। সে কথা ভুলে যাবো কেমন করে।

ভদ্রতার মুখোসটা আর রাখতে পারত না মোহনলাল ;—ও-কথা আর বলো না। যে নমুনা হিন্দুরা দেখিয়েছে, তাতে ইচ্ছে করে কালাপাহাড়ের মতো সব ক'টা মন্দিরকে ধুলোয়ে মিশিয়ে দিই।

কথাগুলো ঠিক। তবু ভয়ে বুক কেঁপে উঠতে থাকে মঞ্জুশ্রীর। মোহনলাল পুরুষ বলেই এত বড় কথাটা উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু তার পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। পুরুষেরাই কালাপাহাড় হতে পারে ; মেয়েরা নয়।

এ ঘটনার পর থেকে খুব সাবধানে চলতে হ'ত। চোখের আড়ালে পূজো করত মঞ্জুশ্রী। মোহনলাল সতর্ক ক দিয়েছিল। তেমন প্রয়োজন হলে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করবে সে। কারো মুখ চাইবে না।

সেদিনের ঘটনা যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পায় মঞ্জু। সবকিছু যেন আবার প্রথম থেকে ঘটছে। অথবা প্রথম ঘটছে এই।

শিবচতুর্দশীর পূজো সেরে চলে গেছে কুমারীর দল। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। জোর পায়ে রাস্তা পথে উঠতেই বাধা পায়।

লম্পট, দুশ্চরিত্র সিরাজউদ্দৌলার নামে শিউরে ওঠে বাংলার প্রতিটি ঘর। সেই লোকেরই সামনা-সামনি পড়ে গেল। সঙ্গীরা

তার উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। দামী কোন লুটের জিনিস পেয়েছে যেন।

পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল মঞ্জুশ্রী। পরমুহূর্তেই ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলে। সিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু মোহলালের বোন সে। ভয় কাউকেই করে না।

সিরাজ কিন্তু একটা অভাবনীয় কাণ্ড করলো সেদিন। হাত তুলে ইশারায় চুপ করতে আদেশ দেয় সঙ্গীদের। তারপর মন্থর গতিতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জুশ্রী। এই সিরাজ? এরই ভয়ে কেঁপে মরে সকলে? অথচ তার কিন্তু ভয়ের চাইতে বেশি হয় কৌতূহল। একেবারে ছেলেমানুষ বলে মনে হয় নবাবজাদাকে। পদ্ম পলাশের মতো চোখ দুটোই ধরিয়ে দিয়েছে তার আসল রূপ। সে রূপ পশুর নয়। অফুরন্ত জীবনী-শক্তিতে উচ্ছল একটা অপূর্ব সুন্দর প্রাণ। হৃদয় যার কবির মতো স্বপ্নময়। দোষ যদি কারো থাকে, তা নবাব আলিবর্দীর। নাতিকে ঠিক করে গড়ে তুলতে পারেন নি।

সিরাজ বুঝি হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। চমকে ওঠে পিঠের ওপর একটা মৃদু স্পর্শ পেয়ে। ভিড়ের ভেতর থেকে মোহনলাল কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করে নি। সম্বিত ফিরে পেতেই দৃষ্টিটা সরিয়ে নেয়।

মোহনলাল গা ঘেঁসে দাঁড়ায় একেবারে। তারপব কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি একটা যেন বলে।

সম্পূর্ণ ঘটনাটার আকস্মিকতায় মঞ্জুশ্রীও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। নবাবজাদার দুষ্কৃতির খবর জানে না এমন মেয়ে মুর্শিদাবাদে নেই বললেই চলে। যতই ছেলেমানুষ হোক; তবু সে সিরাজউদ্দৌলা। বিহ্বল দৃষ্টির মধ্যে অন্তরের তার ছায়া পড়লেও, সেই কবির অন্তরই সময় সময় দানবের রূপ ধরে। একথা মিথ্যা নয়। হাজারো সাক্ষী রয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাই ভয়টাকে এড়াতে পারে নি সে।

ভাইকে সামনে দেখেই লুপ্ত সাহস আবার ফিরে আসে। দৃপ্ত-কণ্ঠে কিছু একটা বলতে যায়।

বলা কিন্তু হয় না। বাধা পড়ে সিরাজের কথায় ;—সত্যি ?

—সত্যি নবাবজাদা। নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দেয় মোহনলাল। চোখ দুটো একবারের জন্যেও ফেরে না বোনের দিকে।

—বেরাদরে আজীজেমন্ মোহনলাল ! তুমি ধন্য।

বাংলা বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যত-নবাব সম্বোধন করলেন প্রিয় ছোট ভাই বলে। গর্বে বুক ফুলে ওঠে মোহনলালের। সেইসঙ্গে মঞ্জুশ্রীরও। বাধাপ্রাপ্ত কথাটা আর বলতে পারে না। এ সম্মানের পর কঠিন কথা বলা যায় না।

বরং কৃতজ্ঞতায় হৃদয় অবনত হয়ে পড়ে। কোন অসম্মানজনক ব্যবহার করে নি সিরাজ। উপরন্তু যে সম্মান আজ দিল তাকে, তা অপ্রত্যাশিতপূর্ব। যে নিষ্পলক দৃষ্টিটার অন্য অর্থ কল্পনা করেছিল মঞ্জুশ্রী, তা ছিল মুগ্ধ অন্তরের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য। কোন পুরুষের কাছ থেকে এ জিনিস পায় নি সে।

কেমন একটা স্বপ্নময় দৃষ্টিতে আবার ফিরে তাকায় সিরাজ। প্রকাশ্য রাজপথের ওপর মাথা নত করে সেলাম জানায় মঞ্জুশ্রীকে। পরক্ষণেই সঙ্গীদের কি একটা ইঙ্গিত করে। তড়িৎগতিতে সবগুলো ঘোড়ার মুখ ফিরে যায়। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের আড়ালে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চেতনা ফিরে এসেছিল অনেকক্ষণ পর। কিন্তু ঘোর কাটে নি। দেহের প্রতিটি বিন্দুতে তখনো বেজে চলেছিল মধুর কোন রাগিনী। বিবশ মঞ্জুশ্রী যখন বাড়ি ফেরে চারিদিকে তখন আঁধার নেমে এসেছে।

সেই রাতেই মোহনলাল একান্তে জিজ্ঞাসা করে ;—সিরাজকে দেখলি ?

—হ্যাঁ। জবাবটা দিয়েই কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রশ্নের আড়ালে সন্দেহ হয় কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে।

—কেমন লাগলো ?

একঝলক রক্ত আছড়ে পড়ে মঞ্জুশ্রীর মুখে। এই প্রশ্নটাই সারাক্ষণ মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। প্রকাশ হয়ে যেতেই কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে;—আমার লাগা-লাগিতে কি আসে-যায় দাদা?

মোহনলাল অপ্রস্তুত হয়;—রাগ করছিস কেন? লোকে ওকে খারাপ বলে; তাই জিজ্ঞাসা করলাম, তোর মত কি?

—মত আবার কি? ওই তোমাদের সিরাজ? ওকে লোকে এত ভয় করে কেন বুঝলাম না। শুনি, ওর জ্বালায় মেয়েদের পথে বেরুনো দায়।

—ওগুলো মিথ্যে বদনাম মঞ্জু। স্বার্থের জন্যে লোকে কি না করতে পারে। দেখছি তো চোখের ওপর। মিথ্যা বদনাম দেওয়া থেকে খুন পর্যন্ত। আসলে সবার লোভ রয়েছে ওই মসনদের ওপর। বিশেষ করে জাফর আলী খাঁর। এই সমস্ত করে যদি নবাব আলিবর্দীর মনটাকে বিষিয়ে তুলতে পারে, তবে মসনদ দখল করতে সুবিধে হয়।

—কিন্তু লোকে যা বলে তার সবটাই কি মিথ্যে?

—সবটা অবশ্য নয়। কতগুলো কাজ আমিও পছন্দ করি নি। খোলাখুলি বলেছি।

—বলতে পারলে দাদা? ভয় করলো না তোমার?

মোহনলাল হেসে ফেলে;—ভয়ের কথাই বটে। অন্য কেউ বললে গর্দান নিত সিরাজ। কিন্তু আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছে।

খানিক ভেবে নিয়ে চিন্তিত স্বরে আবার বলে;—মনটা ওর খুবই সাদা। তাই রেখে-ঢেকে করতে পারে না কিছু। বলে ফেলে। তা'ছাড়া, দাদুর আদরে খানিকটা ছেলেমানুষও রয়ে গেছে। বুদ্ধি পাকে নি। নইলে বাজী ধরে বলতে পারি, মানুষ হিসেবে মুর্শিদাবাদে অমন আর একটা লোক মেলা মুস্কিল।

স্বীকার মঞ্জুশ্রীও করে; কিন্তু মনে মনে। মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না। লজ্জা এসে বাধা দেয়।

—তোকে দেখে সিরাজ খুব খুশী হয়েছে।

মোহনলাল শুতে চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাওয়ার ওপর বসে থাকে মঞ্জুশ্রী। কথাটা গানের মতো বাজছে কানের ভেতর। সিরাজ খুশী হয়েছে তাকে দেখে। গানের সুরটা ক্রমশ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জীবনে এতদিন কোন আশার আলো নজরে পড়ে নি। সেদিন বুঝি তারই একটু ঝলক দেখা গেল। অনেক স্বপ্নের মালা রচনা করে সেই আভাসটুকুকে ঘিরে।

কল্পনা করতে ভালো লাগে। সমাজকে তোয়াক্কা করে না তারা। সেও নয়; মোহনলালও নয়। একমাত্র বাধা বৃদ্ধ পিতা। তিনি হয়তো এতটা সইতে পারবেন না।

কথাটা মনে হতেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল। নির্জন চাঁদনী রাতে দাওয়ার ওপর বসে প্রাণ খুলে হাসে মঞ্জু। নিঃশব্দে। শোনবার কেউ নেই; দেখবারও না। একি অসম্ভব কল্পনায় মন মেতে উঠেছে। কোথায় নবাবজাদা সিরাজ; আর কোথায় তার মতো সামান্য একজন বাবা। হাসটা যেন কিছুতেই থামতে চায় না। নিজের প্রতি বিদ্রূপে উচ্ছসিত হয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে পাগলের মতো নিজের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল।

মুহূর্তের জন্যে বর্তমানে ফিরে আসে প্রিয়ম্বদা। সেদিনের সেই বেদনাটা আজ আবার যেন নতুন করে অনুভব করে।

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস ওঠে। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের কশাঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে মেঘের দল। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাট এসে সারা শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবু উঠতে চায় না মন। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে বৃষ্টি যেন অতীতের বন্ধ কপাট খুলে দিয়েছে। ছবির পর ছবি ভেসে ওঠে। মিলিয়ে যায়। বাঈজী আবার ডুবে যায় স্মৃতির মধ্যে।

সেদিন যেটাকে দুরাশা বলে মনে হয়েছিল, পরে কিন্তু তাকেই মনে হয়েছিল দুঃস্বপ্ন। বীভৎসতম দুঃস্বপ্ন। জীবনটাকেই তছনছ করে

দিল। শুধু দুরাশা হয়ে থাকলে তবু ভালো হ'ত। না-পাওয়ার দুঃখই বড় জোর বেদনা দিত। সে বেদনা হ'ত মধুর।

কিন্তু তা হ'ল না। কপালে লেখা ছিল অনেক দুঃখ। সে লেখাকে মুছে ফেলা যায় না। দুনিয়াটাকে দোষ দিয়ে কি হবে।

কথাগুলো প্রায়ই বলতো মোহনলাল। বিশেষ করে সিরাজের প্রসঙ্গ উঠলেই। ঘুরে-ফিরে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে যেত সেই পথে। যে ধর্ম পায়ে ঠেলে দিয়েছে তাদের, তাকে সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থেকে হাহাকার করার চাইতে, আগল ভেঙে বেরিয়ে পড়া ভালো। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা হবেই। রোধ করতে পারবে না কেউ। ভগবানও নয়। একমাত্র বদলাতে পারে মানুষ। নিজের চেষ্টায়।

শুনতে শুনতে ভয়ে কাঠ হয়ে যেত মঞ্জু। যুক্তির পর যুক্তি মেলে ধরত মোহনলাল। জীবনের চাইতে ধর্ম বড় নয়। এক ধর্ম যে জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছে, অন্য ধর্ম যদি সেই মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়ে তুলতে চায়, তাতে ক্ষতি কি?

উত্তর দিতে পারতো না মঞ্জুশ্রী। বুঝতেও পারতো না সবকিছু। মোহনলালের উদ্দেশ্যটাকে কেমন ঘোলাটে মনে হ'ত। বুকের কাঁপুনি থামতো না কিছুতেই।

তবু ভালো লাগত শুনতে। হৃদয়ের গোপন স্বপ্নের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল অনুভব করতো মোহনলালের যুক্তি-গুলোর। নিরুত্তরে আরক্ত মুখখানা নামিয়ে নিত শুধু।

জীবনের অনেকগুলো উঁচুনীচু পথ পার হয়ে এসে পরবর্তীকালে কিন্তু যুক্তিগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভাগ্যের লেখাকে সত্যিই বদলানো যায় না। মোহনলালও সেই ভাগ্যের হাতেরই পুতুল বই নয়। অভাগিনী বোনের মর্মান্তিক রিক্ততা সহ্য করতে পারে নি বেচারা। তাই চেয়েছিল সত্যিকারের সুখী করতে। সেই আন্তরিক উদ্দেশ্যেই তাকে সোজা নিয়ে তুলেছিল হীরাঝিলে। ইংরেজ-কুঠীর মেলা দেখাবার নাম করে।

সেদিন কিন্তু অন্যরকম মনে হয়েছিল। লজ্জায়, দুঃখে সারা রাত ধরে প্রাণ খুলে অভিশাপ দিয়েছিলাম মোহনলালকে। মায়ের পেটের ভাই হয়ে যা করলো, তার চাইতে গর্হিত আর কিছু হতে পারে না ঘেন্না ধরে গিয়েছিল পৃথিবীর ওপর। স্বার্থের জন্যে মানুষ কি না করতে পারে। এমন কি নিজের ভাইও। সিরাজের সামান্য অনুকম্পা লাভের জন্যে নিজের বোনকে তুলে দিল হীরাঝিলে।

হীরাঝিল।

কত স্বপ্ন গড়ে ওঠার মঞ্জিল হীরাঝিল। আবার কত স্বপ্ন ভেঙে পড়ার নির্বাক সাক্ষী। অতীত-লীন চোখের সামনে অপূর্ব মাধুর্য এবং দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুটে ওঠে হীরাঝিল প্রাসাদ।

হী'ঝিলের নামে কেঁপে উঠতো বাংলার প্রতিটি ঘর। কত করুণ কাহিনী শুনেছে মঞ্জুশ্রী নিজেও। মঞ্জিলের ইটগুলোও নাকি মাঝ রাতে কাঁদে! অলিন্দে অলিন্দে কেঁদে ফেরে নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ।

সেই প্রাসাদের ভেতরে ঢুকেই কিন্তু পাথর হয়ে গিয়েছিল মঞ্জুশ্রী। সিঁড়ির মাথায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলা। মুহূর্তের মধ্যে ষড়যন্ত্রটুকু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চকিতে পেছনে ফিরে দেখেছিল। কেউ নেই। চুপিসাড়ে কখন সরে পড়েছে মোহনলাল।

সিরাজকে নিয়ে কত স্বপ্ন রচনা করেছিল সে। কত কল্পনার রঙিন ছবি। কোন হীনতার লেশমাত্রও ছিল না সেই ছবিগুলোতে। সেদিন কিন্তু সেই সিরাজেরই সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঘৃণায় কিলবিল করে ওঠেছিল সারা শরীর। এমন ঘৃণ্যভাবে সে জীবনকে চায় নি সে। চেয়েছে অনেক কিছু; কিন্তু এরকম অসম্মানের পথে নয়। এ পাওয়া যে নারীর চরম অপমান। মারাঠা দস্যুরা যা করেছিল, তারই ঘৃণ্যতম রূপ। এ কি করল মোহনলাল?

বুকফাটা কান্নায় সে রাতে শিউরে উঠেছিল হীরাঝিলের জল।

কিন্তু কেউ শোনে নি। কত নারীরই তো চোখের জলে লোনা হয়েছে হীরাঝিল। কেউ এগিয়ে আসে নি তাদের সাহায্য করতে। সেদিনও কেউ এলো না। নিরুপায় হয়ে পাশের একটা খোলা দরজার দিকে নজর পড়তেই, ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছিল মঞ্জুশ্রী।

দমকা হাসির ধাক্কায় নির্জন মহলের হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। মাংসলোলুপ নরপশু হাসছে। ভয়ে বুঝি কাঁদতেও ভুলে গিয়েছিল মঞ্জু। মানুষের হাসি এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে?

হাসিটা এগিয়ে আসে ক্রমশ। তারপর হঠাৎ যেন দেওয়াল ফুঁড়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় সিরাজ।

হৃদপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই বুঝি স্থির হয়ে পড়েছিল। কামার্ত একজোড়া চোখ মুখের ওপর আটকে রয়েছে। যে অনিন্দ্যসুন্দর চোখ দুটো দেখে একদিন কবি বলে মনে হয়েছিল, সেই দুটোকেই সেদিন মনে হয় সাপের মতো। কুৎসিত হেসে বলে—এ মহল থেকে বেরুনো অত সোজা নয় মঞ্জু। দাদুকে এই গোলকধাঁধায় বন্দী করে পাঁচলাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছিলাম। কিন্তু, তুমি ভয় পেলে কেন?

জীবনের সে অধ্যায়ের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথা এখনো জেগে রয়েছে মনের আয়নায়। মোছে নি। মোছবার চেষ্টাও করে নি মঞ্জুশ্রী। পাঁক হলেও, তার মধ্যেই যে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াকে লাভ করেছিল। এ কথা এখনো ভুলতে পারে না। পারবেও না কোনদিন। স্বপ্নমগ্ন বাঈজীর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সেইসঙ্গে ঝড়। আকাশ আর পৃথিবী যেন মেতে উঠেছে ধ্বংসের খেলায়। অভিসার রজনী আজ মঞ্জুশ্রীর। কল্পনার মধ্যে চির আরাধ্য সিরাজকে আজ পেয়েছে অভিশপ্ত হীরাঝিল। সে পাওয়ার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কত অশ্রু; কত দীর্ঘশ্বাস। খুঁটিয়ে সেগুলোকে দেখতে থাকে কৃপণের মতো।

ভয় তখন আর ছিল না মঞ্জুশ্রীর। অভাবনীয় বিপদ হঠাৎ এসে গেলে এই রকমই বুঝি হয় মানুষের। ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না।

—কিন্তু, তুমি ভয় পেলে কেন?

স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকায় মঞ্জুশ্রী। এই লোককে নিয়েই স্বপ্নের মঞ্জিল রচনা করেছিল। পালটা প্রশ্ন করে—আমায় এখানে কেন এনেছেন নবাব?

—নবাব নই মঞ্জু; এখনো হই নি। সে কথা থাক। তোমায় এনেছি ভালো করে দেখবো বলে।

—কিন্তু, আমি আপনার বন্ধু মোহনলালের বোন।

—নিশ্চয়ই; সিরাজ এগিয়ে এসে একখানা হাত ধরে ফেলে।

এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় মঞ্জুশ্রী;—গায়ে হাত দেবেন না।

মুগ্ধ চোখদুটো ক্ষণেকের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে যায় সিরাজের। স্বরটাও বদলে যায় কেমন। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসে; —আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি মঞ্জু।

ভালোবাসা! সহসা যেন একরাশ বেলোয়ারী লণ্ঠন ভেঙে পড়ে মাথার মধ্যে। চার অক্ষরের একটামাত্র শব্দ। কিন্তু সেই শব্দটুকুই অদ্ভুত একটা দীপ্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ ঝলসে দেয়।

সিরাজ আবার এগিয়ে আসে,—হিন্দুরা তোমাদের ত্যাগ করেছে। তোমার সর্বনাশ করেছে। তবে আর কিসের দরদ ওদের ওপর?

মোহনলালের যুক্তিরই প্রতিধ্বনি। বড় কোমল জায়গায় ঘা দিল সিরাজ। সত্যিই কোন দরদ নেই। তার বদলে রয়েছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। কিন্তু, তাই বলে এই চরম অপমানকে মেনে নিতেও অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে মঞ্জুশ্রী জবাব দেয়;— তাই বুঝি আপনার দরদ উথলে উঠেছে?

সিরাজ থমকে দাঁড়ায়। ম্লান হেসে বলে ;—তোমাকে এখানে এভাবে এনে হয়তো অন্যায় করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করো, সত্যিই ভালোবাসি। তোমার কোনরকম অপমান হোক, সে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

একটু থেমে অন্যমনস্কভাবে আবার বলে ;—তা'ছাড়া, অত ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারি না। কোনদিন করি নি। তোমায় ভালোবেসেছি ; চাই। এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

বলতে বলতে সবল ছ'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। দৃষ্টিটাতে আবার ফিরে আসে সেই উন্মত্ত আলো। গভীর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। মুখখানা নেমে আসে।

তীব্র একটা বিষের জ্বালা যেন বয়ে যায় সারা শরীরে। কোন-রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একধারে সরে যায় মঞ্জুশ্রী। নিরুপায় আক্রোশে রুখে দাঁড়ায় ;—লম্পট, পশু।

রুদ্ধশ্বাস একটা মুহূর্ত। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সিরাজ। মুখে কোন কথা নেই ; কিন্তু ছ'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়তে থাকে।

পরক্ষণেই নিভে যায় আগুনটুকু ;—ঠিক বলেছো মঞ্জু ; আমি লম্পট, পশু। কিন্তু তা অন্য মেয়ের কাছে। যাকে ভালোবাসি, তার কাছে নয়।

প্রথম দিনের মতো, সেদিনও একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসে সিরাজ। উদাস স্বরে আবার বলে ;—দোষ আমারই। ছলনা করতে পারি না কারো সঙ্গে। প্রেমের কথা শুনিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করতে বিবেকে বাধে। তাই যা করবার সোজাসুজিই করি। যা বলবার, স্পষ্টভাবেই বলি। জানি, আমার একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করবে না। কেউই করবে না। তবু সত্যি বলছি কোন খারাপ মতলব আমার নেই।

—তবে যেতে দিন আমায়।

—স্বচ্ছন্দে। একটু হেসে দরজাটা খুলে ধরে ;—মর্জি হলে

এখনি চলে যেতে পারো। কিন্তু তার আগে গোটাকতক কথা শুনে যেতে হবে।

তখনো বিশ্বাস করতে পারে নি মঞ্জুশ্রী। সিরাজের হাত থেকে এত সহজে মুক্তি মেলে না। একটা নজীরও এমন নেই। দুরু-দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে পড়ে; - বলুন।

—খোদার কসম্ বলছি, তোমায় ভালোবেসেছি। কথাটা যেমন করে বলা উচিত, তেমন করে হয়তো বলতে পারলাম না। কিন্তু তার জন্যে ভুল বুঝো না। আর, যদি কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েও থাকে, সেজন্যে ক্ষমা করো।

একটু এগিয়ে এসে আনতোভাবে একখানা হাত তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে আবার বলে;—যদি চাও, তোমায় আমি পাট-বেগম করবো মঞ্জু। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সল্‌তনত্ বিছিয়ে দেবো পায়ের তলায়। তার বদলে শুধু একটা জিনিস দিও। একটু সত্যিকারের ভালোবাসা।

কথাগুলো বলেই কেমন যেন হয়ে যায় হঠাৎ। সম্পূর্ণ অজানা একটা মানুষ নবাবীর খোলস ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়;—বিশ্বাস করো মঞ্জু; নারীর সত্যিকারের ভালোবাসা আজো পেলাম না। মায়ের নয়, প্রিয়ার নয়। ভালোবেসেছিলাম জারিয়া লুৎফাকে: বিয়েও করেছি। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, স্বার্থের লোভে সেও বুঝি ভিড়েছে আমার শত্রুদের দলে।

চকিতের জন্যে নিজেকে মেলে ধরেই আবার গুটিয়ে নেয়;— আমি চললাম চেহেলসতুনে। শুধু একটা অনুরোধ। আজকের রাতটা ভেবে দেখো। যদি মন চায়, কাল সকালে চলে যেও। কেউ বাধা দেবে না। তবে একটা কথা। আমি তোমায় ধরে এনেছি এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এতক্ষণ। এর পরও ফিরে যাবে কিনা ভালো করে চিন্তা করে দেখো।

খুব ভালো করে ভেবেছিল মঞ্জুশ্রী। সেই একটা রাতই শুধু

নয়। অনেক রাত ধরে। কিন্তু ফিরে যেতে পারে নি। ওই একটা কথাই যেন সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সত্যিকারের একটু ভালোবাসা চায় নবাবজাদা সিরাজ। অন্তরের সমস্ত রাগ এবং বিদ্বেষের ওপর যেন স্নিগ্ধ আনন্দের একটা সবুজ গালিচা বিছিয়ে দেয় ওই একটা মাত্র কথা। ভালোবাসা।

বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারে নি মঞ্জুশ্রী। অসহায় একটা পুরুষের অন্তর যেন ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল তাকে। যে পুরুষ কোনদিন ভালোবাসা পায় নি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারে নি।

মোহনলালকে অভিসম্পাত করেছিল মঞ্জুশ্রী। কিন্তু ক্রমশ তার প্রতিও মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। সত্যিই স্নেহ করে মোহন। সে না থাকলে আজ কোথায় ভেসে যেতে হ'ত। হিন্দুসমাজ স্থান দেয় নি। কোন হিন্দু যুবক তাকে স্থান দেবে না। হয় সারা জীবন ওই ভাবেই কাটিয়ে দিতে হ'ত; নইলে বিয়ে করতে হ'ত কোন বিধর্মীকে। তার চাইতে—

আর যেন ভাবতে পারে নি মঞ্জুশ্রী। এ সৌভাগ্য অকল্পনীয়। ব্যর্থ জীবনের অন্ধকারে আশার আলো তুলে ধরেছে সিরাজ। পশু হোক; অমানুষ হোক; একটা সত্য অন্তত দিনের আলোর মতো ফুটে উঠেছে। সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে তাকে। নারীর কাছে পুরুষের সব চাওয়াই যেয়ে শেষ হয় একটামাত্র জায়গায়। তবু, প্রেমের পথ ধরে যে চাওয়া আসে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ইচ্ছে করলে সে চাওয়াকে জোর করে আদায় করতে পারত সিরাজ। কিন্তু তা করে নি। তার বদলে মেলে ধরেছে প্রেমের অর্ঘ্য।

রূপে, রসে, গন্ধে রিক্ত জীবনকে সত্যি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল সিরাজ। চেহেলসতুনের পরিবর্তে হীরাঝিলই হয়ে উঠেছিল তার প্রতিরাতের আস্তানা। পাট-বেগম হবার আশা অনেক বড়। অতখানি চায় না মঞ্জুশ্রী। সিরাজের প্রেম-ভালোবাসায়ভরা হৃদয়ের

বেগম হয়ে থাকতে পারলেই অনেক। বিশেষ করে তার মতো মেয়ের পক্ষে। যার কপালে লেখা রয়েছে শুধু হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস।

মোহনলালের কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ত। লজ্জায় তার সামনে আর কোনদিন আসে নি বেচারি। সেও ডাকে নি কখনো। প্রকৃত উদ্দেশ্য তার যাই থেকে থাকুক, যা করেছে তার কোন ক্ষমা নেই। অন্তত লোকচক্ষে।

মনে পড়বার অবশ্য বিশেষ একটা কারণও ছিল। মোক্ষম একটা কথা বলেছিল মোহন। কপালের লেখা মোছা যায় না কিছুতেই। কথাটা মর্মান্তিক সত্যি। নইলে হীরাঝিল ছাড়তে হ'ত না মঞ্জুকে। দিল্লী থেকে এসে জুড়ে বসতো না ফয়জানবাঈ। কেড়ে নিত না সিরাজকে।

সত্যিই কেড়ে নেওয়া; জোর করে। একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করেই যেন নীচের বাঈজী-মহলে জুড়ে বসেছিল ফয়জান। দিনের পর দিন অধীর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে থাকতো মঞ্জুশ্রী। কিন্তু সিরাজ আসতো না। আসতো না বলা ভুল। আসতো, নীচে বাঈজী-মহলে। নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়ে গমগম করতে থাকতো হীরাঝিল।

ঝিলের জলে সেদিনও মৃদু শিহরণ তুলেছিল মধ্য রাতের বাতাস। আকাশে সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা। সারাটা রাত ধরে জানালার ধারে বসে নিস্তব্ধ হয়ে মঞ্জুশ্রী শুনেছে নীচের সেই দাপাদাপি। সিরাজ আজ কতদূরে সরে গেছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেন। চেহেলসতুনে বসে লুৎফউন্নিসা বেগমও হয়তো একই কথা ভাবছে। কত দূরে।

তবু একটা শক্ত খুঁটি রয়েছে লুৎফার। সিরাজের বেগম সে। দিনেরবেলাটা অন্তত স্বামীকে কাছে পায়। নবাব আলিবর্দীর ভয়ে দিনের আলোয় হীরাঝিলে আসতে সাহস করে না সিরাজ। কিন্তু তার?

যে কঠিন সত্যটাকে এতদিন এড়িয়ে গিয়েছিল মঞ্জুশ্রী, সে

সত্য যেন মুখ ভেঙচে ওঠে। যতই ভালোবাসা থাকুক, তবু সে নবাবজাদার রক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তার স্থান ফয়জান বাঈ-এর চেয়ে কিছু উঁচুতে নয়। বেগম লুৎফার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না।

বেগম লুৎফাকে উপেক্ষা করা সহজ। দূরে থাকে সে। কিন্তু ফয়জানবাঈকে উপেক্ষা করতে পারে না মঞ্জু। এ কাঁটাকে গোড়া থেকে এখুনি উপড়ে না ফেললে হয়তো একদিন তাকেই বার করে দেবে হীরাঝিল থেকে।

কতবার ভেবেছে মঞ্জুশ্রী, নীচে যেয়ে জোর করে ধরে আনবে নবাবজাদাকে। কিন্তু পারে নি। টাকার বিনিময়ে যে নারী দেহ বিক্রি করে তার প্রতিযোগীরূপে সামনে যেয়ে দাঁড়াতে ঘেন্না করে। ময়ফিলখানায় যাবার অর্থ হল সেই কথাটাই আরো উলঙ্গভাবে প্রকাশ করে দেওয়া। এখন তবু চাপা রয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল সেদিন। যা হোক একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। চরম কিছু ঘটে যাবার আগেই। মন বলছিল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

ময়ফিলখানার দোরগোড়াতেই কিন্তু বাধা এলো। অবাক দৃষ্টিতে সেলাম করে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল প্রহরী। সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছিল ভেতরে যাবার হুকুম নেই। সে যেই হোক না কেন।

ক্ষোভে, অপমানে মাথা নীচু করে নিজের মহলে ফিরে এসেছিল মঞ্জু। অজান্তেই কবে হীরাঝিলকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছিল। সে ভুল ভেঙে গেল।

মন কিন্তু সব সময় মিথ্যা বলে না। যে অঘটনের আশঙ্কায় সে রাতে ময়ফিলখানায় ছুটে গিয়েছিল মঞ্জুশ্রী, সেই অঘটনই অকস্মাৎ এসে হাজির হ'ল। আবার ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা। ফয়জানবাঈ ডুবে গেল অতল জলে। ডুবে গেল মঞ্জুশ্রী।

তীব্র ছটায় চারিদিক সাদা করে বিদ্যুৎ চমকায়। বিকট শব্দে

বাজ পড়ল কোথাও। ঝাঁকুনি খেয়ে স্বপ্ন ভেঙে যায় প্রিয়ম্বদার। কোথায় হীরাঝিল, আর কোথায় কৃষ্ণনগর। যে জীবনে ফুল ফুটতে পারতো, সেই জীবন হারিয়ে গেল চোখের জলে। পেছনে ফিরে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে। গভীর অন্ধকার ঘিরে রয়েছে শুধু। সামনেও সেই একই দৃশ্য। দেখা যায় না কিছুই। যে প্রেমকে আশ্রয় করে ভেসেছিল এতদিন, সেই আশ্রয়টুকুও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে আজ। সিরাজের জীবনে ঘনিয়ে এসেছে দুর্যোগের অন্ধকার। অথচ সে নিশ্চিন্ত মনে বসে রয়েছে কৃষ্ণনগরে। সেই দুর্যোগের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থলে।

রায়গুণাকর মেনে নিতে পারেন নি তার যুক্তিগুলোকে। তর্কের দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য মানা যায় না। প্রিয়ম্বদাও বোঝে সে কথা। কিন্তু হৃদয় বলেও একটা ব্যাপার আছে। যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই সেখানে। সেটাকেই উপেক্ষা করে গেলেন ভারতচন্দ্র।

তার পক্ষে কিন্তু ওভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সিরাজের এই বিপদের সময় আর কেউ তার পাশে না থাকুক, মঞ্জুশ্রী দাঁড়াবে। দাঁড়াতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। দূর থেকে শোনা যায় ভোরের পাখির কাকলী। অতন্দ্র দু'চোখ আকাশের গায়ে বিছিয়ে দেয় প্রিয়ম্বদা। ইঙ্গিত খোঁজে যেন। পথের হদিস। একদিকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগৎ শেঠ, মীরজাফর আলী খাঁ। অন্যদিকে তার মতো সামান্য একজন নারী।

নবাবজাদা সিরাজের জন্যে প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে। রাজ্যের দরকার নেই, নবাবীর দরকার নেই, ঐশ্বর্যের দরকার নেই। সম্ভব হলে সিরাজকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেত মঞ্জুশ্রী। যেখানে মারামারি, হানাহানি নেই। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করত সেখানে। নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে।

মাধবী-মালঞ্চেও বিনিদ্র রাত পোহায়। মেঘে ঢাকা আঁধার আকাশে ধূসর আভাস জাগে। ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন অক্লান্ত আনন্দে শিস দিয়ে যাচ্ছে একটা দোয়েল।

তখনো স্তম্ভিতভাবে বসেছিলেন রায়গুণাকর। রাজনর্তকী চলে যাবার পর থেকেই এলোমেলো অসংখ্য চিন্তার ঢেউ মাথার মধ্যে তোলপাড় শুরু করেছিল। মঞ্জুশ্রীর কথা, রাধার কথা, সিরাজের কথা। প্রশ্নের যেন শেষ ছিল না কোন। যুক্তিগুলোকে অস্বীকার করতে পারছিলেন না রাজনর্তকীর। শ্রীরাধার মনের দিকটা সত্যিই কোনদিন তাকিয়ে দেখেন নি। তারও হয়তো কিছু বক্তব্য রয়েছে। সেই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনলেন রাজনর্তকীর মুখে। সত্যিই তিনি চরম স্বার্থপর।

আরো একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। প্রিয়ম্বদার নজরে পড়ে নি। শুধু যে শ্রীমতীর মনের দিকটাই উপেক্ষা করেছেন তাই নয়। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাভাবিক একটা কর্তব্য রয়েছে। সেদিক থেকেও চরম অবহেলা করে এসেছেন এতদিন।

অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিভরা অতীত দুরূহ প্রশ্নের মতো মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায়। অভিযুক্ত করে। অবশেষে পথ স্থির করে নেন রায়গুণাকর। আর না। ফিরে যেতে হবে এবার মূলাজোড়ে। চিরদিনের মতো। যে ভুল হয়ে গেছে, সংশোধন করতে হবে তাকে। দেরি হয়ে গেলেও, সময় একেবারে যায় নি।

একটা কাজ কেবল বাকী রয়ে গেছে। প্রিয়ম্বদাকে কথা দিয়েছেন মহারাজাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবেন। শেষবারের মতো নামবেন রাজনীতির দাবাখেলায়। মাটির মানুষের কবি হিসাবে এ কর্তব্যকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

ভাবনার স্রোত একটা মোড় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্ত-কণিকাগুলো গরম হয়ে ওঠে। যে বিদেশী বণিক সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বাণিজ্য করতে এসে এদেশের রাজনীতিতে মাথা

গলায়, তাদের বিশ্বাস নেই। হয়তো মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করেই একদিন হাত বাড়াবে সারা হিন্দুস্তানের ওপর। এখনি বাধা না দিলে গভীর কলঙ্কের টিপ চিরস্থায়ী হয়ে রইবে বাংলার কপালে।

অন্ধকার আরো পাতলা হয়ে আসে। ভোরের বাতাসে টুপটাপ জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে গাছগুলো থেকে। চিন্তামগ্ন মস্তিষ্ক খেয়াল করে নি এসব। হুঁস হয় সহাস্য একটা সম্ভাষণে—রায়গুণাকর আছেন নাকি।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ভারতচন্দ্র। রাজবিদূষক গোপাল ভাঁড় তাঁর কুটিরে। অবিশ্বাস্য ঠেকে। আবার ভয়ও হয়। গোপালের এই হঠাৎ আগমন যেন অমঙ্গলের সূচনা করে কোন।

—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম ঘুরে যাই একবার। সক্কালবেলা ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোও নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে খবরটাও পৌঁছে দেওয়া হবে। মহারাজার নিমন্ত্রণ আর কি। আদেশেরই রকম ফের। কি বলুন?

বিশ্রীভাবে দাঁত বার করে হাসে গোপাল। চোখ দুটো ঘুরতে থাকে ঘরের ভেতর। তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মসলীনের ওড়নাটা হাতে তুলে নেয়;—বাঃ বাঃ, খাসা জিনিস তো। কিন্তু এসব তো শুনি ব্যবহার করে মেয়েরা

অপ্রতিভভাবে কাপড়খানার দিকে তাকান রায়গুণাকর। রাজনর্তকীর ওড়না। কাল রাতে অন্যমনস্কভাবে কখন পাশে নামিয়ে রেখেছিল। নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

কাপড়টা নাকের কাছে তুলে সশব্দে আঘ্রাণ নেয় গোপাল। তারপর মুচকি হেসে বলে—আঃ, কি সুগন্ধ। কবি কি আজকাল মেয়েদের পোষাক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন?

ভারতচন্দ্র একটা ঢোঁক গেলেন—ওটা প্রিয়ম্বদার।

—মানে আমাদের বাঈজীর?

—হ্যাঁ। কাল ভুলে ফেলে গিয়েছে।

—ইদানীং রাতগুলো তাঁর বুঝি এখানেই কাটছে?

কুৎসিত ইঙ্গিতটা যেন এক ধাক্কায় সচেতন করে দেয় ভাবত-চন্দ্রকে। মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায় জড়ত্বটুকু। গম্ভীর স্বরে বলেন—মহারাজার আদেশটা শোনাও গোপাল।

—বলছি, বলছি; অত তাড়াহুড়ো কিসের। এই সুন্দর বাগান, হাজারো ফুলের গন্ধ। এমনিতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর যদি উর্বশীরা আসা-যাওয়া শুরু করেন, তবে মানুষ তো ছার, দেবতাদেরই মাথা ঘুরে যাবে। তা খুব ভালো। নির্জলা উপবাস আর কতদিন করা যায়। কি বলেন?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিটা মুখের ওপর ধরে রেখে আবার বলে তবে কিনা, রাজভোগ্য জিনিস। এ সবের দিকে কি আর চাকর-বাকরদের হাত বাড়ানো মানায়, না ভালো হয়? অবশ্য মহারাজা শুনলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। চাই কি, আর একটা উপাধিও কপালে জুটে যেতে পারে।

রাগে শরীরটা জ্বলে যাচ্ছিল রায়গুণাকরের। তবু চেপে যান। অপ্রিয় কোন কথা উচ্চারণ করতেও আটকে যায়। যে সুর মঞ্জুশ্রী তুলে দিয়ে গেছে হৃদয়ের মধ্যে, এখনো মধুর ঝঙ্কারে বেজে চলেছে তা। সে অমূল্য জিনিসকে নষ্ট করলে নিজেরই ক্ষতি। বঞ্চিত হবেন এক অপূর্ব অনুভূতি থেকে।

উপরন্তু, চিরদিনের মতো যখন কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলেই যাচ্ছেন, তখন কেন বৃথা মন কষাকষি করা। আঘাত দিতে চায় দিক। কিন্তু সে আঘাতে হৃদয়ের ফুলটাকে কিছুতেই শুকিয়ে যেতে দেবেন না। কোনরকমেই নয়। ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করেন—তোমার কি কোনদিন কোন ক্ষতি করেছি গোপাল?

—রামো, রামো; গোপাল ভাঁড় দু'হাত দিয়ে নিজের কান স্পর্শ করে;—একথা মিত্রতেও বলবে না কবি। শত্রু তো দূরের কথা।

—তবে?

—তবে কি?

—এভাবে আঘাত দাও কেন ?

—হায় ; শেষ পর্যন্ত এই বুঝলেন ? বলি দেশের বাড়িতে ব্রাহ্মণী পড়ে আছেন না ? তাঁকে নিয়ে আসুন। এ সমস্ত ম্লেচ্ছ, বেশ্যাদের সঙ্গে মাখামাখি করাটা কি ভালো ? ব্রাহ্মণ মানুষ।

কথাগুলোর ফলাফল লক্ষ্য করে আবার বলে ,—সে কথা যাক। মহারাজা আপনাকে আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার স্মরণ করেছেন।

প্রসঙ্গটার মোড় ফিরতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রায়গুণাকর। জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজা ফিরেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; কাল রাতে।

—কোথায় গিয়েছিলেন জানো কিছু ?

জানি, কিন্তু বলতে মানা। গুরুতর রাজকাজে বাইরে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, এবার তাহলে আসি। অবশ্যই যাবেন কিন্তু।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে গোপাল ভাঁড়।

চলে যায় ; কিন্তু মুখের চাপা হাসিটুকু চোখ এড়ায় না ভারতচন্দ্রের। দুশ্চিন্তায় মনটা ভারি হয়ে যায়। নিশ্চয়ই কোন দুর্বুদ্ধি এঁটেছে গোপাল। ও হাসি তিনি চেনেন। রাজসভায় আবার হয়তো একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাবে সেবারের মতো।

এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না কিছুতেই। রাজসভায় কেন কেউই সন্তুষ্ট নয় তাঁর ওপর। কারো কোন ক্ষতি করেন নি। সাতে-পাঁচেও থাকেন না কারো। তবু কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না তাঁকে। অপদস্থ করতে পারলে খুশী হয়।

সবচেয়ে দুর্বোধ্য লাগে মহারাজার ব্যবহার। সব জেনে-শুনেও প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, বরং প্রচ্ছন্নভাবে সায়ই দেন যেন। কিন্তু কেন ?

এই প্রশ্ন নিয়েই সন্ধ্যার পর রাজপ্রাসাদের দিকে পা বাড়ান

রায়গুণাকর। বহুদিন পর মহারাজা রাজধানীতে ফিরেছেন। ফেরবার পর এই প্রথম সভা। কি হবে তার একটা আঁচ করেই রেখেছিলেন। নাচ, গান, ভাঁড়ামি এবং অশ্লীল রসিকতার চূড়ান্ত হবে আজ।

সভাগৃহে ঢুকতে যেয়েই কিন্তু খটকা লাগে। কি রকম একটা থমথমে ভাব ছেয়ে রয়েছে চারিদিকে। সেনাধ্যক্ষ মাহ্‌মুদ জাফর এবং সেনাপতি মুজঃফর হোসেন গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসছিলেন। দরজার সামনেই দেখা হয়ে যায়। কবিকে দেখে সামান্য একটু মাথা নেড়ে সেলাম জানান দুজনে। অন্যান্য দিন দেখা হলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেন। আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম হ'ল।

ভেতরে প্রবেশ করে আরো আশ্চর্য হন। আমোদ-প্রমোদের কোন লক্ষণই নেই। নিস্তব্ধ সভাগৃহে চুপচাপ বসে রয়েছেন পঞ্চরত্ন সভার অন্য চারজন সভ্য। আর কেউ নেই। বিস্মিত রায়গুণাকর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাশে নিজের আসনে যেয়ে বসেন। জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার বিদ্যালঙ্কার মশাই?

দারুণ গাম্ভীর্য নিয়ে তাকান বিদ্যালঙ্কার—কিসের ব্যাপার?

—কি রকম যেন মনে হচ্ছে। থমথমে ভাব।

—যুদ্ধ আসন্ন; এ সময় কি কেউ হাসতে পারে?

—যুদ্ধ? আরো আশ্চর্য হন ভারতচন্দ্র;—কার সঙ্গে? কে করবে?

—কে করবে জানি না, তবে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে। তাই নতুন রাজপ্রাসাদ শিবনিবাসের চারিদিকে গড়খাই করবার আদেশ হয়েছে। মহারাজা শীঘ্রই সেখানে চলে যাবেন।

—এত কাণ্ড হয়ে গেছে?

বিদ্যালঙ্কার সগর্বে তাকান—এসব রাজনীতির গভীর তত্ত্ব আপনি বুঝবেন না। সেই ব্যাপারেই মন্ত্রণাগৃহে পরামর্শরত রয়েছেন মহারাজা। শুভ আগমনের বিলম্ব হবে।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত।

তাই সাধ্যমত যবনভাষা এড়িয়ে চলেন। মনে মনে হাসেন রায়গুণাকর। আবার প্রশ্ন করেন—কখন এলেন?

—কে? আমি, না মহারাজা?

এবার দৃশ্যতই হেসে ফেলেন ভারতচন্দ্র—আপনি।

উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন বিদ্যালঙ্কার। কিন্তু বাধা পড়ে। দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র বেরিয়ে আসেন মন্ত্রণাকক্ষ থেকে। কবির দিকে নজর পড়তেই সহাস্যে বলেন—মহারাজা আসছেন; একটু অপেক্ষা করুন। তা আপনার সব খবর ভালো তো? অনেকদিন দেখি না।

—মহারাজার পুণ্য রাজত্বে যাদের বাস, সাধ্য কি অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করে। ভারতচন্দ্র কিছু জবাব দেবার আগেই বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার উত্তর দেন।

বিরক্তমুখে তাঁর দিকে একটু তাকান দেওয়ান। পরক্ষণেই চোখ দুটো ফিরিয়ে নেন ভারতচন্দ্রের দিকে—আপনার সঙ্গে বসে একদিন নিভৃতে কাব্য আলোচনা করবার বড় ইচ্ছা ছিল কবি। কিন্তু নসীবের বরাত। মনে হয়, মরবার ফুরসতও বোধ হয় পাবো না। ওই মহারাজা এসে গেলেন। এবার যাই আমি।

নমস্কার জানিয়ে চলে যান রঘুনন্দন মিত্র। অন্য কারো বেলায় হলে ব্যাপারটা বিসদৃশ্য হ'ত। মহারাজার অনুমতি না নিয়ে সভা ত্যাগ করা বেয়াদপির সামিল। কিন্তু দেওয়ানজীর বেলায় সে নিয়ম খাটে না। সকলেই জানে, চটুল আমোদ-প্রমোদ একেবারেই পছন্দ করেন না দেওয়ান। কালে-ভদ্রে তাঁকে কেবল দেখা যায় ওস্তাদ বিশ্রাম খাঁর গানের আসরে। স্বয়ং মহারাজাও সমীহ করে চলেন তাঁকে। পিতা রঘুরামের আমল থেকে কৃষ্ণনগরের দেওয়ান-গিরি করছেন রঘুনন্দন মিত্র। কঠিনতম বিপদেও শক্ত হাতে হাল ধরে জমিদারী রক্ষা করেছেন।

মহারাজা সভায় প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাত তুলে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বসতে বলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর

নিজে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করেন—সব কুশল তো আপনাদের ?

বাণেশ্বর উসখুস করছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু তাঁকে কোনরকম অবকাশ না দিয়েই রুদ্ররাম তর্কবাগীশ উঠে দাঁড়ান—ধর্মচন্দ্রের রাজত্বে যারা বাস করে, স্বয়ং ধর্ম তাদের সহায়। তাদের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না মহারাজা।

কৃষ্ণচন্দ্র খুশী হন। মুখ দেখেই বোঝা যায়। বলেন—আনন্দিত হলাম তর্কবাগীশ মশাই।

আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়েন রুদ্ররাম—মহারাজার অদর্শনে আমরা কাতর ছিলাম। তা আপনার সব কুশল তো ?

—হ্যাঁ, শারীরিক কুশল। তবে, আজ বড় পরিশ্রান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হ'ত।

ইঙ্গিতটা লুফে নেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—অবশ্যই ; আজ আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা যাই।

আপত্তি করেন না কৃষ্ণচন্দ্র। এইটাই চাইছিলেন। বলেন—তা'হলে কাল সন্ধ্যায় আমাদের আসর বসবে। আসছেন তো আপনারা ?

—নিশ্চয়ই আসবো মহারাজ ; গোপাল ভাঁড় টিপ্পনী কাটে ;—আপনার অদর্শনে তর্কবাগীশ মশাই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। মিলনের এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?

সবাই চলে যান এক এক করে। ভারতচন্দ্রও যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বাধা দেন—তুমি একটু থেকে যাও কবি। কথা আছে।

কথা ভারতচন্দ্রেরও ছিল। প্রিয়ম্বদাকে কাল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভোলেন নি। আজকের আসার পেছনে সেই উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল। তবু দ্বিধা যে একটু হয় নি তা নয়। সব ভালো করে না জেনেশুনে হঠাৎ মহারাজার কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা বুঝতে পারছিলেন না।

কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মশাইয়ের কথাতে সে দ্বিধাটুকুও একেবারে কেটে গেছে। ব্যাপার সত্যিই গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যতই গোপনীয়তা রক্ষা করা হোক না কেন, আভাসটুকু পেয়েছে সকলেই।

প্রসঙ্গটা তুলতেই হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন রায়গুণাকর। সে সুযোগও পেয়ে গেলেন। তবু, মহারাজার অনুরোধটা যেন কেমন ঠেকে। অস্বস্তিতে ভরে দেয়।

—এসো ভাবত, মন্ত্রণাগৃহে যেয়ে বসি।

নির্বাকভাবে অনুসরণ করেন রায়গুণাকব। ভেতরে যেয়ে আসনের ওপর এলিয়ে পড়েন কৃষ্ণচন্দ্র—খোসামোদ শুনতে শুনতে কান দুটো ঝালাপালা হয়ে গেল কবি। তাই একটু অন্তরঙ্গ সঙ্গ চাহ। বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তারপর বলো, আর কি লিখলে?

মুখোমুখি একটা আসন টেনে .নন ভারতচন্দ্র। ইচ্ছা করেই সত্যি কথাটা চেপে যান —এখনো কিছু লিখি নি।

—না, না; এ ভালো নয়। ভগবান তোমায় যে সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েছেন তাকে অবহেলা করো না। লিখে যাও।

কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে বললেও, বেশ বোঝা যায় মন তাঁর এদিকে নেই। ডুবে রয়েছে অন্য চিন্তায়। সে চিন্তাটাও আন্দাজ করেন রায়গুণাকব। কাল রাতে প্রিয়ম্বদা যা ব.লছে, এবং আজ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কাবেব মুখে যা শুনলেন, দুটোকে মেলালেই পরিষ্কার .বাঝা যায়। ফিরতে না ফিরতেই মাহমুদ জাফর এবং মুজঃফর হোসেনেব ডাক বিনা কারণে পড়ে নি। এই সুযোগে প্রসঙ্গটা পাড়েন —একটা নিবেদন ছিল মহারাজ।

—কি নিবেদন কবি? অন্যমনস্কভাবেই মহারাজা জিজ্ঞাসা করেন।

—রাজনীতি সংক্রান্ত।

—বাজনীতি? সবিস্ময়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাকান;—তুমি যে রাজনীতিতে আগ্রহী, তা তো জানা ছিল না

—এখনো আগ্রহ নেই মহারাজ। কোনদিনই ছিল না।

—তবে ?

—আগ্রহ না থাকলেও বাধ্য হয়ে কখনো কখনো জড়িয়ে পড়তে হয়।

—মাথায় ঢুকলো না। খোলসা করে বল।

—শুনলাম নবাব আলিবর্দী অসুস্থ।

এলিয়ে-পড়া শরীরটাকে আসনের ওপর টেনে তোলেন কৃষ্ণচন্দ্র —ঠিকই শুনেছো। কিন্তু তাতে তোমার কি ?

—আমার কিছুই নয় মহারাজ। ব্যাপারটা আপনাকে নিয়ে। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

—মানে ?

—আলিবর্দী যদি মারা যান, তবে নবাব হবেন সিরাজউদ্দৌলা। তাই নয় ?

—সিরাজউদ্দৌলা ? কৃষ্ণচন্দ্র চমকে ওঠেন। অন্যমনস্ক ভাবটা পুরোপুরি কেটে যায়। সাবধানে জবাব দেন—নবাব আলিবর্দীর তাই ইচ্ছে।

—কিন্তু আপনাদের কি ইচ্ছে মহারাজ ?

—আমাদের ?

—হ্যাঁ ; আপনার, জগৎশেঠের এবং মীরজাফর আলী খাঁর। কথার লুকোচুরি ছেড়ে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেন রায়গুণাকর।

এতক্ষণে ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন কৃষ্ণচন্দ্র। অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে একটা শঙ্কার ভাবও ফুটে ওঠে মুখের ওপর। উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করেন—এ কথার অর্থ ?

—সেইটাই তো জানতে চাইছি আপনার কাছে।

—আমার কাছে ? কিন্তু আমি কেমন করে জানবো ?

ভারতচন্দ্র হেসে ফেলেন—আমি সব শুনেছি মহারাজ।

—কি শুনেছো ?

—ষড়যন্ত্রের কথা।

কৃষ্ণচন্দ্র আবার চমকে ওঠেন—কার কাছে শুনলে?

—নাম বলতে আদেশ করবেন না মহারাজ।

—হুঁ। কৃষ্ণচন্দ্র গুম্ হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। দুর্ভাবনায় কপালের রেখাগুলো কুঁচকে যায়। পরক্ষণেই সামলে নেন। জোর করে মুখের ওপর একটা হাসি টেনে এনে বলেন—ভুল শুনেছো কবি। স্রেফ গুজব। আমরা চাই বা না চাই; দিল্লী থেকে বাদশাহ যাকে ফরমান দেবেন সেই নবাব হবে।

—কিন্তু এই যুদ্ধের প্রস্তুতি।

—যুদ্ধ? কোথায়?

—শুনলাম নতুন রাজপ্রাসাদ শিবনিবাসে গড়খাই করবার আদেশ দিয়েছেন। শীঘ্রই সেখানে চলে যাবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র আবার হাসির আড়ালে এড়িয়ে যান—এসব বাজে কথা কে বলল?

—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বললেন একটু আগে।

—পাগলের প্রলাপ কবি। বিদ্যালঙ্কার পাগল হয়ে গেছেন।

রায়গুণাকর প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। একটু চিন্তা করে সোজাসুজি বলেন—রাজনীতির আমি কিছুই বুঝি না মহারাজ; বুঝতে কিংবা জানতেও চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করবো। বন্ধু বলে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই সাহস করে বলছি। এমন কিছু করবেন না যাতে বাংলার কপালে চিরস্থায়ী কলঙ্ক লেখা হয়ে যায়।

—মানে?

—গুজবও যদি হয়, তবু রটেছে। কলকাতার ইংরেজদের নাকি বাংলার মসনদে বসাবার চক্রান্ত চলছে। তার পেছনে রয়েছেন আপনি, জগৎশেঠ এবং মীরজাফর আলী খাঁ। খাল কেটে কুমীর আনাও এর চাইতে ভালো মহারাজ। সিরাজউদ্দৌলা যতই খারাপ হোক, সে এই বাংলাদেশেরই লোক।

কৃষ্ণচন্দ্র মন দিয়ে শোনেন কথাগুলো। তারপর বলেন—

সত্যিই গুজব। তবু যখন প্রসঙ্গটা তুললে, তখন বলবো, সিরাজউদ্দৌলা একটা অকর্মণ্য, লম্পট, পশু। এখনি যার এত অত্যাচার, সে যে নবাব হলে কি করবে তা কল্পনাও করতে পারি না। তাই আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন।

—আপনার কথা মানি মহারাজ। তবু বলবো, বিদেশী দেবতার চাইতে নিজের দেশের দানবও ভালো। প্রিয়ম্বদার যুক্তিটাকেই হুবহু সামনে ধরে দেন রায়গুণাকর।

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে ফেলেন—কথাটা শুনতে খুব ভালো কবি। কিন্তু তুমি এত বড় ভুল করলে? আশ্চর্য!

—কি ভুল?

তুমি কবি। তোমার দৃষ্টি আরো গভীর, আরো প্রসারিত হওয়া উচিত। দানব, সে চিরদিনই দানব। সব দেশে, সর্বকালে, সব জায়গায়। আর দেবতা, সে স্বদেশী অথবা বিদেশী যাই হোক, সে দেবতাই। দেশ, কাল কিংবা জাতিভেদে সত্য বদলায় না রায়গুণাকর।

একটু থেমে আবার বলেন—সত্য, শিব এবং সুন্দর নিয়ে তোমার কারবার। এটা মানো তো?

—মানি; কিন্তু এ ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—অত্যন্ত সোজা; কৃষ্ণচন্দ্র যেন একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন; —সত্য, শিব এবং সুন্দর হ'ল মঙ্গলের প্রতীক। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের প্রভেদ স্বীকার কর না তুমি?

—করি মহারাজ। বিব্রত স্বরে জবাব দেন ভারতচন্দ্র।

—তবে? দানব চিরদিনই অমঙ্গল; আর দেবতা চিরদিনই মঙ্গল। এ সত্যের কোন ব্যতিক্রম নেই। হয় না। স্বদেশেরই হোক, বা বিদেশেরই হোক। বুঝলে?

প্রখর যুক্তির সামনে বাক্যহারা হয়ে যান রায়গুণাকর। যা স্থির করে এসেছিলেন সব গুলিয়ে যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করেন। ক্ষণিকের উত্তেজনাটাকে সামলে নেন—সে কথা যাক। ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসবে এমন উদ্ভট কথা কে বললো শুনি? আমাদের দেশে কি লোক নেই?

—আমারো সেই অনুরোধ মহারাজ। ভারতচন্দ্র যেন একটা পথ খুঁজে পান এতক্ষণে;—মসনদে যেই বসুক, ইংরেজরা যেন না বসে। নিজেদের ব্যাপারে তাদের ডেকে আনবেন না, এইটুকুই আমার প্রার্থনা।

—সেটুকু বিবেচনাশক্তি আমার আছে রায়গুণাকর।

মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র। বেশ বোঝা যায় কথাটা শুনে। ভারতচন্দ্র সামলাবার চেষ্টা করেন—আমার কথায় কি আপনি অসন্তুষ্ট হলেন?

—অসন্তুষ্ট? না কবি, অসন্তুষ্ট হই নি; তবে অবাক্ হয়েছি।

—কেন মহারাজ?

—আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা দেখে। দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, এ কথাটাই যে মর্মান্তিক অপমান।

প্রসঙ্গটা বিপরীত পথ ধরলো। মুখে যাই বলুন, মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্রকে অভিযুক্ত করে রেখেছিলেন রায়গুণাকর। উলটে এখন অভিযুক্ত হলেন নিজে। শুধু যে কথার মারপ্যাঁচেই পরাজিত হলেন তাই নয়। যুক্তির দিক থেকেও হেরে গেলেন। স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তার সারবত্তা। আন্তরিক দুঃখিত স্বরে বলেন—আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ। আপনাকে অপমান করবার জন্যে কথাগুলো বলি নি।

—জানি রায়গুণাকর। পরের কথা শুনে তোমার কবি মন সহজেই বিচলিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে তো তুমি জানো।

—হ্যাঁ মহারাজ। তবু ইংরেজদের কথা শুনে—

কথাটাকে শেষ না করতে দিয়েই কৃষ্ণচন্দ্র বাধা দেন—রাজনীতির কথা কে বলতে পারে ভারত। আমরা শুধু চেষ্টা করতে

পারি। তার বেশি নয়। তা ছাড়া সামর্থ্যই বা কতটুকু রয়েছে আমাদের, যে এমন জটিল ব্যাপারে মাথা গলাবো। যাক, তোমার কথা শেষ হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—এবার আমার একটা বক্তব্য ছিল। যার জন্যে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

—আদেশ করুন।

—তুমি কি এখানেই থাকতে মনস্থ করেছো ?

ভারতচন্দ্র বিস্মিত হন—একথা কেন মহারাজ ?

—কারণ আছে কবি।

—এখানে থাকবার অনুমতি তো আপনার কাছে আগেই নিয়েছি।

—তা নিয়েছিলে ; কিন্তু এখনো কি তাই স্থির ?

—হ্যাঁ। ইচ্ছা করেই প্রকৃত মনোভাবটাকে গোপন করে যান রায়গুণাকর।

—আমি কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা ; কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্তত করেন ;—কিছু মনে করো না, একটা কথা বলবো। কৃষ্ণনগরে অনেক প্রলোভন রয়েছে। আর যাই করো, ভূরশুট রাজবংশে কলঙ্ক লাগে এমন কোন কাজ করো না। ব্যথা পাবো।

ভারতচন্দ্রের বুকটা কেঁপে ওঠে। অনুমান করেন, সকালের ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নালিশ করেছে গোপাল ভাঁড়। কিন্তু সেটা যে আগাগোড়া মিথ্যা। মিথ্যার সামনে মাথা নত করতে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। উত্তেজিতভাবে জবাব দেন—এ সমস্ত শত্রুর রটনা মহারাজ। একবিন্দুও সত্য নেই। জানি, রাজসভার অনেকেই আমায় হিংসা করে। আপনি যে আমায় স্নেহ করেন, সেটা তাদের মনঃপূত নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মুচকি হাসেন—রটনা হলেও, সেটা কি একেবারেই ভিত্তিহীন ? নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখো তো।

—করেছি মহারাজ। বিবেকের কাছে আমি কোন অন্যায় করি নি।

—কিন্তু রাজনর্তকীব ব্যাপারটা? তার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা, সেটা তো সত্যি।

—হ্যাঁ; অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করেন রায়গুণাকর;—কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতায় বিন্দুমাত্রও কলুষতা নেই।

—মনের দিক থেকে কি কোন দুর্বলতা নেই?

—না।

—ভালোবাসা?

—উত্তর দিতে যেয়ে একটু থমকে যান ভারতচন্দ্র। তারপর দৃঢ়স্বরে জবাব দেন;—ভালোবাসার কথা যদি বলেন মহারাজ, তবে বলবো আমি মানুষের কবি। মানুষকে ভালোবাসাই আমার ধর্ম।

কৌতুকে চোখদুটো ঝিকমিক করে ওঠে কৃষ্ণচন্দ্রের;—তা হলে স্বীকার করছো, রাজনর্তকীকে তুমি ভালোবাসো।

—হ্যাঁ, ভালোবাসি। কিন্তু সে ভালোবাসায় কোন কালিমা নেই। মানুষ হিসাবে তার আত্মাকে আমি ভালোবাসি। তাতে এমন কিছুই নেই যে ভুরশুট রাজবংশে কলঙ্ক লাগবে।

—লোকে সে কথা বুঝবে না কবি। তারা বলবে তুমি বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়েছো।

—তারা বদলোক, নিন্দুক।

—হোক, তবু তাদের নিয়েই আমাদের বাস করতে হবে।

উপযুক্ত একটা জবাব এসে গিয়েছিল জিভের ডগায়। একই দুর্নাম লোকে মহারাজাকেও দেয়। তাতে যদি কলঙ্ক স্পর্শ করতে না পারে, তবে তাঁরও লাগবে না। কিন্তু চেপে যান রায়গুণাকর। চিরদিনের মতো কৃষ্ণনগর ছেড়ে যেতে যখন মনস্থির করে নিয়েছেন একবার, তখন অযথা তিক্ততা সৃষ্টি করে লাভ নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র একটু অপেক্ষা করে আবার বলেন—তোমার কথা আমি বুঝেছি; কিন্তু লোকে বুঝবে না। তারা সাধারণ মানুষ। তাই অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার পক্ষে মূলাজোড়ে ফিরে যাওয়াই সবদিক থেকে ভালো হবে। তা'ছাড়া কর্তব্যও বাকী রয়েছে তোমার। ওখানে বৃদ্ধ পিতা রয়েছেন, স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশে পড়ে থাকা ঠিক নয়। সবই তো আর কল্পনার স্বর্গরাজ্য নয় কবি। কঠিন বাস্তবও যে রয়েছে। কি, চুপ করে রইলে কেন?

—ভাবছি মহারাজ।

—আর ভাবনা নয় ভারত। তুমি ফিরে যাও। আর, যতই নির্মল প্রেম হোক না কেন, আসক্তি যে সেটা, তা তো অস্বীকার করতে পারো না।

এবার সত্যিই মাথা নীচু করে নিতে হয় রায়গুণাকরকে। আবার যুক্তির কাছে পরাজয় ঘটলো। অপ্রিয় হলেও, কঠিন যুক্তি। জবাব যোগায় না কোন।

—কথা বলছো না যে?

—কি বলবো?

—শোনো; আমি জানি আমার রাজসভা তোমার মত মহৎ হৃদয় কবির যোগ্য স্থান নয়। তবু তোমায় আটকে রেখেছিলাম নিজের স্বার্থে। লোকে আমার গুণগান করবে বলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কাজটা স্বার্থপরের মতো হয়েছে। নিজের গৌরবের জন্যে তোমার মঙ্গল এবং সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছি।

এতক্ষণ মনে মনে ফুঁসছিলেন ভারতচন্দ্র। পরাজয়ের জন্যেই শুধু নয়। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যাটুকুও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছিল। অথচ উত্তরও দিতে পারছিলেন না। বেশ বুঝতে পারছিলেন, উত্তর হয় না কোন। যতই তর্ক করুন, আসলে এক ধরণের আসক্তি ছাড়া প্রেমের আর কোন ব্যাখ্যা হয় না।

শেষের কথাগুলো কিন্তু অদ্ভুত একটা স্বস্তি এনে দেয়। মহারাজার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি রায়গুণাকরকে অভিভূত করে ফেলে। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বাধা দেন—ও-কথা বলবেন না মহারাজ। আমার জন্যে যা করেছেন, সে ঋণ জীবন দিয়েও শোধ হবার নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র ক্লান্ত, বিষণ্ণভাবে হাসেন—করেছি; কিন্তু তোমার জন্যে যতটা নয়, তার অনেক বেশি করেছি নিজের স্বার্থে। একটা সার সত্য জেনে রেখো। আমি রাজনীতির খেলোয়াড়। পেশা এবং নেশা দুই-ই আমার তাই। এবং যারা রাজনীতি নিয়ে কারবার করে, তারা কখনো বিনা স্বার্থে একটা কথাও উচ্চারণ করে না।

—মহারাজ! আসন ছেড়ে এগিয়ে আসেন রায়গুণাকর।

কৃষ্ণচন্দ্রও উঠে দাঁড়ান। গাঢ় আলিঙ্গনে কবিকে আবদ্ধ করে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলেন—তবু বিশ্বাস করো ভারত, তোমার প্রতিভা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। তাই স্বার্থের খাতিরে এখানে আটকে রাখলেও নিশ্চিন্ত হতে পারি নি কখনো। সব সময় গোপন অপরাধবোধ খোঁচা দিত। তোমার ক্ষতি করেছি।

ধীর, গম্ভীর স্বরটা ঘরের মধ্যে গম্‌গম্ করতে থাকে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেন—যা হয়ে গেছে তার চারা নেই। কিন্তু আজ যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, তখন আর নয়। তাই আজ দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি। তোমার মঙ্গলের জন্যেই। এটা করতে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। তবু, আর ক্ষতি করবো না। তোমার-আমার সম্পর্কটা লাভ-ক্ষতির ওপরে উঠে গেছে। এতদিনে নিশ্চিতরূপে বুঝেছি।

শেষের দিকে গলাটা যেন ডুবে যায়। সেইসঙ্গে মনের অবশিষ্ট তিক্ততাটুকুকেও নিঃশেষে ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় রায়গুণাকরের। সজল চোখে সান্ত্বনা দেন—দুঃখিত হবেন না মহারাজ। আসল কথাটা এতক্ষণ বলি নি। আমি অনেক আগেই ঠিক

করেছি মূলাজোড়ে ফিরে যাবো। আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছিলাম শুধু।

—সত্যি? আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ক্লান্ত শরীরটাকে আসনে এলিয়ে দেন কৃষ্ণচন্দ্র;—বিরাট একটা দুর্ভাবনা থেকে আমায় মুক্ত করলে ভারত। কেবলই ভাবছিলাম, প্রস্তাবটা তুমি হয়তো অন্যভাবে নেবে।

—তা কেন নেব মহারাজ। আমি জানি আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

কৃষ্ণচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—তা'হলে আর দেরি করো না বন্ধু। তাড়াতাড়িই রওনা হয়ে যাও। সম্ভব হলে দু-এক দিনের ভেতরেই। বিদেশ-বাস যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভালো। তা ছাড়া, নিজের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই আমার। কালই হয়তো মত বদলে যাবে। আবার আটকে ফেলব তোমায়।

কথাটা শেষ করে প্রাণ খুলে হাসেন খানিকটা। তারপর বলেন—ভালোবাসা এমনই কবি। মানুষকে বড় দুর্বল করে ফেলে।

হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে রায়গুণাকরও হাসেন;—তা ঠিক মহারাজ। দু-এক দিনের ভেতরেই রওনা দেবো। তা'হলে আসি?

—এসো বন্ধু। আর হয়তো দেখা হবে না। কালই আবার বাইরে চলে যেতে হবে আমাকে। তবে একটা কথা জেনে রেখো। দূরে চলে গেলেও, আসন তোমার চিরস্থায়ী হয়ে রইল আমার হৃদয়ে। কখনো কোন প্রয়োজন পড়লে জানাতে দ্বিধা করো না।

একটু নির্বাক্ থেকে আবার বলেন—আর একটা কথা। বন্ধু হিসেবে বলছি। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওপথ তোমার নয়। তা'ছাড়া বিপদও অনেক ও-পথে।

লঘুমনে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন রায়গুণাকর। শেষের দিকে সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো চোখের জল আটকাতে পারতেন না। ধারণা ছিল না, নিজের অজ্ঞাতে মহারাজাকে এতখানি ভালোবেসে ফেলেছেন।

কিন্তু রাজবাড়ির দেউড়ী ছাড়িয়ে পথে পড়তেই যেন একটা পাষাণ-ভার বুকের ওপর চেপে বসে। অথচ হওয়া উচিত ছিল না এমন ধারা। বন্ধুভাবে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে মহারাজার সঙ্গে। লুকোচুরি ছিল না এতোটুকুও। ক্ষোভও কোন থাকা উচিত নয় সেই কারণেই। মূলাজোড়ে যে ফিরে যাবেন, তা নিজেই স্থির করে রেখেছিলেন। মহারাজার কাছ থেকে প্রস্তাব আসবার অনেক আগেই।

কি[illegible] মনের গতি বোঝা ভার। কিছুতেই মানতে চায় না যুক্তিগুলোকে। কেবলি খুঁতখুঁত করতে থাকে। তাঁকে কৃষ্ণনগর থেকে সরিয়ে দেবার আগ্রহটা যেন একটু অস্বাভাবিক ছিল মহারাজার। আর একমুহূর্তও তাঁর এখানে থাকাটা যেন অভিপ্রেত নয় কৃষ্ণচন্দ্রের।

যত ভাবেন ততই বদ্ধমূল হয় সন্দেহটুকু। সোজা ভাষায় বলতে গেলে তাঁকে কৃষ্ণনগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই হ'ল। মিষ্ট বাক্যের আবরণ সত্ত্বেও এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। মন্ত্রণাকক্ষে আলোচনার সময় অবশ্য অতটা খেয়াল করেন নি। কথার চাতুর্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মহারাজার সামনে থেকে সরে আসতেই প্রকৃত উদ্দেশ্যটুকু স্পষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু কেন? ভয় পেলেন কৃষ্ণচন্দ্র? ষড়যন্ত্রটা যে তাঁর সভা-কবির কানে গেছে সেটা আন্দাজ করেই কি এই চা[illegible]টুকু চাললেন? পথের কাঁটাকে দূরে সরিয়ে দিতে চান?

নিজের কাছেই প্রশ্নগুলো হাস্যকর ঠেকে। ভয়ই যদি পেয়ে থাকেন মহারাজা, তবে তিনি এখান থেকে চলে গেলেও ভয়ের কারণ রয়ে যাবে। ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করতে অথবা আরব্ধ কাজে

বাধা দিতে চাইলে, মূলাজোড়ে থেকেও ভারতচন্দ্র তা করতে পারেন। তা'ছাড়া, আর একটা দিকও দেখবার আছে। তাঁর মতো সামান্য একজন নিরীহ, দরিদ্র কবি এত বড় একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করবেন, সে কথা চিন্তা করাও হাস্যকর।

তবে? পথের মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রায়গুণাকর। অপর সম্ভাবনা হতে পারে মাত্র একটা। ঈর্ষা। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতায় ঈর্ষান্বিত হয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজউদ্যানের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। জনবিরল রাজ-পথ। নগরীর উপকণ্ঠে এ দিকে সন্ধ্যার পর বড় একটা কেউ আসে না। মন খুলে হাসেন রাজকবি। বৃদ্ধ বয়েসে নারী নিয়ে ঈর্ষা। লোকে শুনলেও ছি ছি করবে।

সহসা হাসিটা হুচোট খায়। এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই মগ্ন ছিলেন। তাই মনে পড়ে নি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাজসভায় গিয়েছিলেন, তা সফল হ'ল না। ওদিকে হয়তো প্রিয়ম্বদা কত আশা করে বসে রয়েছে সুসংবাদ শুনতে। কি জবাব দেবেন তাকে? হয়তো অপেক্ষা করছে মাধবী-মালঞ্চেই।

দুর্ভাবনায় চলার গতি আপনা থেকেই শ্লথ হয়ে পড়েছিল। কুটিরের সামনে এসে একেবারেই থমকে যায়। খোজা পীরবক্স সহাস্যে সেলাম করে—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি হুজুর।

রায়গুণাকর বুঝতে পারেন সব। প্রিয়ম্বদার আদেশেই এত রাত অবধি এখানে বসে রয়েছে পীরবক্স। তবু কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে। অপরাধীর মতো চোখ দুটো নামিয়ে নেন শুধু।

—বাঈজী আপনাকে একবার সেলাম জানিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র কেঁপে ওঠেন;—এতো রাতে? কাল সকালে গেলে হয় না?

—কাল? পীরবক্স যেন মুষড়ে পড়ে;—কিন্তু বাঈজী বলেছেন, যত রাতই হোক আপনাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

কর্তব্য স্থির করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে রায়গুণাকরের। বিশ্রী একটা সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঈর্ষাবশতই মহারাজা যদি তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার মতলব করে থাকেন, তা হলে প্রিয়ম্বদার ওখানে যাওয়াটা বোধ হয় অনুচিত হবে। মহারাজা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন আরো। এবং জানতে পারবেনই।

কিন্তু এই কথাটাতেই হৃদয় বিদ্রোহ করে বসে। রাজসভায় চাকরি করবেন বলে অপরদের মতো নিজেকে বিকিয়ে দেন নি। অহেতুক কারণে যদি অসন্তুষ্ট হন কৃষ্ণচন্দ্র, তা'হলে হবেন। তাঁর দিক থেকে কিছুই করবার নেই। সেই অবস্থাতেই যাবার জন্যে পা বাড়ান—চলো। হয়েই আসি ওখান থেকে।

উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল বাঈজী। একনজর তাকিয়েই অবস্থাটা অনুমান করে নেন রায়গুণাকর। চিন্তায়-ভাবনায় এক রাতের মধ্যেই যেন বাসি ফুলের মতো শুকিয়ে গেছে। তাঁকে দেখে স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসও করে না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ দুটোকে শুধু তুলে ধরে মুখের ওপর। মৌন, কিন্তু প্রশ্নমুখর দুটো চোখ।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করতে থাকে ভারতচন্দ্রের। বিফলতার কথা মুখ ফুটে বলতে যেয়েও আটকে যায়। নিবাকভাবে মাথা নীচু করে নেন।

রাজনর্তকী তৎক্ষণাৎ আচ করে নেয়। ম্লানকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—হ'ল না তা'হলে?

—না প্রিয়ম্বদা।

—ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ; যুক্তি-তর্কের কসুর রাখি নি কোন। কিন্তু মহারাজার একটা যুক্তির কাছে হেরে গেলাম। জবাবই দিতে পারলাম না।

—কি যুক্তি? বাঈজীর প্রশ্নে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

—দানব, সে নিজের দেশের হোক, বা পরের দেশের হোক, সে দানবই। অমঙ্গল যেখানেই ঘটুক, তা অমঙ্গল ছাড়া অন্যকিছু নয়।

প্রিয়ম্বদা ব্যথিতভাবে হাসে—দুষ্কার্যের জন্যে কখনো ছলের অভাব হয় না কবি।

—কিন্তু কথাটা তো ঠিক। রায়গুণাকর যেন নিজের অকৃত-কার্যতার অপরাধ স্খলনের চেষ্টা করেন।

—না, ঠিক নয়। সিরাজ দানব, সিরাজ অমঙ্গল, সব মেনে নিলাম। কিন্তু সেই কারণে দেশটাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হবে, এ যুক্তি মানতে পারলাম না কবি। আশ্চর্য লাগছে, তুমি কি ভাবে মেনে নিলে?

—কিন্তু মহারাজা এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন। শুধু এইটুকুই নয়, সবটাই। সমস্তই নাকি গুজব। শত্রুপক্ষের রটনা।

—মিথ্যে কথা; রাজনর্তকী গভীর উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে ওঠে;—উনি কোথায় গিয়েছিলেন জানো?

ভারতচন্দ্র অবাক্ হয়ে পড়েছিলেন। এতদিনের মধ্যে প্রিয়ম্বদাকে এতখানি উত্তেজিত হতে কখনো দেখেন নি। আমতা-আমতা করে জবাব দেন—তোমার মুখেই শুনেছিলাম—

কথাটা শেষ হবার আগেই রাজনর্তকী বাধা দেয়—জানো, গিয়েছিলেন মন্ত্রণা করতে। সেখানে ছিলেন জগৎশেঠ, মীরজাফর আলী, মুর্শিদাবাদের ইংরেজ-কুঠির কুঠিয়াল। আর ছিলেন নাটোরের মহারাণী। বলতে পারো আমাদের ব্যাপারে ইংরেজ কুঠিয়ালের মাথাব্যথা কেন?

—এটা তো আমায় বলো নি।

—আমি নিজেই তো জানতে পেরেছি খানিক আগে। সব-চাইতে মজার ব্যাপার জানো? একমাত্র রাণী ভবানীই ওঁদের প্রস্তাবে সায় দেন নি।

—সেকি ? বিস্ময়ে চমকে ওঠেন রায়গুণাকর ;—তাঁরই মেয়েকে না হীন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল সিরাজ ?

বাঈজী এবার অদ্ভুতভাবে হাসে ;—সেইখানেই তো দুঃখ। অত বড় অপমানটাকেও দেশের স্বার্থের সামনে তুচ্ছ করলেন রাণী ভবানী। অথচ যাদের সিরাজ কোন ক্ষতিই করে নি, তারাই তার সর্বনাশ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে।

—তবে ? ভারতচন্দ্র হতাশ হয়ে পড়েন।

—তাই তো ভাবছি। কি হবে ? কি করা উচিত ?

নিঃশব্দে খানিকক্ষণ চিন্তা করে আবার বলে—সে যা হয় হবে। কিন্তু মহারাজা আবার তোমার ওপর রাগ করেন নি তো ?

কথাটা চট করে মনে পড়ে যায় রায়গুণাকরের। বলেন—বোধ হয় হয়েছেন।

—অ্যা ; প্রিয়ম্বদার গলাটা কেঁপে যায় ;—কি করে বুঝলে ?

—অনেক কথা বললেন। আমার কথা, আমার স্ত্রীর কথা, তোমার কথা।

—আমার কথা ?

রায়গুণাকর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেন ;—হ্যাঁ ; বললেন এ বয়সে আমার পক্ষে বেশ্যাসক্ত হওয়া উচিত নয়। ভূরশুট রাজবংশের নাম ডুববে।

প্রিয়ম্বদা অনুমান করেছিল অন্য ব্যাপার। ভারতচন্দ্র হয়তো বলে দিয়েছেন, ষড়যন্ত্রের আভাসটা তিনি পেয়েছেন বাঈজীর কাছ থেকে। ভীত হয়ে পড়েছিল সেইজন্যে। কিন্তু কথাটা শুনে অপ্রতিভ হয়ে যায় ;—তুমি কি জবাব দিলে ?

—যা সত্যি, তাই বললাম। বললাম, রাজনর্তকীকে আমি ভালোবাসি, লোকের কথার তোয়াক্কা করি না। বললাম, সে প্রেমে কোন কলুষতা নেই।

—ছি, ছি ; এ কি করেছো ? লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে বাঈজী।

—কথাটা তো মিথ্যা নয়।

—খুব হয়েছে ; প্রসঙ্গটাকে এড়াতে চায় প্রিয়ম্বদা ;—তারপর ?

—তার পরেরটুকুই যেন কেমন ঠেকছে। অনেক সহানুভূতি জানিয়ে শেষে বললেন মূলাজোড়ে ফিরে যেতে। সম্ভব হলে দু'-এক দিনের ভেতরেই।

—ভালোই তো। এ তো তুমি আগেই ঠিক করেছিলে।

—করেছিলাম ; ভারতচন্দ্র গম্ভীর হয়ে যান ;—কিন্তু এখন মত পালটেছি।

—কেন ?

—মহারাজার চাকরি করি বলে মাথা বিকিয়ে দিই নি। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমায় চলতে হবে, সে আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। আমাকে এখান থেকে তাড়াতে এত ব্যস্ত কেন মহারাজা।

চিন্তিতমুখে অনেকক্ষণ বসে থাকে বাঈজী। তারপর বলে—চক্রান্ত যে ফাঁস হয়ে গেছে সে কথাটা বুঝতে পেরেই তোমায় এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন।

—কেন ? আমার মতো লোককে তাঁর ভয় কিসের ?

—আছে কবি। তুমি বাধা দিতে পারো ; লেখনী তুলে নিতে পারো। সে যে তলোয়ারের চাইতেও তীক্ষ্ণ।

—সে তো মূলাজোড়ে থেকেও পারি।

—আশঙ্কা যে নেই, তা নয়। তবে ওঁর বিশ্বাস, তুমি তা পারবে না। রাজনীতিকে যে ঘৃণা কর তুমি, তা তিনি ভালো করেই জানেন। নেহাত গায়ের ওপর এসে না পড়লে তোমার টনক নড়বে না। তা'ছাড়া, মূলাজোড়ে গিয়ে এসব দিকে নজর দেবার সময়ই পাবে না। বর্ধমানের মহারাণী ওখানে রয়েছেন। তোমার চিরশত্রু।

ব্যাপারটাকে এভাবে বিচার করে দেখেন নি রায়গুণাকর। একেবারে উড়িয়েও দিতে পারেন না যুক্তিটাকে। তবু বলেন—আমার কিন্তু মনে হয় অন্য কথা ?

—কি ?

—ঈর্ষা। তোমাকে ভালোবাসি, এটা সহ্য করতে পারছেন মহারাজ।

এত দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে গড়িয়ে পড়ে রাজনর্তকী ;—কই বলে কবির বুদ্ধি। হৃদয় নিয়ে কারবার করো বলে সবকিছুর তরেই হৃদয়ের গন্ধ পাও।

—মানে ?

—খুব সোজা। রাজনীতিতে হৃদয়ের বালাই নেই। সে কথা থাক। কবে যাচ্ছো বলো।

রায়গুণাকর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। গম্ভীরস্বরে জবাব দেন—বললাম তো, মত বদলেছি।

—কেন ?

—অন্যের ইচ্ছা অনুসারে চলতে আমি অভ্যস্ত নই। এর জন্যে বহু কষ্ট পেতে হয়েছে। তবুও।

—কিন্তু আমার মতে চলে যাওয়াই ভালো হবে।

—তুমিও এই কথা বলছো ?

চিন্তামগ্ন প্রিয়ম্বদা খেয়াল করে না অভিমানটুকু। জবাব দেয় —হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে, না গেলে বিপদে পড়বে। চক্রান্ত যারা করে, তারা দয়ামায়া রাখে না। হয়তো মেরেও ফেলতে পারে তোমায়।

রায়গুণাকর অবাক্ হয়ে যান। সহসা মনে পড়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ উপদেশটা। বলেন—মহারাজাও অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে বলেছেন।

—বলেছেন ? রাজনর্তকীর দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। অনুনয় করে—তুমি মূলাজোড়ে ফিরে যাও কবি। আর কারো কথা না রাখো, অন্তত আমার কথাটা রাখো।

—কিন্তু তুমি কেন অনুরোধ করছো ?

—কেন করছি, তা তুমি বুঝবে না কবি। বোঝবার চেষ্টাও

করো না। শুধু আমার অনুরোধটুকু রাখো। বলতে ্পর ?
বাঈজীর আয়ত চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। ্ভূতি

হতভম্ব ভারতচন্দ্র উঠে দাঁড়ান। একখানা হাত নিয়ে না -এক নিয়ে জিজ্ঞাস করেন—একি, তোমার চোখে জল ?

—কই, না তো। বিব্রতভাবে হাতখানা ছাড়িয়ে নেয় রাজ এ

রায়গুণাকর কিন্তু আবার চেপে ধরেন হাতখানা—হ্যাঁ ভে মত কাঁদছো।

প্রিয়ম্বদা এবার আর কোন প্রতিবাদ করে না। মুং নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে স্বীকার করে—হ্যাঁ কবি। থার

—কেন ?

—আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না। যা অবস্থা, তা কে কে কোথায় ছিটকে পড়বো কে জানে।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে হাতের ওপর। সহস. ন ভারতচন্দ্রের দৃষ্টির সামনে থেকে একটা পর্দা সবে যায়। ওই অশ্রুবিন্দুর মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত দেখতে পান এই রহস্যময়ী নারীর হৃদয়।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা দুঃখ এবং আবেগ অন্তরটাকে মথি করে দিতে থাকে। কোমল স্বরে প্রশ্ন করেন—একটা কথা সত্যি করে বলবে প্রিয়া ?

ভীরু পাখির মতো কাঁপছে ধরে-রাখা হাতখানা। রাজকবির বুকের মধ্যেও যেন অশ্রুর ঝড় বইতে থাকে। আবার কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন—বলো, জবাব দেবে ?

অবনত মুখখানা ধীরে ধীরে তোলে প্রিয়ম্বদা। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যায়। অস্ফুটকণ্ঠে বলে—জানি তুমি কি প্রশ্ন করবে। কিন্তু, না করলেই কি নয় কবি ?

—যদি এই আমাদের শেষ দেখা হয় প্রিয়া ?

—হলই বা। কিছুটা না হয় আড়ালেই থাকুক। সবই কি জানতে হয়, না জানানো যায় ?